হরর কাহিনি

# অশুভ ছায়া

অনীশ দাস অপু



হরর কাহিনি

# অশুভ ছায়া

## অনীশ দাস অপু

এ বইয়ের কয়েকটি গল্প লেখার সময় বিচিত্র সব অনুভূতি কাজ করেছে আমার ভেতর। কখনও আঁতকে উঠেছি, কখনও বা শিরশির করে উঠেছে গা; একটি গল্প তো রাতের বেলায় লিখতেই পারিনি—এমন ভয় করছিল! কোন্ গল্পটি জানতে চান? ওটা রহস্যই থাক। শুধু বলি—আমার অনুভূতি শেয়ার করতে চাইলে বসে যান এ-বই নিয়ে। তারপর দেখুন 'অশুভ ছায়া'র আড়াল থেকে বেরোতে পারেন কি না!




সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক (সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

## সূচি

## ভূমিকা

আমি এ পর্যন্ত যতগুলো গল্প সংকলন করেছি, আমার ধারণা 'অশুভ ছায়া' সেগুলো থেকে বেশ ব্যতিক্রম। আগের গল্প সংকলনগুলোতে ভূত-প্রেতের আধিক্য ছিল। 'অশুভ ছায়া' ভৌতিক কাণ্ডকারখানা থেকে অনেকটাই মুক্ত। আমি পাঠকদের ভিন্নরকম ভয়ের আমেজ দিতে চেয়েছি বইটিতে। এ বইতে ভূতের আধিক্য তেমন না থাকলেও ভৌতিক আবহ পুরোটাই আছে। Horror-এর যে আভিধানিক অর্থ, 'আতংকজনিত কম্পন' গল্পগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন, ওই উপাদানের কোনও ঘাটতি নেই বইতে। কয়েকটি গল্পে রয়েছে সায়েন্স ফিকশনের ছোঁয়া। যারা হরর–সায়েন্স-ফিকশন পড়তে পছন্দ করেন, তাঁদের খুবই ভাল লাগবে ওই গল্পগুলো। হরর-এর সঙ্গে সায়েন্সের মিশেল দিয়ে যে পিলে চমকানো গল্প তৈরি করা যায়, 'অশুভ যাত্রা', 'যন্ত্রণা' এবং 'হন্তারক' তার প্রমাণ। তিনটি গল্পই বিশ্বখ্যাত তিন লেখক হরর কাহিনি হিসেবে প্রকাশ করেছেন। আশাকরি পাঠক উপভোগ করবেন গল্পগুলো।

সেবা'র জন্যে পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় আমি সবসময় বইয়ের নামকরণ নিয়ে সমস্যায় পড়ে যাই। তখন টিংকু ভাইয়ের শরণাপন্ন হতেই হয়। তিনি বরাবরই এ বৈতরণী পার হতে আমাকে সাহায্য করেছেন। এবারেও ডোবাননি। টাইটেল গল্পটির তিনটি নাম নির্বাচন করেছিলাম। টিংকু ভাই'র পছন্দ হলো 'অশুভ ছায়া' নামটি। হরর কাহিনি হিসেবে বেশ জুৎসই

নাম, কী বলেন?

আমার হরর ভক্ত পাঠকরা প্রায়ই ফোন করে কিংবা এস এম এস পাঠিয়ে জানতে চান হরর উপন্যাস কবে থেকে শুরু করব। এ ভূমিকা যখন লিখছি (৩ মার্চ, রাত ১১-৩০), তার কিছুক্ষণ আগে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ইভা ফোন করে একই প্রশ্ন করলেন। জেনে খুশি হবেন শীঘ্রি আপনারা আমার হরর উপন্যাস পাবেন। ইতিমধ্যে 'ওয়্যার উলফ' নামে দুর্দান্ত একটি হরর উপন্যাসে হাতও দিয়েছি। আমি নিশ্চিত, বইটি আপনাদের দারুণ লাগবে! তবে সম্ভবত আগামী মাসেই 'রক্ত তৃষ্ণা' নামে চমৎকার একটি হরর সংকলন নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি।

*অনীশ দাস অপু*

মুঠো ফোন: ০১৭১২৬২৪৩৩৬





## অশুভ ছায়া

অ্যানুবিসের বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। ওর অন্ধ চোখ শত সহস্র বছরের অসীম আঁধার সয়ে আসছে, হাজার বছরের ধুলো জমেছে পাথুরে ভ্রুতে। গুহার স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বিকট মূর্তির গায়ে সৃষ্টি করেছে কালের ক্ষত, তবে পাথরের ঠোঁট দুটোর পৈশাচিক হাসির ভয়াবহতাকে ম্লান করতে পারেনি একটুও। যেন জ্যান্ত দানব একটা। কিন্তু শেয়াল দেবতা অ্যানুবিস নিষ্প্রাণ একটা পাথুরে মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই দেবতার যারা পূজা করত সেই পূজারীরা মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। এই গুহার চারপাশে যেন মৃত্যুর ছায়া, এই ছায়া যেন ঘুরে বেড়ায় অ্যানুবিসকে ঘিরে। ঘাপটি মেরে আছে মমির কফিনে, গা মিশিয়ে আছে শতাব্দী প্রাচীন মেঝের ধুলোর স্তূপে। মৃত্যু এবং অন্ধকারের এই ভয়াল রাজ্যে আলোর প্রবেশ নিষেধ। গত তিন হাজার বছরে এখানে আলোর একটি রেখাও দেখা যায়নি। কিন্তু তিন হাজার বছর পর আজ দেখা গেল। গুহাগুলোর শেষ মাথায় ঝনঝন শব্দ শোনা গেল, কারা যেন ত্রিশ শতকের পুরোনো লোহার গেট খুলে ফেলল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রতিফলিত হলো মশালের আলো, এরপর ভেসে এল মানুষের গলা। ব্যাপারটা রোমহর্ষক এবং অদ্ভুত। গত তিন হাজার বছরে এই কালো এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার সমাধিস্তম্ভে আলোকরেখার কোনও প্রবেশ ঘটেনি। গত তিন হাজার বছরে ধুলোয় ধূসরিত মেঝেতে পড়েনি কারও পায়ের ছাপ। গত তিন

হাজার বছরে এই গুহার প্রাচীন বাতাস বয়ে আনেনি কোনও মনুষ্য কণ্ঠ। এই গুহায় শেষ আলোকরেখা বিচ্ছুরিত হয়েছিল বাস্ত্-এর সন্ন্যাসীর হাতের মশাল থেকে; ধুলোয় শেষ পায়ের ছাপ পড়েছিল মিসরীয়দের; শেষ কণ্ঠটি শোনা গিয়েছিল নীলনদের এক পূজারীর। কিন্তু আজ, হঠাৎই গুহামুখ আলোকিত হয়ে উঠেছে বৈদ্যুতিক মশালের আলোয়, মেঝেয় বুট জুতোর শব্দ আর বাতাসে পুরুষালি ইংরেজ কণ্ঠ।

মশালের আলোয় মশালবাহীর চেহারা দেখা গেল। মানুষটি লম্বা, রোগা। বাঁ হাতে ধরা পার্চমেন্ট কাগজের মতই তাঁর চেহারায় বয়সের রেখা সুস্পষ্ট। ভদ্রলোকের মাথার চুল যেন কাশফুল, কোটরাগত চোখ আর হলদেটে ত্বক তাঁকে বুড়ো মানুষের কাতারে ফেললেও ঠোঁটে ঝুলে থাকা হাসিতে মালিন্য নেই একবিন্দু, যুবকের আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়সংকল্প যেন ধারণ করে আছে ওই হাসি। তাঁর ঠিক পেছনেই এক তরুণ, হুবহু বৃদ্ধের চেহারা। বোঝাই যায় যুবক বৃদ্ধের সন্তান।

'আমরা তা হলে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি!' উত্তেজিত হয়ে বলল তরুণ।

'হ্যাঁ, খোকা, এসেছি।' হাসিমুখে জবাব দিলেন বাবা।

'বাবা, দেখ! ওই যে সেই পাথরের মূর্তি। ম্যাপে যেটার নাম লেখা ছিল!'

মেঝেতে হালকা পায়ে দুজনে আগে বাড়লেন, মূর্তিটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সার রোনাল্ড বার্টন হাতের মশালটা উঁচিয়ে ধরলেন শেয়াল দেবতাকে ভাল করে দেখার জন্য। পিটার বার্টন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চাইল কদাকার চেহারাটার দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনে খুঁটিয়ে দেখলেন বিশাল মূর্তিটিকে। দরজা দিয়ে আসা দমকা হাওয়া অ্যানুবিসের গা থেকে অনেকটা ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মশালের আলোয় চকচক করছে

ওটার গা। বারো ফুট লম্বা, মানুষ আকৃতির কুকুরমুখো ওই শেয়াল দেবতার গোটা অস্তিত্বে অশুভ এবং ভয়ঙ্কর কী যেন একটা আছে। মূর্তিটার লম্বা হাত দুটো অভিশাপ দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে, যেন কেউ তার শান্তিভঙ্গ করতে এলে লাফ দিয়ে বহিরাগতকে ধ্বংস করে ফেলবে। দানব মূর্তির পেছনে উঁকি দিলেন সার রোনাল্ড বার্টন। খালি একটা কুলুঙ্গি ছাড়া কিছু নেই ওখানে।

মূর্তির হাসিটা দারুণ জীবন্ত মনে হলো, পাথুরে চোখ দুটো যেন সতর্ক করে দিচ্ছে, সাবধান। কাছে এসো না।

দুজনের কেউ কথা বলছেন না, তবে দু'জনেরই কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, গুমট, দমবন্ধ করা অবস্থা, আলো-ছায়ার এই গুহায় কীসের যেন অশুভ সঙ্কেত, বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙলেন সার বার্টন নিজেই। 'ঠিক আছে, খোকা। সারাদিন এটার দিকে তাকিয়ে থাকলে কোনও ফায়দা হবে না। আমাদের এখন অনেক কাজ বাকি। ম্যাপটা একবার দেখে নিয়েছিস তো?'

'দেখেছি, বাবা,' মৃদু গলায় জবাব দিল ছেলে। বাপের মত গমগমে কণ্ঠ নয়। এখানকার বাতাসে দম নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। কেমন নর্দমার গ্যাসের গন্ধ। তবে পুঁতিগন্ধটাকে সে সহ্য করে থাকল। কারণ পিটার জানে সে তার বাবার সঙ্গে একটি গোপন সমাধিস্তম্ভে প্রবেশ করেছে, মাটি থেকে সাতাশ ফুট নীচে। ত্রিশ শতাব্দীর প্রাচীন এক সমাধিস্তম্ভে। সমাধি আবিষ্কারের আনন্দও কিছুতেই মাথা থেকে অভিশাপের কথাটা বিস্মৃত হতে দিতে চাইছে না।

এই জায়গার ওপর একটি অভিশাপ রয়েছে; আর সেটি জানার জন্যই মূলত এখানে আসা। সার রোনাল্ড প্যাপিরাস পার্চমেন্ট ম্যাপটির সন্ধান পেয়েছেন নিনথ পিরামিড খুঁড়তে গিয়ে। কী করে তিনি অভিযাত্রীকারী দলের অন্যান্যদের ফাঁকি

দিয়ে কাগজখানা হাতড়িয়েছেন কেউ জানে না। কিন্তু যে ভাবেই হোক কাজটা করেছেন তিনি।

অবশ্য মানচিত্র চুরি করার জন্য তাঁকে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। কারণ গত বিশ বছরে সার রোনাল্ড বার্টন অসংখ্য মরুভূমি চুল আঁচড়ানোর মত আঁচড়েছেন, আবিষ্কার করেছেন বহু পবিত্র ধ্বংসাবশেষ, মর্মোদ্ধার করেছেন কঠিন এবং দুর্বোধ্য সব চিত্রলিপির, কবর খুঁড়ে তুলেছেন কত মমি, স্ট্যাচু, প্রাচীন আসবাবপত্র, মূল্যবান পাথর। কিন্তু তাতে কী লাভটাই বা হয়েছে? যে সরকারের জন্য, দেশের জন্য, পুরাতত্ত্বের সমৃদ্ধির জন্য এত পরিশ্রম করেছেন তিনি, রক্ত পানি হয়ে গেছে খাটতে খাটতে, সেই দেশ কিংবা সরকার তো তাঁকে কিছু দেয়নি। অন্তত পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত করার সম্মানটুকু পর্যন্ত দেখায়নি। তা হলে, শেষ বয়সে খ্যাতি এবং অর্থপ্রাপ্তির আশায় তিনি যদি একটু এদিক-সেদিক করেনই, তা হলে কি তাঁর খুব বেশি নিন্দা করা যায়?

তা ছাড়া মিসরের প্রায় সব পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানীরই মাথায় কমবেশি একটু ছিট আছে। অবশ্য দিনের পর দিন চাঁদি ফাটানো, মগজ গলিয়ে দেয়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে উত্তপ্ত বালু খননের মত বিরক্তিকর এবং একঘেয়ে কাজ আর নেই। মস্তিষ্ক রীতিমত বিদ্রোহ করে। আর মাটির নীচের ড্যাম্প পড়া নিকষকালো কবরগুলোর ভৌতিক আবহ শুকিয়ে দেয় আত্মা। প্রাচীন, ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতাদের দিকে তাকানোর ব্যাপারটিও খুব একটা সুখকর নয়, বিশেষ করে বেড়াল মাথার বুবাস্টিস্ট, নাগ দেবতা সেট এবং সাক্ষাৎ শয়তান আমন-রা পিরামিডের সামনে যেভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে, তাতে এদেরকে অগ্রাহ্য করে পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করার কথা ভাবতে অতি সাহসী লোকেরও বুক কাঁপে। নিষিদ্ধ এই এলাকার বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ

রক্তে যেন শিহরণ জাগায়, শিরায় শিরায় হেঁটে বেড়ায় কিলবিলে পোকার মত। সার রোনাল্ড শখের বশে কিছুদিন প্রেততত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। সম্ভবত এ কারণে ভৌতিক ব্যাপারগুলোর প্রতি অন্যদের চেয়ে তাঁর আকর্ষণ একটু বেশিই। তাই পার্চমেন্টের ম্যাপটা চুরি করতে তিনি দ্বিধা করেননি, যে কোনও মূল্যে এটা যোগাড়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই ম্যাপটি প্রাচীন মিসরের এক সন্ন্যাসীর দখলে ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী মোটেও ভাল লোক ছিলেন না। তিনি প্রেততত্ত্বের ওপর একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন। সন্ন্যাসী, বলাবাহুল্য ছিলেন প্রেতপূজারী। সার রোনাল্ড এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান সন্ন্যাসীর মমির সঙ্গে। তবে লেখাটি তিনি নষ্ট করেননি। ভয় ছিল যদি অভিশাপ নেমে আসে। সার রোনাল্ডের ধারণা যে কোনও কারণেই হোক সন্ন্যাসীর ওপর প্রেত দেবতাদের অভিশাপ নেমে এসেছিল। কারণ মমি করা সন্ন্যাসীর হাত, পা, চোখ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কেউ হাত আর পা ছিঁড়ে নিয়েছে, উপড়ে ফেলেছে চোখ। তবে এতদিন পরেও ছিন্নভিন্ন লাশে পচন ধরেনি। পশুচামড়ায় লেখা ছিল পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন মিসরীয় ভাষা জানেন বলে লেখাটি পড়তে অসুবিধে হয়নি সার বার্টনের। যতই পড়েছেন ততই বিস্মিত হয়েছেন, আগ্রহ বেড়েছে পরের পৃষ্ঠাগুলো পড়ার জন্যে। পড়তে পড়তে জানতে পারেন অন্ধকার রাজ্যের এক পিশাচ দেবতার কবরের কথা। এই দেবতা অশুভ আর ধ্বংসের প্রতীক, আলোর ঘোরতর শত্রু, আঁধারই তার চালিকাশক্তি। পাণ্ডুলিপির মধ্যে সার রোনাল্ড একটি ম্যাপ, একটি চার্ট এবং পিশাচ দেবতার গুহায় পৌঁছার সমস্ত নির্দেশনাও পেয়ে যান।

পিটার বার্টনের মনে আছে সেই রাতের কথা যে রাতে বাবা দুর্বোধ্য ওই পাণ্ডুলিপি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ওকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন। মনে পড়ে বাবার চোখ কী রকম ঝিকমিক

করছিল, যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছিল কথাগুলো।

'এবং মানচিত্রের নির্দেশানুযায়ী তুমি দেখতে পাবে সমাধির প্রভুকে যিনি তাঁর উপাসক এবং ধনরত্ন নিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন।'

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় উত্তেজনায় সার রোনাল্ডের কণ্ঠ যেন বসে গিয়েছিল।

'এবং প্রবেশের রাতে তোমাকে অবশ্যই শেয়াল দেবতার উদ্দেশে তিনটে শেয়ালকে উৎসর্গ করতে হবে, এবং তাজা রক্ত খেতে দিতে হবে শুষ্ক বালুকে। তারপর নেমে আসবে অসংখ্য ক্ষুধার্ত বাদুড়, এরা শেয়ালগুলোকে ভক্ষণ করবে এবং রক্ত নিয়ে চলে যাবে অন্ধকার জগতে পিতা সেট-এর উদ্দেশ্যে।'

'এ স্রেফ কুসংস্কার,' বলেছিল পিটার।

'বাজে কথা বলিস না,' পিটারকে ভর্ৎসনা করেছিলেন সার রোনাল্ড। 'এই রচনার প্রতিটি জিনিস আমি তোকে ব্যাখ্যা করতে পারি, বোঝাতে পারি। কিন্তু তাতে তোর ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।' পিটার আর কিছু না বলে শুনে গেছে। 'বাইরের চত্বরে আসার পর তুমি দরজাটা দেখতে পাবে, দরজার গায়ে প্রভুর চিত্রাঙ্কিত প্রতীক। প্রতীকটির সপ্তম মস্তকের সপ্তম জিভটি ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে দরজা থেকে ছুটিয়ে আনবে। তারপর খুলে যাবে দরজা এবং সমাধি কক্ষে ঢোকার অধিকার একমাত্র হবে তোমারই। ভেতরের চত্বরে যেতে তোমাকে গুনে গুনে তেত্রিশবার পা ফেলতে হবে, তারপরই তুমি সোজা গিয়ে উপস্থিত হবে অ্যানুবিসের মূর্তির সামনে। যার আরেক নাম পথপ্রদর্শক।

'অ্যানুবিস! এটা মিসরীয়দের এক দেবতার নাম না?' অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে পিটার।

তারপর বাবা পাণ্ডুলিপি দেখে ছেলের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

'প্রভু অ্যানুবিস-এর হাতে আছে জীবন এবং মৃত্যুর চাবিকাঠি, তিনি গুপ্ত কার্নেটারকে পাহারা দেন, এবং কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া অবগুণ্ঠন উত্তোলন করতে পারে না। এই শেয়াল দেবতাকে যদি কেউ বন্ধু ভেবে থাকে, তা হলে সে মহা ভুল করবে। কারণ তিনি বন্ধু নন। অ্যানুবিস ছায়ার দেবতা, আর এ জন্যেই তিনি সকল রহস্য গোপন রাখেন। বহু আগে, যে দিনের হিসেব কেউ জানে না, সেই সময় প্রভু অ্যানুবিস মানুষের সামনে প্রথমবারের মত উপস্থিত হয়েছিলেন। দেবতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এক বিশেষ চেহারায়, তাঁর প্রকৃত রূপে হাজির হন। তাঁর সেই বিশেষ চেহারা তুমি দেখতে পাবে ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায়। দেখতে পাবে পথপ্রদর্শক-এর আসল চেহারা।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার তো!' বিড়বিড় করে বলেছে পিটার। 'ব্যাপারটা সত্যি হলে কী অবস্থা হবে চিন্তা কর একবার? শেয়াল দেবতার বিকট চেহারার আসল রূপ সামনাসামনি দেখার কথা ভাবা যায়!'

সার রোনাল্ড হেসেছেন শুধু, কোনও মন্তব্য করেননি। আবার পড়ায় মনোনিবেশ করেছেন তিনি।

'দেবতার প্রথমদিকের চেহারা বাকিগুলো থেকে ভিন্ন' বর্ণনা করেছে পাণ্ডুলিপি। 'তবে এই চেহারা দেখা সাধারণ মানুষের জন্যে মঙ্গলজনক নয়, তাই পূজারী প্রভুরা যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রকৃত চেহারা লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর প্রয়োজন অনুসারে তাঁর পূজা করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের শত্রুরা—ওদের আত্মা পুড়ে মরুক, পচন ধরুক শরীরে।—ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা করার সাহস দেখালে প্রভু তাঁর প্রতিবিম্ব লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর প্রতিবিম্বকেও কবর দেয়া হয়।'

শেষের লাইনগুলো সার রোনাল্ড আরও দ্রুত পড়ে গেছেন, বার বার কেঁপে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ: 'কিন্তু গুহার শেষ মাথায়

অ্যানুবিস শুধু এই কারণে একা দাঁড়িয়ে নেই। তিনি আক্ষরিক অর্থেই পথপ্রদর্শক, এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া কেউ সমাধির ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।'

এই পর্যন্ত পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকেছেন বুড়োমানুষটি।

'কী হলো?' অধৈর্য পিটার জানতে চেয়েছে। 'আমার ধারণা এই শেয়াল দেবতাকে নিয়েও অনেক আজগুবি পূজা-অর্চনার কথা আছে, তাই না?'

সার রোনাল্ড জবাব দেননি, নীরবে কী যেন ভাবছিলেন। পিটার লক্ষ করেছে পার্চমেন্ট ধরা বাবার হাত দুটো কাঁপছে। যখন চোখ তুলে চেয়েছেন, ভয়ানক বিমর্ষ লাগছিল তাঁকে। 'হ্যাঁ, খোকা'–ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিয়েছেন তিনি। 'ঠিক তাই–আরেক অনুষ্ঠানের কথা বলা আছে ওখানে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার আগে এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'তার মানে তুমি ওখানে যাবে–জায়গাটা খুঁজে দেখবে?' উৎসুক হয়ে শুধিয়েছে ছেলে। 'অবশ্যই যাব,' যেন জোর করে কথাটা বলানো হয়েছিল তাঁকে। পার্চমেন্টের শেষ ভাগে আবার নজর ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি:

'কিন্তু সাবধান, অবিশ্বাসীরা কিন্তু এখানে প্রবেশ করলেই মরবে। প্রভু অ্যানুবিসকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুনো হয়তো সম্ভব হবে, তবে তিনি অনুপ্রবেশকারীকে বাইরের পৃথিবীতে ফেরত যেতে দেবেন না। মনে রেখ অ্যানুবিস এক অদ্ভুত দেবতা যার মধ্যে রয়েছে এক গোপন আত্মা।'

সার রোনাল্ড এই ক'টা লাইন অস্ফুটে খুব দ্রুত পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে ফেলেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আলোচনার মোড় ভিন্ন প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে নেন। যেন এই ব্যাপারটাকে ভুলে থাকতে চাইছেন।

পরের সপ্তাহ বাপ-ছেলের কেটে যায় দক্ষিণে অভিযানের জন্য যোগাড়যন্ত্রে। পিটার অবাক হয়ে লক্ষ করে বাবা যেন

তাকে কেমন এড়িয়ে চলছেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। শুধু ভ্রমণ বিষয়ক আলোচনা হলে দুজনের কথা হয়। কিন্তু পিটার কিছুই ভোলেনি। তার প্রশ্ন বাবা নীরবে সেদিন কী পড়ছিলেন। কেন তাঁর হাত কাঁপছিল, কেনই বা হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে তিনি চলে গিয়েছিলেন। আর পার্চমেন্টটা নিয়ে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? পাণ্ডুলিপির শেষে যে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে আসলে সেটা কী?

পিটারের মাথায় প্রশ্নগুলো কদিন বেশ কুট কুট করে কামড়ালেও ধীরে ধীরে এটার কথা ভুলে যায় সে, অনেকটাই দূর হয় ভয়। ভ্রমণের জন্য দুজনের ব্যস্ততা এত বেড়ে যায় যে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় তাদের ছিল না। আসল জায়গায় পৌঁছার পর এলাকাটার নির্জনতা চারদিক থেকে চেপে বসে পিটারকে। আবার ফিরে আসে সেই ভয় এবং দুশ্চিন্তা। সার রোনাল্ড একবার তাকে মিসরীয়দের প্রেততত্ত্বের ওপর কিছু কথা বলেছিলেন, প্রধান ধর্মযাজকদের অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছে সে তার বাবার কাছে। এটা তাদের সেই জন্মস্থান। পিটারের দু'একজন বন্ধুর সবাই অভিশাপের ব্যাপারটি বিশ্বাস করত। এদের প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে অদ্ভুতভাবে। এ ছাড়াও রয়েছে তুতানখামেন এবং পট মন্দিরের রোমহর্ষক ঘটনা। গভীর রাতে, তারা জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে এ সব গল্প মনে করত। সামনে তার জন্য না জানি কী বিপদ ওত পেতে আছে ভেবে শিউরে উঠত। তারপর, মানচিত্রে চিহ্নিত নির্দিষ্ট জায়গায় সার রোনাল্ড তাঁবু বসালে নতুন আরেক অশুভ সঙ্কেতের সূচনা হয়।

আস্তানা গাড়ার প্রথম রাতেই সার রোনাল্ডকে তাঁবুর পেছনের দিকের পাহাড়ে একা যেতে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে পিটার। বাবার হাতে রশি বাঁধা একটি সাদা ছাগল এবং মস্ত ধারাল ছুরি দেখে সন্দেহ আরও বেড়ে যায় তার। পিছু নেয় সে।

তারপর ঘটে সেই ঘটনা। ছাগলটি জবাই করেন সার রোনাল্ড। অবোধ পশুটার ফিনকি ছোটা রক্ত মুহূর্তে শুষে নেয় শুকনো বালু। বাবার চোখে তখন কসাইদের উৎকট উল্লাস।

একটি ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে থেকে পিটার শোনে বাবা দুর্বোধ্য উচ্চারণে মিসরীয় স্তোত্র আউড়ে চলেছেন। পিটার ভয় পাচ্ছিল ভেবে বাবা তার উপস্থিতির কথা জেনে গেলে হয়তো আর তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হবেন না। তবে বাবার আচরণে কেমন ক্ষ্যাপামো একটা ভাব তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

কিন্তু বাবার কাছে বলি বলি করেও সে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না। পার্চমেন্টের সেই রহস্য নয়, গোপন 'অভিশাপ' নিয়ে।

মাঝরাতের ওই ঘটনার পর দিন সার রোনাল্ড চার্ট দেখে বলেন এখন খনন শুরু করা চলে। ম্যাপে চোখ রেখে, বালিতে প্রতিটি পা মেপে তিনি তাঁর লোকদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। সন্ধ্যার দিকে দশ ফুট ব্যাসার্ধের বিরাট একটি গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে যায়, যেন হাঁ করে আছে কোনও দানব মুখ। খনন পর্ব শেষ হতেই স্থানীয় শ্রমিকরা উল্লসিত চিৎকার দিয়ে জানায় গর্তের নীচে একটি দরজা দেখতে পেয়েছে তারা।

## দুই

টেনশনের চোটে পিটারের অবস্থা কাহিল। বাবা ওকে নীচে নামতে বলেছেন। সামনে ভীষণ বিপদ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে পিটারকে। কিন্তু বাবাকে যেতে নিষেধ করার সাহস তার নেই। যাব না কথাটি উচ্চারণ করতে পারেনি ও। কারণ তার ভয় এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সার রোনাল্ড কোনও অঘটন ঘটিয়ে

ফেলতে পারেন। বিশ্রি, পেট গুলিয়ে ওঠা গর্তটার মধ্যে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে নেমে পড়ে পিটার।

পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত দরজাই ছিল ওটা। দরজার গায়ে, ঠিক মাঝখানে মিসরীয়দের সাত প্রধান দেবতার মাথার ছবি–অসিরিস, ইসিস, রা, বাস্ত, থথ, সেট এবং অ্যানুবিস। তবে সবচে' ভয়ঙ্কর ব্যাপার সাতটা মাথার অধিকারী সাতজন নয়, একজন। আর ওটা কোনও মানুষের শরীরও ছিল না, ভয়াবহ এই আকৃতির সঙ্গে তুলনা করার মত উপমা বোধহয় মিসরীয় কোনও বইতেও নেই। অন্তত ওই মুহূর্তে পিটারের কিছু মনে পড়েনি।

সাত মাথার ভয়াল ভয়ঙ্কর জিনিসটা দেখামাত্র ভয়ে প্রায় জমে যাচ্ছিল পিটার, আতঙ্কের অক্টোপাস যেন চারপাশ থেকে ওকে তড়িৎ গতিতে চেপে ধরেছিল। সাত মাথার নীচের অংশটার যেন দ্রুত রূপান্তর ঘটছিল; মনে হচ্ছিল গলে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত সব আকার ধারণ করছিল ওটা। কখনও ওটাকে মনে হয়েছে সর্পিণী মায়াবিনী মেডুসা, কখনও বিশাল, বিকট ভ্যাম্পায়ার ফুলের চেহারা ধারণ করেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে বিরাট পাতা, যেন রক্ত-তৃষ্ণায় বাতাসে দুলছিল। তারপরই চোখের পলকে ওটা পরিণত হয়েছে একদলা চকচকে রুপালি খুলিতে। আবার পরক্ষণে রুপালি খুলির রূপান্তর ঘটেছে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, অজস্র তারকা আর গ্রহসহ।

এ যেন এক দুঃস্বপ্ন। কোনও শিল্পীর পক্ষে এমন বীভৎস ছবি আঁকা সম্ভব নয়। একমাত্র শয়তানের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব। সাত মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল পিটার। বাস্তবে ফিরে আসে বাবার ডাক শুনে। সার রোনাল্ড সকালবেলাতেও কাঠখোট্টা ব্যবহার করলেও এখন তাঁর চেহারা আমূল বদলে গেছে। রীতিমত উৎসুক গলায় তিনি ঘোষণা করেন। 'এটাই সেই দরজা। এই দরজার কথাই পার্চমেন্টে লেখা আছে। এখন বুঝতে পারছি প্রিন তাঁর

শয়তানের পূজা অধ্যায়ে কীসের কথা বলতে চেয়েছেন। ওই অংশে তিনি দরজায় প্রতীকের কথা উল্লেখ করেছেন। যাকগে, কাজ শেষ হবার পর আমরা এটার কয়েকটা ছবি তুলব। আশা করি ছবি নিয়ে নিরাপদেই ফিরতে পারব। স্থানীয়রা কোনও ঝামেলা করবে না।'

সার রোনাল্ডের কণ্ঠে খুব বেশি উৎসাহের সুর। ব্যাপারটা ভাল লাগল না পিটারের, বরং ভয় হলো। হঠাৎ মনে হলো সে তার বাবাকে খুব কম চেনে। বাপের সাম্প্রতিক গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও সে কত কম জানে।

গতরাতেও সে তার বাবাকে দেখেছে একটা সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে, হাতে মরা বাদুড়। বাবাকে পাগল সন্ন্যাসীদের মত মনে হচ্ছিল। বাবা কি সত্যি এসব ছাইপাঁশ বিশ্বাস করেন!

'এখন!' বিজয় উল্লাস বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'ছুরিটা নিয়েছি। পিছনে যাও।'

ভীত, বিস্মিত চোখে পিটার দেখল বাবা ছুরির ডগাটা সপ্তম মাথা অর্থাৎ অ্যানুবিসের নীচে গাঁথলেন। খরখর শব্দ হলো, তারপর কুকুরমুখো মাথাটা ধীরে ঘুরে যেতে লাগল যেন গোপন কোনও হাতলের সাহায্যে। ঝনঝন শব্দে খুলে গেল দরজা, প্রতিধ্বনিটা অনেকক্ষণ রইল।

একটা তীব্র, ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে বাড়ি খেল। গন্ধটা নাক সয়ে এলে সার রোনাল্ড দ্রুত পা রাখলেন ভেতরে। সঙ্গে পিটার। পাণ্ডুলিপির নির্দেশ অনুযায়ী গুনে গুনে তেত্রিশ পা এগোলেন। তারপর মুখোমুখি হলেন অ্যানুবিসের।

মশালের আলোয়, পিটারের মনে হলো....মূর্তিটার গায়ের রং পাল্টে যাচ্ছে। ঠোঁটের হাসিটা হঠাৎই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল, কঠিন হয়ে উঠল চেহারা, দুই ঠোঁটে ফুটল প্রবল নিষ্ঠুর ভাব। হাঁ করে অ্যানুবিসের এই পরিবর্তন দেখছে পিটার, চমক ভাঙল সার রোনাল্ডের ডাকে।

'শোন, খোকা, সেদিন রাতে পার্চমেন্টের সমস্ত কথা তোকে বলিনি। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে একটা অংশ আমি মনে মনে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ওই অংশটা। তোকে জানতে না দেয়ার পেছনে অবশ্যই কারণ ছিল। কারণ পুরোটা জানলে তুই হয়তো ভুল বুঝে এখানে আসতে চাইতি না। তাই সব কথা বলার ঝুঁকিটা ও সময় নিতে চাইনি।

'তুই জানিস না, পিটার, এই মুহূর্তটি আমার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর আমি এমন সব গোপন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি যা অন্যের কাছে স্রেফ আজগুবি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু আমি এসব বিশ্বাস করতাম। প্রতিটি বিস্মৃত কর্মের পেছনে একটি নগ্ন সত্য থাকে; বিকৃত ঘটনাও বৈধতা পেয়ে বাস্তবতায় নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আর এ ধরনের কোনও ঘটনার সন্ধানে আমি বহুদিন নিরলস কাজ করেছি-বিশ্বাস করতাম এরকম কোনও সমাধি যদি আবিষ্কার করতে পারি তা হলে গোটা বিশ্বকে প্রমাণ এবং যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সমর্থ হব। এই মূর্তির মধ্যে সম্ভবত গোপন প্রেতপূজারীদের মমি রয়েছে। তবে তার জন্য আমি আসিনি। আমি এসেছি তাঁদের জ্ঞানের সন্ধানে। যে জ্ঞান তাদের সঙ্গে একই সময় কবর দেয়া হয়। এসেছি সেই প্যাপিরাসের পাণ্ডুলিপির খোঁজে যাতে আছে নিষিদ্ধ গোপন সব তথ্য—জ্ঞান, যার কথা পৃথিবীর মানুষ কখনও জানার সুযোগ পায়নি। জ্ঞান—এবং ক্ষমতা!

'ক্ষমতা! আমি ব্ল্যাক টেম্পলের কথা পড়েছি, পড়েছি সেই গভীর ধর্মবিশ্বাসের কথা যে ধর্মকে পরিচালনা করতেন পার্চমেন্টে উল্লিখিত প্রভুরা। তাঁরা জাদুটোনা করার মত সাধারণ সন্ন্যাসী ছিলেন না; তাঁরা এ ভূলোক ছেড়েও দ্যুলোকে বিচরণ করতেন। তাঁদের অভিশাপকে সবাই ভয় পেত, আশীর্বাদকে করত সম্মান। কেন? কারণ তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার অসীম ছিল

বলে। বিশ্বাস কর পিটার, এই সমাধির মধ্যে আমরা যে গোপন তথ্যের খোঁজ পাব তা দিয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারব। মৃত্যু-রশ্মি, তীব্র বিষ, প্রাচীন গ্রন্থ আর জাদুবিদ্যার সম্মিলিত শক্তি দিয়ে আবার অন্ধযুগের দেবতাদের পুনর্জন্ম ঘটাতে পারব। ভাব একবার ব্যাপারটা। এই ক্ষমতার অধিকারী যে কেউ গোটা দেশকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারবে, পারবে শাসন করতে এবং তার শত্রুদের ধ্বংস করতেও সে এ জ্ঞান ব্যবহার করবে। তার থাকবে অজস্র ধনরত্ন, সম্পদের পাহাড়, বিলাস বৈভব, হাজার সিংহাসনের বিপুল সমারোহ।'

বাবা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে, ভাবল পিটার। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছে হলো। এই ভয়াল অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে সুনীল আকাশ দেখার প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করল সে, খাঁটি, তাজা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নেয়ার আকাঙ্ক্ষায় আঁইটাঁই শুরু করল ফুসফুস। এই মৃত–শতাব্দীর ধুলাবালির কবল থেকে মুক্তি চায় সে। দৌড় দিয়েওছিল পিটার কিন্তু সার রোনাল্ড খপ করে ওর কাঁধ চেপে ধরলেন, টান দিয়ে ওকে ঘোরালেন তাঁর দিকে।

'তুই দেখছি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারিসনি।' বললেন তিনি। 'ঘটে হলুদ পদার্থ থাকলে অবশ্য বুঝতি। যাকগে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আমার মিশন সম্পর্কে নিশ্চিত। তুইও হবি। তবে আগে আমাকে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। এখন তোকে পার্চমেন্টের সেই অংশটা, যেটা আমি পড়ে শোনাইনি, তাতে কী লেখা ছিল, বলব।' পিটারের মস্তিষ্কে যেন সতর্ক ঘণ্টি বেজে উঠল। কে যেন বলতে লাগল পালাও–পালাও! কিন্তু সার রোনাল্ড ওকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আছেন। পালাবার উপায় নেই। তাঁর গলা কাঁপছে।

'যে অংশের কথা আমি বলছি তাতে লেখা ছিল কীভাবে এই মূর্তি পার হয়ে সমাধিতে ঢুকতে হবে। মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে লাভ নেই, নতুন কিছু আবিষ্কার হবে না; আর এর মধ্যে

গোপনীয়তা বলেও কিছু নেই, দেবতার এই শরীরে কোনও যন্ত্রাংশও নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর উপাসকরা এসব কাঁচা কাজ করতে যাননি। সমাধিতে ঢোকার রাস্তা একটাই–দেবতার শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।' অ্যানুবিসের মুখোশের মত ভয়ঙ্করদর্শন চেহারাটার দিকে আবার তাকাল পিটার। শেয়াল মুখটাতে ধূর্ততার ছাপ সুস্পষ্ট নাকি এ স্রেফ আলোছায়ার খেলা?

'কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।' বলে চলেছেন সার রোনাল্ড। 'তোর নিশ্চয়ই মনে আছে পার্চমেন্টে এই মূর্তিটিকে অন্য সবার থেকে আলাদা বলা হয়েছে? কিন্তু অ্যানুবিস কী করে পথপ্রদর্শক হলো আর এর গোপন আত্মার ব্যাপারটিই বা কী? পরের লাইনেই অবশ্য এ কথার জবাব আছে। মনে হয় মূর্তিটি একটি পিভট (Pivot)-এর ওপর ভর করে ঘুরতে পারে আর ওটার পেছনের একটা অংশ খুলে ফাঁকা হয়ে যায়। সংযোগ ঘটে সমাধির সঙ্গে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হবে যখন মূর্তির মধ্যে জাগবে মনুষ্য সচেতনতা।'

আমরা আসলে সবাই পাগল, ভাবল পিটার। আমি, বাবা, প্রাচীন সন্ন্যাসীরা এমনকী এই মূর্তিটাও। সমস্ত অশুভ যেন এক গিঁটঠুতে বাঁধা। 'এর অর্থ একটাই। আমি দেবতার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সম্মোহিত করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মাহিত থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার আত্মা এই মূর্তির শরীরে প্রবেশ করে এবং সমাধিস্তম্ভের প্রবেশদ্বার খুলে যায়।'

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত যেন জমিয়ে দিল পিটারকে।

'তবে এটাকে উদ্ভট কোনও চিন্তা ভেবে অবজ্ঞা করিস না। যোগীরা বিশ্বাস করেন এভাবে অন্যের শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব। আত্মসম্মোহন সব জাতির মধ্যেই স্বীকৃত একটি বিষয়। আর সম্মোহনবিদ্যা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। হাজার বছরেরও আগে থেকে এই সত্যের চর্চা হয়ে আসছে। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা সম্মোহনের ব্যাপারটি খুব ভাল জানতেন। আর আমিও এখন

তাই করতে যাচ্ছি। নিজেকে সম্মোহন করব আমি এবং আমার আত্মা বা সচেতনতা মূর্তির মধ্যে ঢুকে যাবে। আর আমি তখনই শুধু সমাধিস্তম্ভ খুলতে পারব।'

'কিন্তু ওই অভিশাপ!' বিড়বিড় করে বলল পিটার। 'অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে ওতে কী বলা হয়েছে তুমি তো জানই—যারা বিশ্বাস করে না যে প্রভু অ্যানুবিস এই সমাধিস্তম্ভের পথপ্রদর্শকই শুধু নয়, রক্ষাকর্তাও বটে। এই অবিশ্বাসীদের ওপর অভিশাপ নেমে আসার কথাও তো বলা হয়েছে। তার কী হবে?'

'দূর দূর ওসব খেলো কথা।' সার রোনাল্ড দৃঢ় গলায় বললেন। 'সমাধি লুটেরাদের ভয় দেখাতে ওসব অভিশাপ-টভিশাপের কথা বলা হয়েছে। যা থাকুক কপালে ঝুঁকি আমি নেবই। তুই শুধু দেখ আমি কী করি। আমি যখন সম্মোহিত হয়ে পড়ব তখন মূর্তিটা নড়ে উঠবে এবং ওটার নীচের অংশটা খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুই ভেতরে ঢুকে যাবি। তারপর আমাকে জোরে ঝাঁকুনি দিলেই আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসব।'

বাবার আদেশ অমান্য করতে পারল না পিটার। মশালটা উঁচু করে ধরল, আলো সরাসরি বিচ্ছুরিত হতে লাগিল অ্যানুবিসের মুখের উপর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পিটার, দেখল বাবা শেয়াল দেবতার চোখে চোখ রেখেছেন। পাথুরে, ঠাণ্ডা দু'জোড়া চোখ।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর: দুজন মানুষ, বারো ফুট লম্বা এক দেবতা, মাটির নীচে এক অন্ধকার ঘরে পরস্পরের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। সার রোনাল্ডের ঠোঁট নড়তে শুরু করল। প্রাচীন মিসরীয় স্তোত্র পাঠ করছেন। অ্যানুবিসের কপালে আলো জ্বলজ্বল করছে, সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। আস্তে আস্তে তাঁর দৃষ্টি চকচকে হয়ে এল; চোখে পলক পড়ছে না, তারায় ফুটে উঠল অদ্ভুত এক নিষ্প্রাণ জ্যোতি। হঠাৎ তাঁর শরীর

একদিকে নুয়ে পড়ল, যেন পৈশাচিকভাবে সমস্ত শক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আতঙ্কিত পিটার দেখল তার বাবার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তিনি হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। কিন্তু দেবত্মার চোখ থেকে একবারও দৃষ্টি ফেরালেন না। এভাবে কেটে গেল বেশ ক'টি মুহূর্ত। মশাল উঁচিয়ে রাখতে রাখতে পিটারের বাঁ হাতে ঝিঁঝি ধরে গেল।

পিটার কিছু ভাবতে পারছে না। তার বাবাকে এর আগেও বহুবার আত্মসম্মোহন করতে দেখেছে সে আয়না আর আলো নিয়ে। কিন্তু বদ্ধ ঘরে বিপদের কোনও আশঙ্কা ছিল না। আর এখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাবা কি পারবেন মিসরীয় এই দেবতার শরীরে প্রবেশ করতে? যদি পারেনই তা হলে ওই অভিশাপ? প্রশ্ন দুটো বার বার আলোড়িত হতে থাকে পিটারের মনে। কিন্তু কোনও জবাব পায় না। হঠাৎ ব্যাপারটা লক্ষ করল সে। প্রচণ্ড ভয়ে যেন জমে গেল। ওর বাবার চোখে মরা মানুষের শেষ চাউনি, সচেতন ভাবটা সম্পূর্ণ উধাও। কিন্তু দেবতার চোখ–অ্যানুবিসের দৃষ্টি এখন আর নিষ্প্রাণ এবং পাথুরে নয়। ভয়ঙ্কর মূর্তিটা জেগে উঠেছে! ওর বাবা তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। কাজটা করেছেন তিনি–সম্মোহনের মাধ্যমে নিজের সচেতনতাবোধ মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন। কিন্তু এখন? এরপর কী ঘটবে? বাবা বলেছিলেন তাঁর আত্মা সরাসরি সমাধিস্তম্ভে প্রবেশের পথ খুলে দেবে। কই, সেরকম তো কিছুই ঘটছে না। কারণ কী?

শঙ্কিত এবং ভীত পিটার উবু হয়ে পরীক্ষা করল সার রোনাল্ডের শরীর, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ একটা শরীর। মারা গেছেন সার রোনাল্ড বার্টন। ঝট করে পিটারের মনে পড়ল পার্চমেন্টের সেই ভয়ঙ্কর সাবধানবাণী:

*যারা বিশ্বাস করবে না তারা মরবে। প্রভু অ্যানুবিসকে পাশ কাটিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া হয়তো সম্ভব হবে, কিন্তু তিনি আর*

*অনুপ্রবেশকারীকে বাইরের পৃথিবীতে ফেরত যেতে দেবেন না। মনে রেখ, অ্যানুবিস এক অদ্ভুত দেবতা যার মধ্যে রয়েছে এক গোপন আত্মা।*

গোপন আত্মা! কেঁপে উঠল পিটার। মশালটা উঁচিয়ে ধরে সোজা শেয়াল দেবতার চোখের দিকে চাইল। অ্যানুবিসের ঠাণ্ডা পাথুরে চোখ দুটো জ্যান্ত!

পৈশাচিকভাবে জ্বলজ্বল করছে অশুভ দেবতার দুই চোখ। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই যেন উন্মাদ হয়ে গেল পিটার। ওর মাথা শূন্য হয়ে গেছে। কিছুই ভাবতে পারছে না। তার মাথায় দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে শুধু একটাই ব্যাপার–তার বাবা মারা গেছেন। আর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী এই মূর্তিটা। যেভাবেই হোক বাবাকে হত্যা করে সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিকট চিৎকার দিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল পিটার বার্টন, দমাদম ঘুসি মারতে লাগল পাথরের মূর্তির বুকে। হাত ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করল, রক্তাক্ত মুঠিতে চেপে ধরল সে অ্যানুবিসের শীতল দুই পা, টানতে লাগল। যেন উল্টে ফেলবে। কিন্তু এক চুল নড়ল না দানব-মূর্তি। বিকট চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল পিটার। বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কী করছে নিজেও জানে না। মূর্তিটা যেন ওর দুর্দশা দেখে আনন্দ পাচ্ছে, ভেঙচি কাটছে। পাগলের মত ওটার গা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল পিটার। থেকে থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে ওর শরীর, ফোঁপাচ্ছে, বাবার কথা বলছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে। চোখে খুনের নেশা। যেন ভেঙচি কাটা মুখটাকে ধ্বংস করে দেবে।

অ্যানুবিসের মাথার কাছে পৌঁছুতে কত সময় লেগেছে জানে না পিটার। হঠাৎ ওর সম্বিত ফিরে এল। লক্ষ করল মূর্তিটার ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। পা ঝুলছে মূর্তির পেটের কাছে। উন্মাদ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভয়ঙ্কর এবং জ্যান্ত চোখ দুটোর

দিকে।

হঠাৎ গোটা মুখটা যেন বেঁকে যেতে শুরু করল। ফাঁক হয়ে গেল পাথুরে ঠোঁট, বিশাল এক গহ্বরের সৃষ্টি হলো মুখে, নড়ে উঠল হাত। লম্বা, প্রসারিত হাত দুটোর আঙুলগুলো বাঁকানো, যেন ছোবল দেবে কালনাগিনী। বিদ্যুদ্বেগে হাত দুটো পিটারকে শক্ত, পাথুরে বুকের সঙ্গে মরণ আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল, পরক্ষণে আঙুলগুলো চেপে বসল ওর গলায়। হাঁ করা মুখটা নেমে এল নীচে, ধারাল দাঁতে কামড় বসাল পিটারের ঘাড়ে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা উষ্ণ রক্ত ভিজিয়ে দিল প্রতিহিংসায় উল্লসিত ত্রিশ হাজার বছরের পুরোনো অশুভ দেবতার মুখ।

পরদিন স্থানীয় লোকেরা পিটারের রক্তশূন্য, হাড়গোড় ভাঙা লাশটা আবিষ্কার করল অ্যানুবিসের পায়ের নীচে। সার রোনাল্ডের প্রাণহীন দেহটাও তার পাশে চিৎ হয়ে আছে। দেবতার অভিশাপের ভয়ে সমাধিতে ঢোকার সাহস কারও হলো না। বরং দরজা বন্ধ করে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। তারা বলল বুড়ো এবং তরুণকে 'ইফেন্দি' হত্যা করেছে। আর এই মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল। কারণ দেবতা অ্যানুবিস অনুপ্রবেশকারীদের সহ্য করেন না।

সবাই চলে যাবার পর আবার কবরের নিস্তব্ধতা এবং অমাবস্যার কালো অন্ধকার নেমে এল পাতাল ঘরটিতে। স্থানীয়রা এখান থেকে চলে যাবার আগে দেখে গেছে অ্যানুবিসের নিষ্প্রাণ পাথুরে মূর্তির চোখে জীবনের কোনও আভাস নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে পিটার বার্টন যা জেনে গেছে তা কেউ জানতে পারেনি, কোনওদিন জানবেও না। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে পিটার দেখেছে অ্যানুবিসের পৈশাচিক পাথুরে চোখের জায়গায় ছলছল করছে ওর বাবার দুই চোখ!

## রাক্ষুসে ক্ষুধা

দুটো চকচকে বাদামী ক্যাপসুল গিলে নিল মনরো। তাকাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। হাসল। আজকাল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসতে পছন্দ করে মনরো। তার দাঁতগুলো এখন ধবধবে সাদা। দশ বছর বয়স থেকে প্রতি বছর তিন মাস দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে যাতায়াত তার নিত্য রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তার দাঁতে কোনও সমস্যা নেই। সমান, মসৃণ, চৌকোনা দাঁতগুলো হিরের মত ঝকঝক করছে।

এক কদম পিছিয়ে এল মনরো, কনুই ঘষা খেল বাথরুমের বিদ্যুৎ-বাতির সুইচে। মাথার ওপরের বাতিটি নিভে গেল। তবে মনরো আঁধারেও দিব্যি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবকিছু। ওর জীবনে এটা আরেকটা চমকপ্রদ ঘটনা; ওর আশ্চর্য নৈশ-দৃষ্টি। ক্যাপসুলগুলো খাওয়ার পর থেকে মনরোর জীবনে অভূতপূর্ব সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সবচেয়ে পরিবর্তন এসেছে খাদ্যাভ্যাসে। যে মনরোর এক সময় খাবার দেখলেই গা গোলাত এখন তার খিদে বেড়ে গেছে বহুগুণ।

বোর্ডিং হাউজের ডাইনিং রুমে ঢুকল মনরো। তার টেবিলটা যথারীতি খালি। অথচ মাসখানেক আগেও টেবিলটা খালি পেত না সে। আজকাল মনরো নিঃশব্দে খাওয়া সারে, তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকা অন্য ভাড়াটেদের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই,

তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওর একটু এক্সারসাইজ করা দরকার। হ্যাটখানা মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মনরো।

রাস্তায় নেমে বুক ভরে দম নিল ও। ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা দিল পিঠে। হাঁটা ধরল মনরো। শহরের শেষ প্রান্তে আসার পরে শুরু করল দৌড়। বিরামহীন তিন ঘণ্টা দৌড়াল সে। সামান্য ক্লান্ত বোধ করছে। এবার বাড়ির ফিরতি পথ ধরল মনরো। রাস্তার পাশে একটি লাঞ্চবার-এ আটকে গেল নজর। কাউন্টারের সামনে রাখা একটি টুলে বসে পড়ল সে। আরেকটা টুলে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল। পড়তে লাগল। মনোযোগে ছেদ পড়ল কাউন্টারম্যানের কণ্ঠে:

'শুনুন, মিস্টার, আমি জানি না আপনি কে বা কী, তবে আপনি যে-ই হোন, এখান থেকে উঠে পড়ুন। পনেরো মিনিট আগে শর্টসার্কিট হয়ে বিদ্যুৎ চলে গেছে। অথচ অন্ধকারে বসে আপনি কিনা পেপার পড়ছেন! ফোটেন তো, মিয়া!'

কাঁধ ঝাঁকাল মনরো, চলে এল ওখান থেকে। আবার হাঁটতে লাগল। রাতের বেলা এই হাঁটাহাঁটি নতুন কিছু নয়। কিছুদিন আগে, যখন ও ছিল নিতান্তই রোগা-পটকা, বেঁটে, খুদে একটা মানুষ—তখনও সান্ধ্যভ্রমণ করত মনরো। হাঁটত যাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুম আসে।

আর হাঁটাহাঁটি করতে গিয়েই লোকটার সঙ্গে ওর পরিচয়।

**বসন্তের** শেষের দিকের এক রাতের ঘটনা ছিল ওটা। মনরো **হাঁটতে** হাঁটতে অচেনা একটি রাস্তায় চলে এসেছে, এমন সময় **ধোঁয়া** চোখে পড়ল ওর। একটি বাড়ির সামান্য খোলা একটি দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ফায়ার ড্রিলের ট্রেনিং নেয়া মনরোর চোখ প্রথমেই রাস্তায় ফায়ার অ্যালার্ম বক্স খুঁজল। তারপর পুলিশের সন্ধান করল। এরপর পথচারীর খোঁজ করল।

কিন্তু কিছু বা কাউকে চোখে পড়ল না। বুক ভরে শ্বাস নিল মনরো, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ঘরে। বাড়িতে একটিই মাত্র ঘর। আর ধোঁয়ার পাতলা একটি রেখা উঠছে এই ঘর থেকেই। ঘরের মাঝখানে তিন ঠেঙা টেবিলের ওপর রাখা পিতলের একটি পাত্র থেকে ধোঁয়ার উৎপত্তি। ধোঁয়ার সামনে, মনরোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্রকায়, বাঁকা পায়ের একটি মানুষ। তার পরনের আলখেল্লার নীচের অংশ মাটিতে লুটোচ্ছে। বেঁটে লোকটি মনরোর দিকে ফিরে তাকালও না, ইশারায় দেয়ালে ঠেস দেয়া কাউচে বসতে বলল।

কাউচের কিনারায় বসল মনরো। পিতলের পাত্র থেকে লকলকে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে মাঝে মাঝে আলোকিত করে তুলছে ঘর। ক্ষুদ্রকায় মানুষটির আলখেল্লার সোনার কাজ করা কারুকাজ ঝলমল করে উঠছে। আলখেল্লায় চাঁদ, ছাগলসহ অচেনা ছোট ছোট কিছু জন্তুর ছবি। বেঁটে মানুষটি ঘুরল:

'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি। খুবই খুশি। ভেবেছিলাম কেউই বুঝি আসবে না।'

মনরো হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে।

লোকটি হাত ঝাড়া দিতেই তার হাতে যেন ভোজবাজির মত উদয় হলো একটি ছোট প্যাডের কাগজ এবং পেন্সিল। সে পেন্সিলে কী যেন লিখল। তারপর বলল, 'ভিটামিন বি। নার্ভের জন্য খুবই চমৎকার। তোমার কী কী সমস্যা আমাকে বলো।'

মনরো একটু ভেবে নিল। সে তার সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে।

'আমার খিদে বলে কিছু নেই,' বলল সে। 'রাতে আমার ঘুম আসে না। আমার দাঁতের অবস্থা জঘন্য। ছেলেবেলায় একবার রিকেট হয়েছিল আমার। তারপর থেকে শরীরের হাড়গোড় তুলোর মত নরম—'

'বেশ,' হাতে হাত ঘষল ক্ষুদ্রকায় মানুষটি। 'তোমার লাগবে

পুরো ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, সেই সঙ্গে অন্যান্য ভিটামিনেরও প্রয়োজন হবে। শুধুই ভিটামিন। কোনও তন্ত্রমন্ত্রের দরকার নেই। এখন ওং বং চং মন্ত্রের যুগ ফুরিয়েছে। ভিটামিন ক্যাপসুল খেলেই সমস্ত রোগ সেরে যাবে। আর সবগুলোই খেতে হবে। ভাগ্যিস, নিয়তি আমার কাছে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে!'

ছোট্ট হাতটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্যাড, সেখানে উদয় হলো গাঢ় বাদামী রঙের একটি বোতল। বোতলটি মনরোর দিকে এগিয়ে দিল সে। মনরোকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল।

'এটা নাও,' হাসছে ক্ষুদ্র মানুষ। 'ওষুধের দোকানে কোটি টাকা দিলেও এ জিনিস মিলবে না। অত্যন্ত উঁচুমানের ওষুধ এগুলো। মাইগড, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী দারুণ একটা ওষুধ তোমাকে দিচ্ছি। নাও। পয়সা দিতে হবে না। আমার তরফ থেকে তোমার জন্য এটা উপহার। তবে তোমাকে একেবারে শুধু শুধু দিচ্ছি না। একটা বিষয় প্রমাণ করা দরকার আমার। তোমাকে দিয়ে সে বিষয়টি প্রমাণ করতে চাই। ক্যাপসুল ফুরিয়ে গেলে আবার এসো। মাগনা দিয়ে দেব।'

মনরোর হাতে বাদামী বোতল। তাকে হতবুদ্ধি লাগছে। রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছে ও। অথচ একটু আগেও একটি ঘরে ছিল মনরো। ধোঁয়া উড়তে দেখেছে। কিন্তু সত্যি কি ধোঁয়া দেখেছে ও? কুয়াশা পাক খাচ্ছে রাস্তায়। কুয়াশাকে ধোঁয়া ভাবেনি তো? আর বাড়িটাই বা গেল কোথায়? পুরোটাই যদি ওর অনুর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়ে থাকে তা হলে হাতে ক্যাপসুলের এ বোতল এল কোত্থেকে? শ্রাগ করল মনরো, ঘুরল, বোতল নিয়ে ফিরে এল বোর্ডিং হাউজে।

নিজের ঘরে ঢুকল মনরো, মুঠোয় শক্ত করে ধরা বাদামী বোতল। সাবধানে আটকে দিল দরজা। কাপড় খুলতে লাগল। শার্ট খুলতেই শীতল বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল ওকে। নাকের

ভেতরটা সুড়সুড় করে উঠল। হ্যাঁ-আ আ চ্চো! হাঁচি দিল মনরো। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মাথা ব্যথা। বোতলের দিকে তাকাল মনরো। বোতলের গায়ে একটি লেবেল লাগানো। লেবেলে লেখা: **এখুনি দুটো ক্যাপসুল খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো।**

বোতলের ক্যাপ খুলল মনরো, তালুতে ফেলল দুটো চকচকে ছোট ক্যাপসুল। এক ঢোক পানি দিয়ে পেটে চালান করে দিল ক্যাপসুল জোড়া, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে কল্পনা করল পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে চলে এসেছে এবং সে ইচ্ছে করলেই যে কার্উকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মেরে ফেলতে পারছে এবং মেরিলিন মনরোর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। গত রাতটাও যার প্রায় বিনিদ্র কেটেছে, সেই মনরো আজ বালিশে মাথা ঠেকানোর এক মিনিটের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

পরদিন সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল মনরোর। সাধারণত ঘুম ভাঙার পরই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় সর্দিতে বোজা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না বলে। তবে আজ কী আশ্চর্য! নিঃশ্বাস নিতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না তার। নাকে একটুও সর্দি নেই! মাথাটাও ঝিমঝিম করছে না। ড্রেসারের ওপরে রাখা বোতলে চোখ চলে গেল মনরোর। লেবেলটা আছে এখনও। তবে নতুন লেখা ফুটে আছে ওতে: **দেখলে তো? আরও ক্যাপসুল প্রয়োজন হবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো।**

বোতলটি উল্টেপাল্টে দেখল মনরো। বোতলের গায়ে কোথাও নির্মাতা বা প্রতিষ্ঠান কিংবা এতে কী ধরনের ওষুধ আছে তা সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই।

গোসল সেরে নিল মনরো। কাপড় পরে নেমে এল নীচে, ডাইনিংরুমে নাস্তা খেতে। নাস্তায় সে শুধু দুটো শুকনো আলু বোখারা খায়। আর কিছু না। আলু বোখারা দুটো দ্রুত সাবাড় করে ফেলল মনরো। এমন সময় প্লেটে গরম বিস্কিট নিয়ে

হাজির হলেন বাড়িউলি মিসেস হেঞ্চ। একটু ইতস্তত করে বাড়িউলির কাছে বিস্কিট খেতে চাইল মনরো।

'কেন, মি. ফিদারস্টোনহাগ,' বললেন মিসেস হেঞ্চ, 'বিস্কিট আপনার পেটে যে সহ্য হবে না তা তো জানেনই। জেনেশুনে বিষ পান করতে চাইছেন যে!'

'মিসেস হেঞ্চ,' গলায় গাম্ভীর্য ফোটাল মনরো, 'সারা দিন যে মানুষটিকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তার শুধু দুটো শুকনো আলুবোখারা খেলে চলে না।' সে পরপর দুটো বিস্কিট খেল। তারপর একে একে পেটে চালান করল আপেল, কলা এবং এক জোড়া বেকন।

দিনটি কেটে যেতে লাগল দ্রুত। বেশ চমৎকার একটি দিন। জর্ডান অপটিকাল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মি. জর্ডান মনরোর কাজের গতির বেশ প্রশংসা করলেন। সে অত্যন্ত দ্রুত তৈরি করে ফেলল বুক কীপিং শিট। মনরো লক্ষ করল মি. জর্ডানের সেক্রেটারি গ্লোরিয়া রিংগল, যে কিনা মনরোর দিকে ভুলেও তাকায় না, আজ বেশ কয়েকবার তাকে ফিরে দেখল।

ওই রাতে ঘুমাবার আগে বোতলের লেবেল পড়ল মনরো। লেবেলে লেখা: **তুমি কি ক্লান্ত এবং তোমার কর্মক্ষমতা কি হ্রাস পেয়েছে? অন্যরা যখন সেরা চাকরি এবং সুন্দরী মেয়েগুলোকে বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি কি তখনও বোকার মত মাটিতে পায়ের নখ খুঁড়ছ? তোমাকে আর হতাশ হতে হবে না, মনরো। যাও। এখুনি দুটো ক্যাপসুল খেয়ে ফেলো।**

মনরো দুটো ক্যাপসুল গিলল।

সকাল। রোদ চমকাচ্ছে সূর্য। মনরো লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে। হাত পা টান টান করে ভরাট গলায় গান ধরল। শেভ করার সময় লক্ষ করল তার দাড়ি আগের চেয়ে ঘন হয়ে উঠেছে। ত্বকের রঙে সোনালি ছাপ। আর তার চোখ–আহ্! কী অন্তর্ভেদী চাউনি চোখে। সে কোথায় যেন পড়েছে ড্রাইভাররা

কাঁচা গাজর খায় যাতে রাতের অন্ধকারে গাড়ি চালাতে সমস্যা না হয়। কাল রাতে মনরো লক্ষ করেছে সে অন্ধকারেও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের বড় বড় লেখাগুলো পড়তে পারছে। সত্যি, দিন দিন দারুণ উন্নতি হচ্ছে মনরো ফিদারস্টোনহাগের।

সে নাস্তা সারল পাঁচটি বিস্কিট এবং তিনটি ডিম দিয়ে। লক্ষ করল কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস হেঞ্চ।

অফিসে মনরো অ্যাকাউন্টিং চার্টের কাজ সারল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। সাড়ে দশটা নাগাদ আবার খিদে পেয়ে গেল ওর। লাঞ্চ কাউন্টারে গিয়ে বসল এক গ্লাস দুধ খেতে। পাশের টুলটা দখল করল গ্লোরিয়া রিংগল। মিস রিংগলকে মনে মনে ভালবাসে মনরো। যদিও সাহস করে কথাটা প্রকাশ করা হয়নি।

মনরো মিস রিংগলের দিকে হাসি মুখে ফিরল। 'গ্লোরিয়া,' প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল সে, 'আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'কেন নয়, মি. ফিদারস্টোনহাগ,' হাসি ফিরিয়ে দিল সুন্দরী গ্লোরিয়া। 'আপনার সঙ্গে ডিনার আমি উপভোগ করব। বলুন কোথায় যাবেন?'

মনরো তিনটার সময় বেরুল অফিস থেকে। বাড়ি গিয়ে দেখবে বোতলের লেবেলে কী নির্দেশ আছে। মনরো দেখল ওতে লেখা: **ওহ্, বয়, গ্লোরিয়ার সঙ্গে ডেট। তিনটে ক্যাপসুল খাও।**

সন্ধেটা কাটল চমৎকার। মনরো এবং গ্লোরিয়ার যেন জন্মই হয়েছে একে অন্যের জন্য। ওদের রুচিবোধে কী অপূর্ব মিল! ওরা একই বিষয় নিয়ে হেসে কুটিপাটি হলো, অফিসের লোকজন সম্পর্কে দু'জনের ধারণায় কোনও ব্যবধান নেই, দু'জনেরই অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে টনসিল। গ্লোরিয়া ক্ষুধার্ত মানুষ পছন্দ করে: আর মনরো তার খিদে মেটানোর জন্য সর্বোত্তম পুরুষ।

কিন্তু আজ রাতে উদ্বেগ বোধ করছে মনরো। লাঞ্চ ওয়াগনের লোকটার ঝাড়িতে মেজাজ বিগড়ে যায়নি ওর, বরং ভয় লাগছে। সবাই জানে ভিটামিন A চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি করে। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। মনরো অন্ধকারে হাঁটছে। রাস্তার নুড়ি পাথরে লাথি কষাচ্ছে। নুড়ি পাথর, কাগজের টুকরো ছোটখাট এ সব জিনিস আঁধারেও আশ্চর্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ধোঁয়া উড়তে লাগল। তারপর হাজির হয়ে গেল হুড়কোবিহীন একটি দরজা। খুলে গেল কপাট। ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষের পরিচিত শারীরিক কাঠামো ফুটে উঠল। পিতলের একটি পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাত্রের নীচে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে।

সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মনরো। 'দেখুন মি. ...আ...আমি চাই না আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবুন। আমি জানি আপনি আপনার ইয়ে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন...তবে হলো কী...'

'আমি মোটেই ব্যস্ত নই,' স্ফূর্তির গলায় বলল বেঁটে লোকটি। 'তোমাকে সানন্দে সাহায্য করব। দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা অসাধারণ নতুন প্রজেক্ট। জাদুবিদ্যায় রীতিমত বিপ্লব ঘটাতে চলেছি আমরা। গত পঞ্চাশ মিলিয়ন বছরেও ওরা কিছুই শিখতে পারেনি। এখনও থোড়-বড়ি-খাড়া এবং খাড়া-বড়ি-থোড় টাইপের ম্যাজিকের জগতে পড়ে আছে। নাহ্, আমাদের সংস্কার-সাধন করতেই হবে। আর ভিটামিন দিয়ে আমি আমার গবেষণা শুরু করেছি। A ভিটামিন দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য, B ভিটামিন নার্ভের শক্তি বাড়ায়, সি ভিটামিন ব্যবহারে সেরে যায় দাঁতের সমস্ত ক্ষত, D ভিটামিন মজবুত করে তোলে শরীরের হাড়—আর বাকিগুলোর কথা তো তুমি জানই। তুমি ভিটামিন নিতে এসেছ, নিয়ে যাও। একদিন বিশ্বের প্রতিটি স্কুল ছাত্র

তোমাকে ভিটামিনের জাদুর অগ্রদূত হিসেবে জানবে।'

'কিন্তু দেখুন,' মরিয়া গলায় বলল মনরো, 'আমি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি। যে কারণে লোকজনের চোখে পড়ে যাচ্ছি। অন্ধকারেও সবকিছু দেখার খায়েশ আমার নেই। জাদুকর হওয়ার কোনও ইচ্ছেও আমার নেই। ভিটামিন A-টা আমার ওষুধের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না?'

মনরোর মনে হলো লোকটা যেন রাগে তার খুদে মুঠো পাকিয়েছে। 'সেক্ষেত্রে,' বলল বামন জাদুকর, 'আমি ভিটামিন A বাদ দিয়ে অন্য ভিটামিনগুলোর ডোজ বাড়িয়ে দিচ্ছি। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। নতুন প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খাও'–আবার শূন্য থেকে উদয় হলো বোতল, '–এবং সুখি মানুষ হও।'

আবার রাস্তায় একা মনরো। ডানে-বামে তাকাল। খুদে মানুষ কিংবা বাড়ি কিছুই চোখে পড়ল না। ঘন হয়ে উঠছে কুয়াশা। মনরো দ্রুত পা চালাল। নিজের আস্তানায় ফিরে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, ঢুকল ঘরে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তবে তার আগে দুটো ক্যাপসুল খেয়ে নিতে ভুলল না।

ওই হপ্তার শেষের দিকে, ভিটামিন পিলের নিয়মিত ডায়েট চালিয়ে যাওয়ার পরে, মনরো সিদ্ধান্ত নিল গ্লোরিয়ার সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। গ্লোরিয়া লোকজনকে বলে বেড়াতে লাগল প্রথম প্রথম মনরোকে সে পাত্তা না দিলেও আজকাল সে মনরো ছাড়া কিছুই বোঝে না। মনরোর সবকিছুই তার ভাল লাগে। তার আচার আচরণ, খিদে...সবকিছু।

শুক্রবারটা শুরু হলো বাজে ভাবে। মিসেস হেঞ্চ মনরোকে পরিষ্কার বলে দিলেন মনরো তাঁকে যে ভাড়া দেয় তা দিয়ে তার

রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটানো সম্ভব নয়। মনরোর জন্য খাবার কিনতে কিনতে তিনি নাকি ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। হয় মনরোকে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে নতুবা ছাড়তে হবে ঘর।

মনরো আশ্বাস দিল ব্যাপারটি ভেবে দেখবে।

সেদিন বিকেলে প্রচণ্ড খিদে পেতে লাগল মনরোর। সে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লাঞ্চ কাউন্টারে গেল। গ্লোরিয়া তার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে দেখেও না দেখার ভান করল। এমন খিদে জীবনেও লাগেনি তার।

সন্ধ্যাবেলা একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকল মনরো পেটে খিদের আগুন নিয়ে। রেস্টুরেন্টের প্রায় সমস্ত খাবার সে একাই সাবাড় করল। গ্লোরিয়ার অন্ধকার মুখে আরও আঁধার ঘনাল। সে মনরোকে নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। তবে পথে প্রেমিকের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। ঘরে ঢুকেই কিচেনে ছুটল মনরো। চোখের পলকে এক বাক্স বিস্কিট শেষ করল সে, গিলল এক বোতল কেচাপ–কিন্তু এখনও অতৃপ্ত মনরো ফিরে এল লিভিংরুমে।

অপূর্ব সুন্দর একটি নীল পোশাক পরে আধশোয়া অবস্থায় কাউচে বসে আছে গ্লোরিয়া। খুবই সুন্দর লাগছে ওকে। এত সুন্দর, যে কেউ ওকে দেখলে খিদের কথা ভুলে যাবে। গ্লোরিয়ার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল মনরো।

'ডার্লিং,' বলল সে, 'তোমার ঠোঁট যেন পাকা টসটসে লাল বেরী। তোমার গায়ের ত্বক পীচ ফলের মত জ্বলজ্বল করছে। তোমার দুধ' সাদা ঘাড় আমাকে মাখনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে–'

আর বলতে পারল না মনরো।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' এ নিয়ে কমপক্ষে একশোবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন মিসেস হেঞ্চ। 'ছেলেটা দিলে বড় চোট

পেয়েছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর থেকে ছেলেটা বেদনায় শুকিয়ে যাচ্ছে। এরকম অবস্থা কখনও ছিল না ওর। সবকিছুর প্রতিই সে যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকী এখন ওষুধও খাচ্ছে না। যদিও ওষুধ খেয়ে ওর উপকারই হচ্ছিল। মনরো সমস্ত ওষুধ ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে। আবার আগের মত না খাওয়া রোগে ধরেছে ওকে।'

'ওরা মেয়েটার কোনই খোঁজ পায়নি? মেয়েটা কি কারও সঙ্গে ভেগে গেল, নাকি এমনি এমনি অদৃশ্য হয়ে গেল?'

'কেউ ওর খোঁজ পায়নি,' বললেন মিসেস হেঞ্চ, জিভ বের করে ঠোঁট চাটলেন, চেহারা করুণ করে ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। 'সে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।'

---

## ফোবিয়া

একেকজন মানুষের একেক রকম ফোবিয়া থাকে–এ এমন এক অস্বাভাবিক ভয় যার ওপর লোকের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ মাকড়সা দেখলে অজ্ঞান হয়ে যায় ভয়ে, কারও রয়েছে তেলাপোকা ভীতি। তবে ইলেন ইঁদুর দেখলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। আর ইঁদুর নিয়ে সে রাতে ওর জীবনে যে ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল...

ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার খেয়ে বেরুতে বেরুতে রাত আটটা বেজে গেল। রেস্টুরেন্টটি বড় পার্কটির এক কোণে। গরমের রাত। ইলেন সিদ্ধান্ত নিল হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। ওর বাসা বেশি দূরে নয়, পার্ক থেকে মাত্র কয়েকশো গজ।

ইলেন ঢুকে পড়ল পার্কে। মাথার ওপর ডালপালা নিয়ে ঝুঁকে আছে গাছ। রাস্তাটা নির্জন এবং একটু যেন বেশিই অন্ধকার। গা কেমন ছমছম করে ওঠে ইলেনের। কদম দ্রুত হলো ওর। এ পার্ক নিয়ে নানা অদ্ভুতুড়ে গল্প শুনেছে ইলেন। যদিও বিশ্বাস করেনি সেসব কাহিনি।

অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে খোলা একটা জায়গায় চলে এল ইলেন। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। এদিকটাতে অল্প জোছনা। চলার গতি কমিয়ে দিল সে, যদিও মন থেকে অস্বস্তি ভাবটা দূর হচ্ছে না।

পার্কের মাঝখানে বড়সড় একটি লেক। যে রাস্তা ধরে হাঁটছে ইলেন, ওটা সোজা লেকের দিকে চলে গেছে। এ রাস্তার মাথায় আরেকটা পথ দেখতে পেল ইলেন। ওখানে কেউ নেই। পেছন ফিরে তাকাল ও, ভাবছে ফিরতি পথ ধরবে কিনা। কিন্তু ও পার্কের মাঝামাঝিতে চলে এসেছে। এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

রাস্তায় পাতার খসখস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বাতাসে দুলছে ডাল, খসখস শব্দ তুলছে পাতায়। ব্যস্ত শহরের দূরের কোলাহল পার্কের নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি। ইলেন হাঁটছে, রাতের বাতাসে পাতার ফিসফিসানি। মনে হচ্ছে ও যেন সভ্যতা থেকে হাজার মাইল দূরে। হঠাৎ আরেকটা শব্দে খাড়া হয়ে গেল কান। পাতা বা অন্য কিছুর শব্দ নয়, ভিন্ন একটা আওয়াজ। পায়ের শব্দ। আমারই পায়ের শব্দ, নিজেকে বোঝাতে চাইল ইলেন।

না, সিমেন্টের রাস্তায় যে শব্দটা উঠেছে ওটা ইলেনের পায়ের আওয়াজ নয়। অন্য কারও পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ভয় ঢুকে গেল ইলেনের মনে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল কলজে। চলার গতি বেড়ে গেল।

ইলেনের ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ পেছনের পায়ের শব্দটা হচ্ছে ওর পা ফেলার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ইলেন জোরে হাঁটলে পেছনের জনও জোরে হাঁটছে।

ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল ইলেন। ওর পেছনে যে-ই থাকুক, তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না ও ভয় পেয়েছে। ইচ্ছে করে হাঁটার গতি মন্থর করল ইলেন। কিন্তু অনুসরণকারী মোটেই গতি কমাল না। দ্রুত হয়ে উঠল তার পদ-শব্দ।

নিজের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রইল না ইলেনের। দৌড় দিল ও। ছুটতে লাগল রাস্তা ধরে। কয়েক সেকেন্ড পেছনে কোনও শব্দ

পেল না ইলেন। তারপর, ওর হৃৎপিণ্ডের দিড়িম দিড়িম ঢাকের শব্দ ছাড়িয়ে পেভমেন্ট ভেসে এল দ্রুত এবং ছন্দবদ্ধ ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

লেক সোজা যে রাস্তাটি চলে গেছে, ওটাতে উঠে এল ইলেন। অনেকেই পার্কে হাওয়া খেতে এসে লেকের ধারে বসে থাকে। ইলেন আশা করল এমন কাউকে দেখতে পাবে। ছোট একটি টিলা বেয়ে নেমে লেক অভিমুখে ছুটল ও। মোড় ঘুরল। দপ করে নিভে গেল আশার আলো। লেকের রাস্তায় জন-মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। ইলেন টের পেল টিলা বেয়ে নেমে আসছে তার অনুসরণকারী। পায়ের শব্দ হচ্ছে। থপ থপ থপ থপ। ওকে এই ধরল বলে!

উন্মাদের মত চারপাশে চোখ বুলাল ইলেন। বামে বেশ ঘন ঝোপ আর কতগুলো গাছ দেখতে পেল। ছুটে গেল ওদিকে, চট করে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

এদিকে গাছপালার সারি। ঘন বলে চাঁদের আলোর অবাধ প্রবেশের সুযোগ নেই। ডাল আর পাতার আবরণী ভেদ করে যেটুকু আলো প্রকৃতির বুকে পৌঁছেছে তাতে অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। ইলেন প্রথমে পায়ের শব্দ শুনতে পেল তারপর দেখতে পেল পায়ের মালিককে।

লোকটা ইলেনের লুকানো জায়গা থেকে কুড়ি ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইলেনের দিকে পেছন ফেরা। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পা বাড়াল লেকের ধারের বেঞ্চিতে। বসল।

ঝোপের আড়ালে বসে ঘেমে ভিজে একাকার ইলেন। ওর এখানে লুকিয়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি। লোকটা নিশ্চয় টের পেয়েছে ও কোথায় লুকিয়েছে। লোকটা কি অপেক্ষা করছে কখন ইলেনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে এবং ও আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে? অবশ্য ইলেনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে পার্কের

ভ্রমণকারীরা হাঁটতে হাঁটতে এদিকে চলে আসতে পারে। ও তখন লাফ মেরে বেরিয়ে আসবে ঝোপের আড়াল থেকে, লোকের ভিড়ে মিশে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে পার্ক থেকে।

বেঞ্চিতে বসা লোকটার দিকে আবার তাকাল ইলেন। সে চুপচাপ বসেই আছে, স্থির দৃষ্টি লেকে। হঠাৎ কী যেন একটা নজর কাড়ল ইলেনের। পানির ধারে কীসের একটা ছায়া, এগিয়ে আসছে। বিরতি দিল। এবারে ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ইলেন। বড় একটা ইঁদুর। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লাফ মেরে উঠতে গেল ইলেন—নিজেকে দমন করল বেঞ্চির লোকটার কথা ভেবে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া চিৎকারটাকেও একই সঙ্গে গলা টিপে মারল।

যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে ইলেন, বড়টার সঙ্গে আরও তিনটে ইঁদুর যোগ দিল। চাঁদের আলোয় ওদের বিকট ছায়া এবং কুৎসিত মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে ইলেন। সিমেন্টের রাস্তায় প্রাণীগুলোর থাব্যর আওয়াজ উঠল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল ইলেনের, মন চাইল ছুট দেয়। কিন্তু বেঞ্চিতে বসা লোকটার ভয়ে কিছুই করতে পারল না।

লোকটা পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে বেঞ্চে, ইঁদুরগুলো তার কাছ থেকে তিন হাত দূরেও নেই। ওগুলোকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে সে, ভাবল ইলেন। কিন্তু তার মাঝে কোনও ভাবান্তর নেই। কেমন লোক এ?

ইঁদুরের দিকে চোখ ফেরাল ইলেন। ওরা যেন সম্মোহন করেছে ওকে। ঝোপে, দুই ফুট দূরে খসখস একটা শব্দ হলো। চিৎকার বন্ধ করার জন্য মুখে সোয়েটার চেপে ধরল ইলেন। যদি ওর দিকে ছুটে আসে কোনও ইঁদুর? ধারাল নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

এমন সময় তীব্র আতংক নিয়ে ইলেন দেখল লেকের ধারের চারটে ইঁদুর ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ওদের ধারাল

মুখগুলো যেন উঁচিয়ে আছে ইলেনের দিকেই। লম্বা লেজ নড়ছে ডানে-বামে।

চিৎকার দিল ইলেন। উঠে দাঁড়াল বেঞ্চির লোকটা। ঝোপের দিকে আসছে। হাঁচড়েপাঁচড়ে সিধে হলো ইলেন। পিছিয়েছে এক কদম, একটা পা গিয়ে পড়ল গভীর একটা গর্তে। এটা ইঁদুরের গর্ত। ডজন খানেক ইঁদুরের বাচ্চা ব্যথা এবং ভয়ে কিচ্‌কিচ্‌ করে উঠল। পিলপিল করে বেরিয়ে এল গর্ত ছেড়ে। ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এক ঝটকায় গর্ত থেকে পা বের করে আনল ইলেন। আবার পিছিয়েছে, ওর পা চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে গেল একটি বাচ্চা ইঁদুরের নরম শরীর। মরণ যন্ত্রণায় কিইইচ করে উঠল ওটা। ইলেন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল।

লোকটা ক্রমে কাছিয়ে আসছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ইলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে জমে যাওয়া দুর্বল হাঁটু যেন সাড়া দিতে চাইছে না। কোনও মতে ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল ও, পা রাখল রাস্তায়।

লোকটা দেখে ফেলেছে ইলেনকে। আরও কাছে চলে এসেছে সে। চাঁদের ম্লান আলোয় তার মুখ দেখতে পেল ইলেন। ভয়ে শরীরের সব কাটা রোম দাঁড়িয়ে গেল। ওটা মোটেই মানুষের মুখ নয়! ওটা একটা ইঁদুরের মস্ত মুখ, মুখটা নড়ছে, সেইসঙ্গে নড়ছে মুখের দু'পাশের গোঁফ।

ঘুরেই ছুট দিল ইলেন। প্রচণ্ড ভয়ে দিশাহারা হয়ে দৌড়াতে লাগল ও। পেছনে ভেসে এল অসংখ্য ইঁদুরের ভয়ংকর কিচ্‌কিচ্‌ নিনাদ।

ছুটতে ছুটতে পার্কের 'এক্সিট' লেখা গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেল ইলেন। আর মাত্র দশ গজ। তারপরই ওর মুক্তি। আশ্চর্য! গেটের কাছে কেউ নেই। একজন ভ্রমণকারীও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে কী? ইলেন তো এখনই বেরিয়ে পড়বে। হঠাৎ ওর কলজে হিম হয়ে গেল ঠিক ওর পেছনে তীব্র কিইইচ

শব্দ হতে। আঁতকে উঠে পাঁই করে ঘুরল ও। ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইঁদুর-মানব। জ্বলজ্বল করছে চোখ। দৃষ্টিতে বিকট উল্লাস। কই, দানবটার ছুটে আসার শব্দ তো পায়নি ও। ইলেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চিৎকার দেবে। লম্বা, ধারাল থাবা আছড়ে পড়ল মুখে। চিৎকারটা আর মুখ ফুটে বেরুতে পারল না। তার আগেই আঁধার হয়ে এল ইলেনের দুনিয়া।

---

## যন্ত্রণা

মি. বদরুল হাসান চল্লিশ পেরিয়েছেন আরও বছর পাঁচেক আগে। উচ্চতা মাঝারী, ওজন তিন মণের কাছাকাছি। মুখখানা থলথলে, মাংসের চাপে চোখ দু'টো ভেতরে ঢুকে আছে। এই মুহূর্তে তিনি চোখ কুঁচকে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন বসার ঘরের এক কোণে রাখা একুশ ইঞ্চি সনি কালার টিভির দিকে। ওদিকে খানিকক্ষণ অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে কটমট করে চোখ ফেরালেন আবদুস সামাদের দিকে। আবদুস সামাদ হাড়গিলে চেহারার, তবে চোখের তারায় শিশুসুলভ একটা সরল ভাব আছে। সে মি. বদরুল হাসানের ত্রিশ হাজার টাকা দামের দামী কার্পেটের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসেছে, সামনে একটা টুল বক্স, হরেক রকম যন্ত্রপাতি, গুনগুন করে 'ভালবাসিয়া গেলাম ফাঁসিয়া' গাইছে আর টুল বক্স নিয়ে কী যেন খুটুর খাটুর করছে।

রাগে বদরুল হাসান সাহেবের গা জ্বলে যাচ্ছে। আবদুস সামাদের মত নিম্ন শ্রেণীর একটি লোক তাঁর ঘরের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছে, ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু নিজের স্বার্থেই নিম্ন শ্রেণীর এই লোকটিকে তাঁর কিছুক্ষণের জন্য সহ্য করতেই হবে।

আবদুস সামাদ নোংরা একটা ত্যানা দিয়ে হাত মুছল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে তাকাল বদরুল হাসান সাহেবের দিকে।

‘সার, আজ কেমন আছেন?’

বদরুল সাহেবের বাম দিকের ভ্রুটা টকাশ করে লাফ দিল। ‘আমি কেমন আছি তা তোমার পরে জানলেও চলবে। আগে বলো হারামজাদা টিভিটা আমাকে আর কত ভোগাবে। ওটার পেছনে আজ আবার কত খসাতে হবে?’

আবদুস সামাদ টিভি সেটের দিকে দ্রুত একবার নজর বোলাল, তারপর চোখ ফেরাল বদরুল হাসানের দিকে। ‘ওটার টিউব জোড়া গেছে। অসিলেটারের অবস্থাও খারাপ। নতুন ফিল্টারও লাগাতে হয়েছে।’

চেহারা থমথমে হয়ে গেল মি. বদরুল হাসানের, নীচের পাতলা ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন তিনি।

‘হারামজাদা টিভিটার পেছনে রিপেয়ারের জন্য এ পর্যন্ত যত টাকা আমি ঢেলেছি,’ বললেন তিনি, ‘তাতে নতুন আরেকটা সেট কেনা যেত।’

হাসল আবদুস সামাদ। নরম গলায় বলল, ‘তা হয়তো যেত। কিন্তু সার, গতবার আপনি আমার সামনেই এমন লাথি মারলেন স্ক্রিনে যে...’

ঘুরে দাঁড়ালেন বদরুল হাসান, হোল্ডারে একটা সিগারেট ঢোকালেন। ‘মনে আছে আমার,’ তাঁর কণ্ঠ তেতো শোনাল। ‘কিন্তু ফাজিলটা ঠিক মত কাজ করছিল না।’ শ্রাগ করলেন তিনি। ‘ভেবেছিলাম লাথি গুঁতা খেয়ে যদি ঠিক হয়।’

‘কিন্তু লাথি খেয়ে ওটার আবার বারোটা বেজেছে,’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আবদুস সামাদ হতাশ ভঙ্গিতে। ‘এভাবে করলে তো, সার, একটা জিনিসও টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।’

‘আমাকে উপদেশ দিতে এসো না, আবদুস সামাদ,’ গমগমে গলায় বললেন বদরুল হাসান। ‘টিভির সমস্যাটি কী সেটা বলো।’

টুল বক্স বন্ধ করল আবদুস সামাদ। উঠে দাঁড়াল। ‘উপদেশ

দিচ্ছি না, সার। একটু সাবধানে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে বলছিলাম। ইলেকট্রনিক্স জিনিসের মা-বাপ নেই, সার। গ্যারান্টিও কম। আপনার টিভিতে এবার বেশ বড় রকমের সমস্যা হয়েছে। তারটার সব ছিঁড়ে গেছে। আরও কী ক্ষতি হয়েছে খোদা মালুম। গত মাসে আপনার রেডিওর একই রকম অবস্থা হয়েছিল। আপনি ওটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।'

'রেডিওটাও ঠিকমত কাজ করছিল না,' বদরুল সাহেবের কণ্ঠ বরফশীতল।

'কিন্তু কেন কাজ করছিল না, সার? বেয়াদবী মাফ করবেন—আমার ধারণা আপনি রেডিও-টিভি কোনটারই ঠিকমত যত্ন নেন না।'

ঠোঁটে ঝোলানো হোল্ডারের সিগারেটে ধীরে সুস্থে আগুন জ্বালালেন মি. বদরুল হাসান। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর বিজ্ঞানী যেভাবে মাইক্রোস্কোপে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট দেখেন, ঠিক সেরকম দৃষ্টিতে তাকালেন আবদুস সামাদের দিকে।

'এই ব্যাখ্যার জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই আমাকে আলাদা চার্জ দিতে হবে না?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রিপেয়ারম্যান। 'আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো, সার? বার বার এরকম হচ্ছে কেন?'

'জানি না,' কর্কশ গলায় বললেন হাসান সাহেব। 'বললামই তো টিভিটা ঠিকমত কাজ করছিল না। আর তোমার এত ভ্যাজর ভ্যাজর করার কী দরকার? সেট ঠিক হয়েছে কিনা তাই বলো।'

আবদুস সামাদ কোনও কথা না বলে টিভি অন করল। পর্দায় ভেসে উঠল আবদুল বয়াতীর মুখ। গলা ফাটিয়ে জারী গাইছে। এক দৃষ্টিতে বয়াতীর মুখখানা দেখল কিছুক্ষণ আবদুস সামাদ, ভল্যুম কমাল। আবার বাড়াল। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে অফ করল টিভি। ঘুরে দাঁড়াল বদরুল হাসান সাহেবের দিকে।

হাসান সাহেব বিচিত্র মুখ ভঙ্গি করে ঘর থেকে বেরুলেন,

পেছনে এল আবদুস সামাদ।

'আপনার বিলটা পাঠিয়ে দেব, সার,' বলল আবদুস সামাদ বদরুল হাসান সাহেবের পাশে হাঁটতে হাঁটতে।

'হুম্‌ম' জবাব দিলেন বদরুল হাসান।

সদর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আবার বদরুল হাসানের দিকে তাকাল আবদুস সামাদ। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে।

লিভিং রুমে এসে ঢুকলেন বদরুল হাসান। ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা ঘড়িটা গম্ভীর শব্দে বেজে উঠল।

গলার স্বর নিচু করে বদরুল সাহেব বললেন, 'আবার শুরু করেছ? অনেক হয়েছে তো! আমার কথা কানে যায় না?'

কিন্তু ঘণ্টাটি একভাবে বেজে যেতে লাগল। ম্যান্টলপিসের দিকে হেঁটে গেলেন বদরুল হাসান। গলার স্বর সপ্তমে তুললেন, 'বললাম তো অনেক হয়েছে। তারপরও যন্ত্রণা দাও। এত সাহস!'

দু'হাতে ঘড়িটাকে মুঠো করে ধরলেন তিনি, টান দিলেন জোরে। প্লাগসুদ্ধ ঘড়িটা ছিটকে এল দেয়াল থেকে। তারপর ওটাকে ধরে মস্ত আছাড় দিলেন বদরুল হাসান। ভেঙে টুকরো হয়ে গেল ঘড়ি। তাতেও রাগ কমল না। এবার পা দিয়ে পিষতে শুরু করলেন যন্ত্রটাকে। কিন্তু ভাঙা ঘড়ি থেকে ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে এল অনবরত, যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কোনও পশু। বেশ সময় লাগল ঘণ্টার শব্দ থামতে। ভাঙা কাঁচ আর ছেঁড়া স্প্রিং-এর ওপর ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। ঘামে মুখ ভিজে সপসপে, থর থর করে কাঁপছে শরীর। শান্ত হলেন তিনি ধীরে ধীরে। শরীরের কাঁপুনি থামলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে, নিজের বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন বদরুল হাসান। নিজেকে ভঙ্গুর, ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত লাগছে। একটু পরেই ঘুমিয়ে

পড়লেন তিনি। তবে মাঝে মাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠলেন ঘুমের ঘোরে।

মি. বদরুল হাসান ব্যাচেলর মানুষ। উত্তরায় প্রাসাদোপম একটি বাড়িতে থাকেন। পৈতৃক সূত্রে অগাধ সম্পত্তির মালিক। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে নিজেও বোধহয় জানেন না। কাজেই পেটের ধান্ধা তাঁকে করতে হয় না। অবসরে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখে পাঠান। কোনওটি ছাপা হয়, কোনওটি হয় না।

জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই বদরুল হাসানের। প্রতিবেশীদের খবর রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা এ কারণে হাতে গোনা। অবশ্য এতে কোনও অসুবিধে নেই বদরুল সাহেবের। পত্রিকায় লেখালেখি আর বাড়িতে ইলেকট্রিক বিভিন্ন গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তাঁর সময় চলে যায়। অবশ্য বেশিরভাগ যন্ত্রই তিনি ভেঙে ফেলেন খুলতে গিয়ে। আর কাজটা যে একেবারে অজ্ঞতা থেকে করেন ঠিক তাও নয়। মনে হয় যান্ত্রিক কাঠামোগুলো ভেঙে তিনি এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করেন।

এ মুহূর্তে মি. বদরুল হাসান তাঁর বিশাল বেডরুমের দরজা খুলে নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে। পরনে স্মোকিং জ্যাকেট, এগোলেন খুদে স্টাডি রুমের দিকে। ওখান থেকে টাইপ রাইটারের খটাখট শব্দ ভেসে আসছে। তাঁর সেক্রেটারী, শেহনাজ পারভীন বদরুল সাহেবের নোটগুলো টাইপ করছে। বদরুল হাসান এগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাবেন। তিনিও টাইপ জানেন তবে টাইপ রাইটার মেশিনটিকে আরও অনেক যন্ত্রের মতই পছন্দ করেন না। কম্পিউটারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আরও বেশি। এ কারণে জিনিসটি কেনেননি তিনি।

শেহনাজ পারভীনের বয়স তেইশ। সে সুন্দরী এবং

আকর্ষণীয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী সায়েন্সে এম. এ করছে। মি. বদরুল হাসানের কাছে পার্ট টাইমের কাজ করে। যা বেতন পায় তা দিয়ে হোস্টেল খরচা তো চলে যায়ই, দেশের বাড়িতে ছোট ভাইটাকেও মাসে মাসে পাঠাতে পারে কিছু।

শেহনাজ পারভীন বদরুল হাসানের তেরো নম্বর সেক্রেটারী। শোনা যায়, কোনও মেয়েই নাকি বদরুল সাহেবের সাথে এক মাসের বেশি কাজ করতে পারেনি তাঁর তিরিক্ষি মেজাজের কারণে। শেহনাজের ধৈর্য প্রশংসনীয়। মাস তিন হলো সে সেক্রেটারীর কাজটি করে যাচ্ছে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই।

টাইপ করতে করতে মাথা তুলে চাইল শেহনাজ। তাঁর বস ভেতরে ঢুকেছেন। হোল্ডারসহ সিগারেট ঝুলছে মুখ থেকে। উদাসীন ভঙ্গিতে তিনি একবার পেছনে ফিরে দেখলেন, তারপর শেহনাজের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। উঁকি দিলেন টাইপ রাইটারে আটকানো কাগজটার দিকে। তারপর ডেস্ক থেকে কতগুলো কাগজ হাতে নিলেন।

'সারা বিকেল বসে তুমি এই করেছ?' জানতে চাইলেন তিনি ঠাণ্ডা গলায়।

চোখে চোখ রাখল শেহনাজ। স্পষ্ট গলায় বলল, 'জ্বী। সাড়ে তিন ঘণ্টায় চল্লিশ পৃষ্ঠা টাইপ করেছি, সার। আমার সাধ্যে এই কুলাল।'

টাইপ রাইটারের দিকে আঙুল নাচালেন বদরুল হাসান। 'ইডিয়েট গ্যাজেটটা দিয়ে মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠা টাইপ! আরে, টমাস জেফারসন মাত্র আধাদিনে পালকের কলম দিয়ে আমেরিকার সংবিধান লিখেছিলেন, তা জানো?'

রিভলভিং চেয়ারটা ঘোরাল শেহনাজ। শীতল শোনাল কণ্ঠ, 'তা হলে মি. জেফারসনকে ভাড়া করছেন না কেন, সার?'

বদরুল হাসানের বাম ভ্রু লাফিয়ে উঠল। 'তোমাকে আমি

বলিনি যে মুখে মুখে তর্ক একদম পছন্দ নয় আমার?'

টাইপ রাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল শেহনাজ, 'অসংখ্যবার এবং অসংখ্যবার বলেছেন।' আবার সোজা হয়ে বসল। 'একটা কথা বলব, সার।' ভ্যানিটি ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল। 'আরেকটা নতুন মেয়ের খোঁজ করুন, এমন কেউ যার তিনটে হাত এবং গায়ে গণ্ডারের চামড়া তা হলে তার সঙ্গে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবেন। আমার পক্ষে...' সশব্দে নিজের পকেট বুক বন্ধ করল শেহনাজ। 'আপনার সাথে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করলেন বদরুল সাহেব।

'জ্বী। ছাড়তাম আরও আগেই। কারণ আপনার মত এত খুঁতখুঁতে, খামখেয়ালী স্বভাবের লোকের সঙ্গে কাজ করার মত ঝক্কি আর নেই। একটা স্কলারশিপ পেয়েছি আমি। আগামী মাসে ইউরোপে চলে যাচ্ছি।' ব্যাগটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল শেহনাজ।

বিমূঢ় দেখাল বদরুল হাসানকে, কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন একবার, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন, তারপর স্বভাব বিরুদ্ধ অত্যন্ত নরম গলায় ডাক দিলেন পেছন থেকে। 'শেহনাজ...দয়া করে যেয়ো না।'

থমকে দাঁড়াল শেহনাজ পারভীন। ঘুরল। বদরুল সাহেবের চেহারায় ভয়ার্ত একটা ছাপ ফুটে উঠেছে যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না ওর।

'কিছু বললেন?' কোমল স্বরে বলল শেহনাজ।

মুখ ঘোরালেন বদরুল হাসান, অস্বস্তিতে ভুগছেন যেন। 'ইয়ে মানে...আরেকটু সময় যদি আমার সাথে থাকতে। না, কোনও কাজের জন্য নয়। ইয়ে...আজ এক সাথে ডিনারটা না হয় করলাম...' আশা নিয়ে চেয়ে থাকলেন তিনি শেহনাজের

দিকে।

'আমার খিদে পায়নি তেমন,' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল শেহনাজ। 'তা ছাড়া ডিনারের সময় এখনও হয়নি। হতাশা ফুটে উঠতে দেখল সে বস-এর মুখে। 'হয়েছে কী আপনার, সার?' সহানুভূতির সুর নেই, এমনি প্রশ্ন।

হাসতে চেষ্টা করলেন বদরুল হাসান। কেমন বিকৃত দেখাল মুখ। 'না, হবে আবার কী? তাড়া না থাকলে চলো ঘুরে আসি কোথাও থেকে।'

ঝাড়া দু'মিনিট বদরুল হাসান সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শেহনাজ। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'ধন্যবাদ সার। আজ আমার সত্যি তাড়া আছে আর তাড়া না থাকলেও আপনার সঙ্গে কোথাও যেতাম না আমি। কেন, সে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে বাধ্য নই আমি। গুড নাইট, মি. বদরুল হাসান।'

বদরুল হাসান সাহেবের মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু টলে উঠলেন তিনি। লোকটার আবার প্রেশার উঠে যাচ্ছে না তো? শঙ্কিত হয়ে ভাবল শেহনাজ। সে কিছু বলার আগেই বদরুল হাসান বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, শেহনাজ। ঠিক আছে। কোথাও যেতে হবে না। এক কাপ কফি খেতে খেতে একটু গল্প করার সময়ও কি হবে না তোমার? আমার আসলে এই মুহূর্তে একা থাকার কথা ভাবলে খারাপ লাগছে।'

আবার লিভিং রুমে ফিরে এল শেহনাজ, দাঁড়াল বদরুল হাসানের পাশে। 'আপনি অসুস্থ নাকি, সার?' জিজ্ঞেস করল সে।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন বদরুল সাহেব।

'তা হলে কোনও দুঃসংবাদ?'

'না।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। আবার জানতে চাইল শেহনাজ।

'তা হলে সমস্যাটা কী আপনার?'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন বদরুল হাসান। আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকালেন শেহনাজের দিকে। ভীত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি।

'আমি খুব ক্লান্ত,' ভাঙা গলায় বললেন তিনি। 'গত চার রাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। আর এখন একা থাকার কথা ভাবলেই...' ব্যক্তিগত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলছেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভাবনাটা নিজের ওপর বিরক্তি এনে দিল তাঁর। তবু বলে চললেন, 'এ সত্যি অসহ্য, শেহনাজ। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে আমার চারপাশে। ব্যাখ্যাতীত ঘটনাগুলো।'

'বলে যান।'

টিভি সেটের দিকে আঙুল তুললেন বদরুল সাহেব, 'ওই...ওই যে জিনিসটা ওখানে। ওটা গভীর রাতে আপনা আপনি চালু হয়ে যায়, জাগিয়ে রাখে আমাকে সারারাত।' তাঁর চোখ ঘর ঘুরে স্থির হলো হল রুমের দিকে। 'আর ওই পোর্টেবল রেডিওটা দেখ। ওটাকেও আমি বেডরুমে রাখি। ঘুমাতে গেলেই রেডিওটা নিজ থেকে অফ-অন হতে থাকে।'

কথা বলতে বলতে মাথা নিচু করে ফেলেছিলেন বদরুল সাহেব, যখন মুখ তুললেন, শেহনাজ লক্ষ করল চোখের তারায় অদ্ভুত একটা পাগলামির ভাব ফুটে উঠেছে। 'আমার বিরুদ্ধে এই বাড়িতে ষড়যন্ত্র চলছে; শেহনাজ। টিভি সেট, রেডিও, লাইটার, ইলেকট্রিক ঘড়ি, আর...আর ওই বদমাশ গাড়িটাও যেটাকে আমি চালাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বদরুল হাসান, মুখ সাদা হয়ে গেছে, উত্তেজিত। 'গত রাতে গাড়িটা আমি গ্যারেজে ঢোকাচ্ছিলাম খুব ধীরে আর সাবধানে।' শেহনাজের দিকে এক পা এগিয়ে এলেন তিনি, হাতের মুঠো বার বার খুলছেন আর বন্ধ করছেন। 'হঠাৎ হুইলটা আমার হাতের মধ্যে ঘুরতে শুরু করল। শুনলে? আপনা থেকেই হুইলটা ঘুরছিল। স্রেফ সেধে গিয়ে ধাক্কা

খেল গ্যারেজের এক ধারে। ভাঙল একটা হেড লাইট–ওই যে ম্যান্টেলপিসের ওপর।'

শেহনাজ ম্যান্টেলপিসের দিকে তাকাল। ওখানে কিছু নেই। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি শেহনাজের।

'আমি...আমি ওটা ফেলে দিয়েছি,' ভীরু গলায় বললেন বদরুল হাসান। তারপর জোর করে গলায় স্বর ফোটালেন, 'এরকম অবস্থা অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে, শেহনাজ, কোনওদিনই আমি যন্ত্রপাতি ঠিক মত ব্যবহার করতে পারিনি।' হাহাকারের মত শেষ বাক্যটা যেন বেরিয়ে এল বদরুল সাহেবের গলা চিরে।

শেহনাজ স্থির চোখে তাকাল তাঁর দিকে, মায়া হলো আত্মম্ভরী লোকটার জন্য।

'হাসান সাহেব,' খুব নরম গলায় বলল সে, 'আমার মনে হয় আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

বদরুল হাসানের চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। 'ডাক্তার!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'বিংশ শতাব্দীর সর্বরোগ হরণকারী বলে দাবী করা ইডিয়েটগুলো! যদি বিষণ্নতায় ভোগো ডাক্তার দেখাও। যদি সুখে থাকো তা হলেও ডাক্তার এনে এর কারণ খোঁজো। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলেও ডাক্তারের কাছে যাও। তুমি,' গলা ফাটালেন তিনি শেহনাজকে লক্ষ করে, 'নিজে গিয়ে ডাক্তার দেখাও না।' রাগে কাঁপছে গলা। 'আমি একজন যুক্তিবাদী, র‍্যাশনাল, বুদ্ধিমান মানুষ। আমি জানি আমি কী দেখছি। আমি জানি কী শুনছি। গত তিন মাস ধরে যান্ত্রিক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আমাকে শেষ করার পাঁয়তারা কষছে। বুঝলে, মিস শেহনাজ পারভীন?'

শেহনাজ কয়েক সেকেন্ড উত্তেজিত লোকটাকে যেন জরীপ করল। তারপর বলল, 'বুঝলাম, সার। আপনি সত্যি খুব অসুস্থ।

আসলেই আপনার চিকিৎসার দরকার। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে আপনার নার্ভের বোধ হয় ক্ষতি হয়েছে। তাই আবোল তাবোল সব দেখছেন এবং শুনছেন।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল শেহনাজ, তারপর ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়াল।

'যাচ্ছ কোথায় তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলেন বদরুল।

'আপনার কারও সঙ্গ প্রয়োজন নেই, সার।' বলল শেহনাজ হলঘর থেকে। 'আপনার দরকার ডাক্তার দেখানো।'

'দেন গেট আউট অভ হিয়ার,' আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। 'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। আর কোনও দিন যেন তোমার মুখ না দেখি।'

'জীবনেও দেখবেন না,' বলল শেহনাজ। 'আপনার মত পাগলের সাথে কাজ করে কোন বোকা?' দুপদাপ পা ফেলে সে দরজার দিকে এগোল।

'সাবধান,' চেঁচিয়ে বললেন বদরুল হাসান। 'আর কোনওদিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। তোমার চেক আমি পাঠিয়ে দেব। আর শুনে রাখো, তোমার মত বেয়াদব সেক্রেটারীর কখনও প্রয়োজনও হবে না আমার।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শেহনাজ। বুক ভরে বাতাস নিল, তারপর আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'মি. বদরুল হাসান, যন্ত্র নিয়ে যে যন্ত্রণায় আপনি আছেন, প্রার্থনা করি, তা থেকে খুব সহজে যেন নিষ্কৃতি না পান।'

বেরিয়ে গেল শেহনাজ, পেছনে দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। মূর্তির মত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছিলেন সেক্রেটারীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে। কিন্তু শেহনাজ চলে গেছে বুঝতে পেরে উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। এমন সময় শুনলেন ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারটা খট খট শব্দ করছে।

বুকের রক্ত জল হয়ে গেল তাঁর শব্দ শুনে। কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল টাইপ রাইটার। পড়ার ঘরে ঢুকলেন বদরুল হাসান। টাইপ রাইটারে কাগজ পরানো। বদরুল সাহেব রোলারটা ঘোরালেন কাগজের লেখা পড়ার জন্য। তিন লাইনে লেখা একই কথা, 'এখান থেকে ভাগো, বদরুল।'

নিজেই এই কথাগুলো লিখেছে টাইপ রাইটারটা। টুকরোটা ছিঁড়ে আনলেন তিনি যন্ত্র থেকে, দলা মোচড়া করে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর।

'এখান থেকে ভাগো, বদরুল,' গলার স্বর সপ্তমে তুলে বললেন তিনি। 'গোল্লায় যা তুই। আমাকে বেরিয়ে যেতে বলার কে তুই?' জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখলেন বদরুল সাহেব, ঘামে ভেজা মুখে হাত ছোঁয়ালেন। 'এটা একটা যন্ত্র...একটা টাইপ রাইটার। ফালতু একটা জিনিস...'

স্থির হয়ে গেলেন তিনি লিভিং রুমের টিভি থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠ শুনে।

'এখান থেকে ভাগো, বদরুল।' বলছে কণ্ঠটা।

বুকের ভেতর ব্যাঙের মত লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, ঘুরেই ছুটলেন বদরুল লিভিং রুমের দিকে। হাতে গিটার নিয়ে অল্প বয়েসী একটা মেয়ে নাচছে টিভি পর্দায়। নাচের সময় হাইহিলে শব্দ তুলছে, সোজা তাকাচ্ছে বদরুল সাহেবের দিকে। মিউজিকের তালে মেয়েটা নাচতেই থাকল। তা হলে গলার স্বরটা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন, ভাবলেন বদরুল হাসান। সেক্রেটারী মেয়েটা ঠিকই বলেছে। নিদ্রাহীনতার কারণে আবোল তাবোল দেখছেন আর শুনছেন তিনি।

টিভির মিউজিক থেমে গেল। মেয়েটি গিটার হাতে ক্যামেরার সামনে 'বো' করল, মুখ তুলে আবার সরাসরি তাকাল বদরুল সাহেবের চোখের দিকে।

মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা, স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'এখান

থেকে ভাগো, বদরুল।'

রাগের চোটে বিকট চিৎকার করে উঠলেন বদরুল হাসান। হাতের কাছে ফ্লাওয়ার ভাসটা নিয়ে গায়ের শক্তিতে ছুঁড়ে মারলেন টিভিটার দিকে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো টিভি, গ্লাস ভেঙে শত টুকরো হলো, ধোঁয়া উঠতে লাগল গল গল করে। তারপরও, কী ভয়ানক ব্যাপার, ধোঁয়ার মাঝ থেকে মেয়েটার রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগল।

'এখান থেকে ভাগো, বদরুল,' বলে চলল কণ্ঠটি। আহত জন্তুর মত চিৎকার দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন বদরুল, হলঘর পেরিয়ে উঠে গেলেন সিঁড়িতে।

টপ ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেন তিনি, গলার রগ ফুলে গেল চিৎকার করার সময়। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে নির্বোধ যন্ত্রের দল। তোরা আমাকে ভয় দেখাতে পারবি না। শুনতে পাচ্ছিস? আমি জীবনেও তোদেরকে ভয় পাব না।'

ঠিক তখন পড়ার ঘর থেকে গভীর, স্পষ্ট এবং ছন্দায়িত ভঙ্গিতে ভেসে এল টাইপ রাইটারের শব্দ। বদরুল বুঝতে পারলেন হারামজাদাটা কী টাইপ করছে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল তাঁর। তবে নিজেকে সামলে নিয়ে ঢুকলেন বেড রুমে, দরজা বন্ধ করলেন। তারপর বালিশে মুখ চেপে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বন্ধ দরজা ভেদ করেও টাইপ রাইটারের টাইপ করার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তারপর এক সময় আপনাআপনি থেমে গেল। নীরব হয়ে গেল বাড়ি।



## দুই

সে রাতেও যথারীতি ঘুম হলো না বদরুল হাসান সাহেবের।

একাধিকবার দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন তিনি। সারা শরীর ঘেমে চুপচুপে। ঘুমের আশা বাদ দিয়ে সিলিং-এর হালকা নীলাভ আলোর দিকে চেয়ে থাকলেন চুপচাপ। হঠাৎ ঢং ঢং শব্দে বাজতে শুরু করল দামী সুইস দেয়াল ঘড়িটা। গুণতে থাকলেন বদরুল হাসান। বারো...এক...দুই...তিন। থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি। তাঁকে আতঙ্কিত করে দিয়ে ভেসে এল ধাতব, খনখনে কতগুলো শব্দ, 'এখনও সময় আছে। ভেগে পড়ো, বদরুল।' চোখ বড় বড় করে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল সাহেব। ওখান থেকেই কথাগুলো আসছে। ভাঙা রেকর্ডের মত একভাবে বেজে যেতে লাগল পেণ্ডুলাম। আর সহ্য হলো না বদরুল সাহেবের। বেড সাইড টেবিলের ওপর মার্বেল পাথরের সাদা একটা কুকুরের মূর্তি ছিল, ওটাকে ঝট করে হাতে তুলে নিলেন তিনি। 'শুয়োরের বাচ্চা।' বলে ছুঁড়লেন দেয়াল ঘড়ি লক্ষ্য করে। কাঁচ ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ফেটে চৌচির হয়ে গেল শৌখিন জিনিসটা। কিন্তু পেণ্ডুলামটা দুলতেই থাকল আগের মত। আর সেই অসহ্য কথাগুলো! উঃ!

কানে আঙুল চাপা দিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরুলেন বদরুল হাসান। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। তবু ভেতরে যেতে সাহস পেলেন না তিনি। ঝুল বারান্দায় ইজি চেয়ারটায় বসে থাকলেন চুপচাপ। অন্ধকার আকাশে তাঁর দৃষ্টি। দরদর ধারায় জল পড়ছে চোখ বেয়ে। অঝোরে কাঁদছেন বদরুল হাসান।

ভোরের নরম রোদ গায়ে মেখে জেগে উঠলেন বদরুল হাসান। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কয়েকজন কৌতূহলী মর্নিং ওয়াকার পথ চলতে তাঁর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। বিব্রত বোধ করলেন বদরুল সাহেব। প্রতিবেশীদের সাথে তাঁর

সদ্ভাব নেই। তার কাছে প্রতিবেশী মানেই পরনিন্দা, পরচর্চাকারী। এজন্য কোনও দিন কারও সাথে সেধে আলাপ করার প্রবৃত্তি হয়নি বদরুল সাহেবের। আর তারাই তাঁকে সাত সকালে ব্যালকনিতে হাঁ করে ঘুমাতে দেখে নিশ্চয়ই মুখরোচক গল্পের সন্ধান পেয়ে গেছে। অবশ্য কে কী বলল তার থোড়াই কেয়ার করেন তিনি। লোকগুলোর দিকে মুখ বাঁকিয়ে তিনি ঢুকে গেলেন ঘরে। তারপর ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢুকলেন।

প্রতিদিন শেভ করার অভ্যাস বদরুল সাহেবের। কিন্তু আজ ক'দিন গালে ব্লেড ছোঁয়াননি ইচ্ছে করেই। ঘুম হয় না বলে অবসাদ তাঁকে গ্রাস করে থাকে সর্বক্ষণ। আয়নায় তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠলেন বদরুল হাসান। একী দশা! চোখের নীচে কয়েক পোচ কালি, খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো সব সাদা। গালের হনু দুটো জেগে উঠেছে প্রকটভাবে। চোখের সাদাটে জমির পাশে ছানির মত কী যেন। চাউনিটা উদভ্রান্ত, অসহায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলেকট্রিক রেজরটা হাতে নিলেন বদরুল হাসান। প্লাগ লাগানোই ছিল, সুইচ টিপতেই চালু হয়ে গেল যন্ত্র। গালে ছোঁয়ালেন তিনি ধারাল রেজার। আহ, কী ঠাণ্ডা! ইলেকট্রিক নিড়ানির মত দাড়ির জঙ্গল সাফ হতে লাগল মৃদু ঘস ঘস শব্দে। হঠাৎ উঃ! করে উঠলেন বদরুল সাহেব। হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন গাল থেকে। বিস্ফারিত চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর কালচে চামড়ায় প্রথমে সাদা একটা কাটা দাগ ফুটে উঠল, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ফাঁকটা পূরণ হয়ে গেল টকটকে লাল রক্তে। অসাবধানতার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলেন বদরুল সাহেব। গালে আবার রেজার ছোঁয়াতে যাবেন, আয়নায় তাকিয়ে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। রেজরটাকে অবিকল গোখরো সাপের ফণা মনে হলো, ছোবল মারতে উদ্যত। সরাসরি রেজরের দিকে চাইলেন বদরুল

হাসান। হার্ট বিট মিস করল একটা। রেজরটা যেন ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। হঠাৎ রেজর ধরা হাতটা নড়তে শুরু করল। টেনে নিয়ে যাচ্ছে গালের দিকে। হাতটাকে থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বদরুল। পারলেন না। ছোবল দিল ওটা তাঁকে। তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন জুলফির নীচে। 'মাগো!' বলে খালি হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়াতে শুরু করল রক্ত। রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে, হাতে ধরা ইলেকট্রিক রেজর, বদরুল হাসানের ভয়ার্ত মুখ–সব মিলে আয়নায় যেন সিনেমার এক ফ্রিজ শট।

একটা গাল দিয়ে রেজরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বদরুল। ওটা বাথরুমের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে এক কোণে পড়ে থাকল। দ্রুত আয়োডিন লাগালেন তিনি কাটা জায়গায়। জ্বলে উঠল ভীষণ। দাঁতে দাঁত চেপে ড্রেসিং-এর কাজটা সারলেন বদরুল হাসান। তারপর রেজরটাকে চোখের আগুনে পোড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার তুলে রাখলেন যথাস্থানে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে নাস্তা সারলেন বদরুল হাসান। তাঁর একটা ঠিকে ঝি আছে। ভোরবেলায় এসে বাসন-কোসন ধুয়ে, নাস্তা বানিয়ে, দুপুর আর রাতের খাবার রান্না করে চলে যায়।

নাস্তা সেরে সেদিনের ইত্তেফাকটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন বদরুল সাহেব। সেই একই গৎবাঁধা খবর। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, টাকার আরেক দফা অবমূল্যায়ন, অমুক জায়গায় ডাকাতি, তমুক জায়গায় ছিনতাই ইত্যাদি ইত্যাদি। হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে বিরক্ত বদরুল কাগজটা ফেলে দিলেন টেবিল থেকে। টেনে নিলেন কফির কাপ। ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিচ্ছেন, এই সময় বেজে উঠল ফোন। ঝন ঝন শব্দটা কানে মধু বর্ষণ করল। আসলে এই মুহূর্তে কারও সঙ্গ চাইছিলেন বদরুল সাহেব। হোক না সে অদৃশ্য সঙ্গী। সাগ্রহে রিসিভার কানে ঠেকালেন বদরুল হাসান।

'ইটস বি হাসান স্পীকিং,' গমগমে গলায় বললেন তিনি।

'আচ্ছা, এটা কি তারকালোক?' ভেসে এল একটা কচি কণ্ঠ।

'না তো! তুমি কত নম্বর চাইছ?'

'আমি একটু জাহিদ হাসানের নাম্বারটা চাইছি। ভীষণ দরকার। দিতে পারবেন?'

অপর প্রান্তে অনুনয়।

বেশ মজা পেলেন বদরুল হাসান। বোঝাই যাচ্ছে নয়-দশ বছরের বাচ্চা। তিনি বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে বেশ পছন্দ করেন।

'জাহিদ হাসানের নাম্বার দিয়ে কী করবে তুমি?' কৌতুকের সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

'উনি না আমার খুব প্রিয় অভিনেতা। আপনি বিটিভিতে সবুজ সাথী দেখেন? ওই যে মফিজ পাগলা...'

শেষ কবে বিটিভি দেখেছেন মনে করতে পারলেন না বদরুল হাসান। স্যাটেলাইটের অনুষ্ঠানগুলোই তাঁর কাছে ট্র্যাশ মনে হয়, বিটিভি দূরে থাক। তবু বাচ্চাটার সাথে কথা চালিয়ে যাবার লোভে তিনি বললেন, 'হুম। দেখেছি তো।'

'তা হলে তো কথাই নেই। জানেন, সেদিন না...' সোৎসাহে কী যেন বলতে গিয়েছিল বাচ্চা, হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল।

ভয়ংকর দৃষ্টিতে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল হাসান। যেন লাইন কেটে যাবার জন্য ফোনটারই দোষ।

প্রচণ্ড জোরে তিনি রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন। গায়ের ঝাল কমল যেন কিছুটা। তারপরও ওটার দিকে কটমট করে চেয়ে রইলেন। এমন সময় আবার 'ক্রিং ক্রিং' আওয়াজ। বাচ্চাটাই আবার ফোন করেছে ভেবে তাড়াতাড়ি রিসিভার কানে ঠেকালেন বদরুল হাসান।

'এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?' ভরাট গলায় কেউ বলে উঠল ওধার থেকে।

'কী!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বদরুল হাসান।

'বলছি এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল অদৃশ্য কণ্ঠ।

আর সহ্য করতে পারলেন না বদরুল হাসান। 'ইউ ব্লাডি ফুল!' বলে গায়ের জোরে রিসিভারটা ছুঁড়ে মারলেন। তারে টান খেয়ে ক্রেডলসুদ্ধ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ফোন। টপ সেন্টার টেবিলের এক কোণে ফোনের তার বেধে গেল যেন কীভাবে। শূন্যে ঝুলতে লাগল রিসিভার। মাউথ পিস দিয়ে একভাবে, একঘেয়ে কথাগুলো ভেসে আসতে লাগল বার *বার–'এখনও সময় আছে, বদরুল। ভেগে পড়ছ না কেন?'*

ছুটে গেলেন বদরুল। এক টানে ছিঁড়ে ফেললেন তার। তারপর পাগলের মত রিসিভারটা কার্পেটে ঢাকা মার্বেল পাথরের মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন। ভেঙে টুকরো হয়ে গেল ওটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ভাঙা ফোনের পাশে বসে হাঁফাতে লাগলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর সুস্থির হয়ে ভাবতে বসলেন বদরুল হাসান। এরকম কেন ঘটছে? তাঁর মাথা টাথা সত্যি খারাপ হয়ে যায়নি তো? তিনি কি স্রেফ হ্যালুসিনেশনের শিকার নাকি যা ঘটছে সব বাস্তব? শেহনাজ ঠিকই বলেছে তাঁর আসলে ডাক্তার দেখানো দরকার। নাকি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবেন? ধুর তিনি কি পাগল নাকি যে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাবেন? তারচে' কোনও মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভাল। ঘুম না হওয়াটাই তাঁর রোগ। কীভাবে ঘুম হবে এটা জানতে হলেও একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

মেডিসিনের জাঁদরেল ডাক্তার প্রফেসর বাতেনকে দেখাবেন, সিদ্ধান্ত নিলেন বদরুল সাহেব। কিন্তু ডা. বাতেনের সাথে আগে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। অভ্যাস বশে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলেন। তাঁর সামনেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভাঙা রিসিভার।-এ এলাকায় কাছে পিঠে কার্ড ফোন সেন্টার নেই। এক কিলোমিটার দূরে পুলিশ বক্সের সাথে আছে একটা। এখন আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। মোবাইল ফোনটাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। একবার ভোরের কাগজ-এ ফোন করার চেষ্টা করছিলেন জরুরী প্রয়োজনে। বার বার এনগেজড টোন পাওয়ায় মাথায় রক্ত চড়ে যায় বদরুল সাহেবের। সব দোষ মোবাইলের ওপর চাপিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলেন তিনি ওটাকে। সন্ধ্যা বেলায় নিজেই যাবেন ডাক্তারের কাছে, সিদ্ধান্ত নিলেন বদরুল সাহেব। প্রফেসরের অ্যাসিস্ট্যান্টকে একখানা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলে আজকেই সে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবে।

## তিন

খিঁচানো মেজাজ নিয়ে বাসায় ফিরলেন বদরুল হাসান। প্রফেসর বাতেনকে পাননি তিনি। চেম্বার বন্ধ। শুক্রবার তাই। আরে, শুক্রবার বলে কি অসুখ-বিসুখগুলোও ছুটি নেয় নাকি? নাকি বন্ধের দিন বলে স্পেশাল তোয়াজ করে? যত্তসব কাণ্ডজ্ঞানহীন ডাক্তারের বাস এ দেশে।

রাগে গজ গজ করতে করতে বদরুল সাহেব বার ক্যাবিনেট থেকে একটা 'ভ্যাট সিক্সটি নাইন'-এর বোতল বের করলেন। মদ্যপানের অভ্যাস তাঁর তেমন নেই। কোনও কারণে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লে তরল পদার্থটা টনিকের কাজ দেয়। কিন্তু আজ কাজ করল উল্টো। দপদপিয়ে ব্যথা শুরু হলো মাথায়। যেন ফেটে যাবে। ব্যালকনিতে এসে বসলেন। এক ফোঁটা

বাতাস নেই। খিঁচানো মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল আরও। ঢুকলেন শোবার ঘরে। ফুল স্পীডে এসি ছেড়ে দিলেন। ধুত্তুরি, ঘর ঠাণ্ডা হচ্ছে কই? নাকি এই ব্যাটাও জাত ভাইদের মত বিট্রে শুরু করে দিল? খানিকক্ষণ এয়ার কুলারের নবগুলো নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলেন তিনি। মুখ প্রায় ঠেসে ধরলেন যন্ত্রটার গায়ে। 'উঁহুঁ, কেমন একটা গরম বাতাস আসছে না?' 'আমার সাথে বিটলামী, না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা' বলে বাথরুমে ঢুকলেন বদরুল হাসান। পানি দিয়ে চোবাবেন এয়ার কুলার। জবর শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন যাতে এমন ফাজলামি আর না করে।

বাথরুমের দরজায় পা রাখতেই বদরুলের চোখ কপালে উঠে গেল। শেভিং কেবিনেটে রাখা ইলেকট্রিক রেজরটা নিজে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখ কচলালেন বদরুল। ভুল দেখছেন না তো? নাহ, ওই তো ওটা নড়ে উঠল। তারপরই বদরুল সাহেবকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

'বাপরে।' বলে মাথা সরিয়ে নিলেন বদরুল সাহেব। ভীষণভাবে মাথাটা ঠুকে গেল দরজার কোণে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিনে পয়সায় তারার ফুলঝুরি দেখলেন তিনি। তারপর প্যান্ট বেয়ে সরসর করে কী একটা উঠে আসছে টের পেয়ে সেদিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন। রেজরটা!

আহত জন্তুর মত গোঙানি বেরিয়ে এল বদরুল হাসানের গলা থেকে। হাতের এক ঝটকায় রেজরটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ালেন বেডরুমে। দরজা বন্ধ করার আগে এক পলক দেখলেন এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে রেজর ঠিক গোখরো সাপের মত ফণা তুলে।

দরজায় খিল দিয়ে কিছুক্ষণ হাপরের মত হাঁফালেন বদরুল। হঠাৎ টের পেলেন খুব শীত করছে তাঁর। চালু হয়ে গেছে এসি পুরো দমে। ঠকাঠক কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল। এয়ার কুলার বন্ধ করার জন্য এগোলেন তিনি। কিন্তু দু'পা এগোনোই সার।

যন্ত্রটাতে যেন সাইক্লোন বইতে শুরু করেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে বাতাসের। কিছুতেই এসির সামনে যাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে ঘরের তাপ মাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে নেমে এল। বদরুল সাহেব বুঝলেন আর কয়েক মিনিট এ ঘরে থাকলে তিনি ঠাণ্ডায় জমেই মারা যাবেন। এয়ার কুলার বন্ধের আশা ত্যাগ করে দরজা খুললেন তিনি। এবং সাথে সাথে আক্রান্ত হলেন।

শয়তান রেজরটা যে দরজার কাছেই ওঁৎ পেতে ছিল, কে জানত? সোজা বদরুল সাহেবের টুঁটি লক্ষ্য করে ওটা লাফ দিল। একটুর জন্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো আক্রমণ। সাঁৎ করে মাথা সরিয়ে নিয়েছেন বদরুল। রেজর গিয়ে ধাক্কা খেল দরজার চৌকাঠে।

পড়িমরি করে দৌড় দিলেন বদরুল হাসান। এক সাথে তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে লাগলেন ওজনদার শরীর নিয়েও। নীচ তলায় নেমে পেছন ফিরে চাইতেই আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। রক্তের নেশায় উন্মাদ রেজরটা লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

দৌড় দিতে গেলেন বদরুল হাসান। সকালে ছিঁড়ে রাখা টেলিফোনের তারে পা-বেধে দড়াম করে খেলেন এক আছাড়। দুনিয়া দুলে উঠল চোখের সামনে। ঠিক তখন সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল।

স্টাডি রুমে আপনা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠল টাইপ রাইটার। খট খট শব্দে ওটা কী টাইপ শুরু করে দিয়েছে বদরুল সাহেব বুঝতে পারলেন খুব ভাল ভাবে। তাঁর বেডরুমের ভাঙা দেয়াল ঘড়িটা বাজতে শুরু করল ঢং ঢং শব্দে। ভাঙা টিভির শূন্য গহ্বর থেকে ভেসে এল খল খল হাসি। আর একই সঙ্গে ভাঙা ফোন বেজে উঠল। 'ক্রিং ক্রিং' শব্দটা বিস্ফোরণের মত বাজল কানে। বদরুল সাহেব শুনতে পেলেন দেয়াল ঘড়ি, টিভি আর ফোন এক সাথে বলতে শুরু করেছে, 'তোমার আর রক্ষা নেই, বদরুল।

আর রক্ষা নেই।'

গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করতে মন চাইল বদরুল সাহেবের। চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করলেন তিনি যা শুনছেন সব মিথ্যা, যা দেখছেন তা দুঃস্বপ্ন বৈ অন্য কিছু নয়।

কিন্তু পায়ে সাপের দংশনের মত তীব্র জ্বালা টের পেতেই লাফিয়ে উঠলেন বদরুল। সেই রেজরটা। ধারাল খুরের আঘাতে গোড়ালির কাছ থেকে কেটে নিয়েছে প্যান্ট। গল গল ধারায় বেরুনো তাজা রক্ত সাথে সাথে শুষে নিয়ে আরও রক্তাক্ত রঙ ধারণ করল লালচে কার্পেট।

এক লাথিতে রেজরটাকে পা থেকে ফেলে দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ি-বারান্দার দিকে ছুটলেন বদরুল হাসান। অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিল শক্তিশালী, কালো মার্সিডিজ বেঞ্জটা। তিনি কাঁপা হাতে চাবি বের করলেন পকেট থেকে, তালা খুলতে গিয়ে ঝনাৎ করে পড়ে গেল রিংসুদ্ধ চাবি। নিজেকে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে উবু হলেন বদরুল। হঠাৎ তাঁর পিলে চমকে দিয়ে মেঘ গর্জনের শব্দে চালু হয়ে গেল মার্সিডিজের ইঞ্জিন। সার্চ লাইটের মত একটা হেড লাইট জ্বলে উঠল অন্ধকারের বুক চিরে। তারপর ব্যাক গিয়ার মেরে গাড়িটা নিজেই পিছু হটল। চাবি খুঁজবেন কী, এমন ভৌতিক কাণ্ড দেখে সব ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন বদরুল হাসান গাড়ির দিকে। সম্বিত ফিরল যখন মার্সিডিজ সগর্জনে তাঁর দিকে ছুটে এল, তখন।

হেড লাইটের তীব্র আলো অন্ধ করে দিল বদরুল হাসানকে। গাড়িটা তাঁর গায়ের ওপর এসে পড়ছে বুঝতে পেরে ব্যাঙের মত লাফ দিলেন তিনি এক ধারে। আহত পাটা বেকায়দা পড়ল এক টুকরো দশ ইঞ্চি ইটের ওপর। দুনিয়া ফাটানো চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। পরক্ষণে চিৎকারটাকে গপ করে গিলে ফেলতে হলো মূর্তিমান আজরাইলকে আবার তাঁর দিকে ছুটে আসতে

দেখে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এবার দিক্‌বিদিক্‌ শূন্য হয়ে ছুটলেন মি. বদরুল হাসান।

মৃত্যু ভয় কাকে বলে টের পেলেন তিনি। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করলেন কিন্তু কেউ শুনল না তাঁর কথা। তুরাগ নদীর ধারে, উত্তরার একেবারে শেষ প্রান্তে নিজের বাড়িটি করেছেন বদরুল সাহেব। এদিকে সকালে আর বিকেলে স্বাস্থ্যসেবীরা আসে তাজা বাতাস ভক্ষণ করতে। সন্ধ্যার পরে কেউ ভুলেও পথ মাড়ায় না। কারণ এখানকার বাসিন্দাদের সন্ধ্যার পর সময় কাটে ক্লাবে বা পার্টিতে। আর বদরুল সাহেবের মরণ আর্তনাদ কেউ শুনতে পাচ্ছে না কারণ তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়িও এখান থেকে অন্তত পাঁচশো গজ দূরে। সে বাড়িতে এ মুহূর্তে আলো জ্বলছে না। হয়তো বাসিন্দারা বেরিয়ে পড়েছে নৈশ অভিসারে। তাই কেউ দেখল না একটি অসহায় মানুষ উন্মত্ত যন্ত্র দানবের হাতে নির্মম মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন।

খানাখন্দে হোঁচট খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ছেলে বেলার কথা মনে পড়ছে বদরুল হাসানের। ছোট বেলা থেকেই সব ধরনের যান্ত্রিক অনুষঙ্গের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা। বাড়ির টিভি, রেডিও ইত্যাদি নিজ হাতে খুলে, নব টব মুচড়ে দিয়ে বিকৃত মজা পেতেন তিনি। বড় হয়েও যায়নি বদভ্যাসটা। ইলেকট্রিক গ্যাজেটগুলো অনভ্যস্ত হাতে নাড়াচাড়ার কারণে বহুবার ওগুলো বিগড়ে গেছে আর সেই সাথে জিনিসগুলোর প্রতি ঘৃণা বেড়েছে বদরুল সাহেবের। মনে হয়েছে তাঁকে মানসিক অশান্তিতে রাখার জন্যই যন্ত্রগুলো ইচ্ছে করে নষ্ট হয়। আর তাঁকে মেরামতের জন্য বার বার পকেট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা গচ্চা দিতে হয়।

কিন্তু এখন কৃতকর্মের জন্য বড্ড আফসোস হচ্ছে বদরুল হাসানের। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর এতকাল অবিচার করার ফল এখন পাচ্ছেন হাতে হাতে। জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হচ্ছে।

বিশাল বপু নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটছেন বদরুল হাসান। পেছনে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর মত শখ করে কেনা মার্সিডিজ বেঞ্জ। আজ বিকেলেও ওটার দরজা ঠিক মত খুলছিল না বলে পেল্লায় এক লাথি বসিয়ে দিয়েছিলেন বদরুল। হয়তো সেই লাথির প্রতিশোধ নিতেই ছুটে আসছে মূর্তিমান আতঙ্ক।

ছুটতে ছুটতে তুরাগের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন বদরুল সাহেব। দূরে কোথাও পাড় ভাঙার অস্পষ্ট শব্দ বুকে কাঁপ ধরাল। নীচে তাকাতেই হিম হয়ে গেল শরীর। অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু খলবলে জল রাশির শব্দ। পেছনে তাকালেন তিনি। হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে যমদূত।

'মাফ করো!' দু'হাত জড় করে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'আমি সাঁতার জানি না। আমাকে এভাবে মেরো না, প্লীজ

জবাবে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। আবার এগোতে শুরু করল মৃত্যু। এক পা করে পিছু হঠতে শুরু করলেন বদরুল হাসান। এগিয়ে আসছে মার্সিডিজ। একটা হেড লাইটে গাড়িটাকে এক চোখো দানবের মত লাগছে। চোখটা মৃত্যু খিদেয় অস্থির।

পিছু হঠতে হঠতে একেবারে পাড়ের কিনারে এসে গেলেন বদরুল হাসান। এখানে মাটি খুব নরম। তাঁর ভারী শরীরের ওজন সইতে পারল না নরম মাটি। হঠাৎই টের পেলেন বদরুল সাহেব পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে আশ্রয়, পিছলে পড়ে যাচ্ছেন তিনি উঁচু পাড় থেকে। ছিটকে পড়ার আগ মুহূর্তে বদরুল সাহেবের মনে হলো মার্সিডিজের চোখটা যেন হাসছে। প্রতিশোধ নিতে পারার পরিতৃপ্তির হাসি!

## চার

বদরুল হাসানের ফুলে ফেঁপে ওঠা পচা লাশ তুরাগের দক্ষিণে আবিষ্কার হলো দিন দুই পরে। মাছ ধরতে গিয়ে স্থানীয় জেলেরা লাশটাকে পেল। তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দিল মৃত দেহ।

যথারীতি পোস্টমর্টেম হলো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার বললেন, প্রচুর মদ্য পানের আলামত পাওয়া গেছে তাঁর দেহে। রুটিন মাফিক তদন্তে পুলিশ বদরুল সাহেবের প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারল, বদরুল সাহেবকে নাকি অনেকেই দেখেছে একা, উদভ্রান্তের মত কথা বলতে। দু'একজন প্রতিবেশী এটাও জানাল মাঝে মাঝেই তাঁর বাসার সামনে দিয়ে যাবার সময় গোঙানি আর চিৎকারের আওয়াজ শুনেছে। সমস্যা হয়েছে কিনা জানতে গিয়েছিল তারা। অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদেরকে। এরপর থেকে বদরুল হাসানের ব্যাপারে তারা আর মাথা ঘামায়নি।

তদন্ত শেষে পুলিশ তাদের রিপোর্টে লিখল মি. বদরুল হাসানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। একা থাকতেন তিনি, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। শেষ দিকে তাঁর মধ্যে এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতি লক্ষ করা যায়। ঘটনার দিন প্রচুর মদ খেয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি গাড়ি নিয়ে। (গাড়ির হুইলে তাঁর হাতের ছাপ এ প্রসঙ্গে লক্ষনীয়)। সম্ভবত তুরাগ নদীর ধারে এসে হাওয়া খেতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। মাতাল অবস্থায় পাড় ভেঙে ছিটকে পড়েন নদীতে। এবং সলিল সমাধি লাভ করেন।

এই ঘটনার মাস ছয় পরে বনানী গোরস্তানে এসেছে তমিজ আলী

কবরের গায়ে বেড়ে ওঠা ঘাস, আগাছা ইত্যাদি ছাঁটতে। ঘাস ছাঁটার যন্ত্র দিয়ে কাজটা এক মনে চালিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ একটা কবরের পাশে এসে যন্ত্রটা যেন পাগল হয়ে উঠল। বার বার তমিজ আলীর হাত থেকে ছিটকে যেতে চাইল, কবরটার গায়ে আঘাত করতে ল্যাগল। যেন তীব্র ঘৃণা ভরে লাথি মারছে। তমিজ ভাবল তার যন্ত্রে বুঝি গোলমাল। সে ঘাস কাটার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল। কোনও সমস্যা নেই। অন্য কবরের পাশের আগাছা ঠিকই সাফ করছে যন্ত্র, কিন্তু নতুন, দামী পাথরের এই কবরটার কাছে এলেই যেন খেপাটে আচরণ শুরু করে দিচ্ছে। কৌতূহল হলো তমিজ আলীর। কবরটার দিকে তাকাল সে ভাল করে। অল্প স্বল্প লেখাপড়া জানে। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। পড়ল:

**মি. বদরুল হাসান**

(১৯৫২-১৯৯৭)

এই কবরে নিশ্চয়ই জিনের আসর আছে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবল তমিজ আলী। নইলে ঘাস কাটার যন্ত্র এমন করে কেন?

জিনের কথা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল ওর। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে কেউ নেই। আয়াতুল কুরসী পড়ে বার তিনেক ফুঁ দিল বুকে। তারপর যন্ত্রটা শক্ত মুঠোয় চেপে কবরটার দিকে সভয়ে আরেক বার তাকিয়ে গোরস্তানের গেটের দিকে হন হন করে হাঁটা দিল।

---

# ফাঁদ

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় ছোট্ট হোটেলটিতে এসে পৌঁছলেন মশিউ পিনেট। রাস্তার ওপর শরতের শুকনো পাতা, বিবর্ণ পথটা ধরে হেডলাইটের আলোয় গ্রামের আঁধার চিরে আসার সময় মনটা বেশ উৎফুল্লই ছিল পিনেটের। তিনি প্যারিস টেক্সটাইল ম্যানুফাকচারারের একটি বড় ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ। উত্তর ফ্রান্সের একঘেয়ে এলাকাগুলোতে আগে নিয়মিত ঢুঁ মেরেছেন পিনেট। দু'ধারে পপলার গাছের সারি, মাঝখানে রাস্তা। বহুবার তিনি এ রাস্তায় যাতায়াত করেছেন। আজ অবশ্য আলাদা আরেকটা এলাকায় এসেছেন তিনি, দক্ষিণের লিঁও থেকে ইলে ডি ফ্রান্সের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। তাঁর বেতন বেড়েছে, ফুর্তির এটি অন্যতম একটি কারণ। আর নতুন এলাকায় যেতে পারছেন, স্বভাবতই ভাল লাগছে তাঁর।

এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় শ্বাসরুদ্ধকর। বিপুল বেগে গাড়ি ছুটিয়েছেন পিনেট, হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা। আনন্দ থাকারই কথা। অত্যন্ত সফল হয়েছে তাঁর এবারকার ট্যুর। মক্কেলের দেয়া টাকায় ফুলে আছে মানিব্যাগ।

এ মুহূর্তে তিনি ফ্রান্স থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে তাঁর বাড়ি কুরবোভোই'র শহরতলীতে। দীর্ঘ পথভ্রমণে শরীর বেজায় ক্লান্ত, গাড়ি ঠেলে বাড়ি পৌঁছার ধকল আর সইতে পারবেন না বুঝতে পেরেছেন। সেই অক্সেরে থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছেন তিনি,

এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ ছোট হোটেলটার সাইনবোর্ডে আটকে গেল চোখ। সিদ্ধান্ত নিলেন রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন বাড়ি ফিরবেন। হোটেলটা প্রায় একটা জঙ্গলের মধ্যেই বলা যায়। চারপাশে পাইন গাছ, একটা ক্যানভাসের নীচে কতগুলো চেয়ার-টেবিল ফেলে রাখা, অবশ্য হলওয়েতে আলো জ্বলছে। তার মানে এটা পরিত্যক্ত নয়। পাইন গাছের নীচে গাড়ি রাখলেন পিনেট। এক বার-এ চোখ পড়ল, অনেকগুলো বোতল সাজানো বারটিতে। দেখে মনে হয় উষ্ণ, তরল পদার্থে বোঝাই বোতলগুলো।

হোটেল বা সরাইখানাটির সামনে আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। তবে ও নিয়ে পিনেটের ভাবনাও কিছু নেই। তিনি কারও সঙ্গ আশা করছেন না, এ মুহূর্তে আধ বোতল ওয়াইনের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে বুকটা। মদ গিলে শরতের হিম ভাবটা থেকে রক্ষা পেতে চান। তারপর পেট পুরে ডিনার খেয়ে আট ঘণ্টা ঘুম দিলেই পরদিন সকালে তাজা মন ও শরীর নিয়ে যাত্রা শুরু করা যাবে প্যারিসের উদ্দেশে। গাড়ি পার্ক করে ওতে তালা লাগালেন পিনেট, তারপর হল ঘরে ঢুকলেন। পালিশ করা মেঝেতে শুয়ে আছে একটা বেড়াল। শহুরে পোশাক পরা এক লোক কনিয়াক পান করছে। এ ছাড়া জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। লোকটা পিনেটকে দেখে মৃদু গলায় 'শুভ সন্ধ্যা' বলল। তারপর এক ঢোকে গ্লাসের তরল জিনিসটা শেষ করে বেরিয়ে গেল। মশিউ পিনেট জানালা দিয়ে দেখলেন একটা নীল রঙের বড় মার্সিডিজ নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। গাড়িটা রাস্তার ঢালে পার্ক করা ছিল।

কাউন্টারের বেল টিপে ধরতেই চটি ফটফট করে এগিয়ে এল এক লোক। বিনয়ের অবতার সেজে জানাল—হ্যাঁ, মশিউ অবশ্যই এখানে একটা ঘর পেতে পারেন, আর ডিনারের ব্যবস্থাও করা যাবে।

মশিউ পিনেট রেজিস্টারে নিজের নাম সই করলেন। চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবাকই লাগল তাঁর, এতবড় ডাইনিং রুম, অন্তত দুশো মানুষ এক সাথে বসে খেতে পারে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এটা ট্যুরিস্ট সিজন নয়, ব্যাখ্যা করল হোটেল মালিক। তাই লোকজন খুব কমই আসে। অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই পিনেটের। তিনি এখন ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই খুশি।

হোটেল মালিক মধ্যবয়স্ক, টাক মাথা, কান জোড়া অস্বাভাবিক বড়। চোখ দুটি কুঁতকুঁতে, লোভ আর কুটিলতার ছায়া তাতে। হাসার সময় বেরিয়ে পড়ল সোনা বাঁধানো দাঁত, আলো পড়ে ঝিক করে উঠল। হাসলে লোকটাকে মোটেই ভাল লাগে না, কুৎসিত দেখায়।

লোকটা তার নাম বললেও ঠিক শুনতে পাননি পিনেট। তবে প্রথম দর্শনেই টাকুকে অপছন্দ হয়েছে তাঁর। ডিনার টেবিলে হাজির থাকল সে। পিনেট আশপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। অবশ্য রান্নাঘরে কেউ থাকতে পারে মনে হলো তাঁর। একটু পর লো-কাট কালো ফ্রক পরা এক মুটকিকে দেখতে পেলেন তিনি এক ঝলকের জন্যে, দূর থেকে হেঁটে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সালাম করল, বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলে গেল। লোকটার বউ হবে, ধারণা করলেন পিনেট।

খাওয়ার আগে হাত মুখ ধোয়া দরকার। টয়লেটের দরজা দেখিয়ে দিল হোটেল মালিক। ডাইনিং রুমের পরে ছোট্ট করিডর, তার মাথায় টয়লেট। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে বাতির সুইচ জ্বালালেন পিনেট এবং শিউরে উঠলেন দৃশ্যটা দেখে। একটা মাকড়সা। প্রকাণ্ড। বাদামি রঙ। বসে আছে চিড় ধরা পাথুরে মেঝেতে। ওটার ধাতব চোখজোড়া যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পিনেটের দিকে। মাকড়সা ভীষণ ভয় পান পিনেট। তীব্র ঘৃণায় ওটাকে জুতোর নীচে পিষে

ফেললেন তিনি।

টয়লেটের দরজা খুলে আলো জ্বেলে আর্তনাদ করে উঠলেন পিনেট। এখানেও দুটো দানব, একটা দেয়ালে, তাঁর মাথার কাছে, অন্যটা কমোডের নীচে, মেঝেতে। ওটা নড়ে উঠতে খসখসে পায়ের শব্দও যেন শুনতে পেলেন পিনেট। আর অদ্ভুত ব্যাপার, নীল ধাতব চোখ মেলে সরাসরি তাকিয়ে থাকল মাকড়সা পিনেটের দিকে। পিনেটের মনে হলো ওটার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা। তিনি এটাকেও ভর্তা বানালেন জুতোর নীচে পিষে। চোখের আলো নিভে গেল প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে।

অপর মাকড়সাটা বিদ্যুৎগতিতে ল্যাভেটরির সিস্টার্নের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, পিনেট আবার চিৎকার দিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে চলে এল হোটেল মালিক। মনে হলো মজা পেয়েছে লোকটা, চোখ জোড়া নাচছে।

'না, মশিউ,' বলল সে, 'ভয় পাবার কিছু নেই। বছরের এ সময়ে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে ওগুলো প্রায়ই চলে আসে এদিকে। ওগুলো আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। সবগুলোই আমার পোষা।'

মুখ দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করল লোকটা, পিনেটের কানে রীতিমত অশ্লীল শোনাল, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সিস্টার্নের আড়াল থেকে উদয় হলো বাদামী আতঙ্ক। পিনেটের চোখ বড় বড় হয়ে গেল অবিশ্বাসে, মাকড়সাটা লোকটার হাতের তালুতে উঠে আসছে। মাকড়সার গায়ে টোকা দিল হোটেল মালিক, কুঁকড়ে গেল ওটা। হাতের তালুতে বসে রইল চুপচাপ।

মশিউ পিনেট ম্লান এবং বিবর্ণ লোকটাকে 'এক্সকিউজ মি' বলে করিডরের বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। ডাইনিং রুমে ফিরে আসার পর খানিক স্বস্তি বোধ করলেন। লোকটার হাতে মাকড়সাটাকে দেখতে না পেয়ে পেশীতে ঢিল পড়ল তাঁর।

হোটেলঅলা অদ্ভুত মানুষ হলেও রান্নার হাতটা সত্যি ভাল। ডিনার খেয়ে তৃপ্তি পেলেন পিনেট। ডিনার শেষে হোটেলঅলাকে একসাথে ড্রিঙ্ক করার অফারও দিয়ে বসলেন। সরাইখানাটা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে লোকটা বলল, 'না। আমরা বেশিদিন কোথাও থাকি না। আমি এবং আমার স্ত্রী।'

এ নিয়ে আর কথা বলার আগ্রহ অনুভব করলেন না পিনেট। ঠিক করলেন হোটেলঅলার চার্জ এখুনি বুঝিয়ে দেবেন। তিনি হিসেবী মানুষ। ভোরে উঠেই চলে যাবেন।

টাকার বান্ডিলে ঠাসা মানিব্যাগটা খুললেন পিনেট। ওদিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল হোটেল মালিকের। লোকটা তাঁর মানিব্যাগের দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে পিনেট দ্রুত কয়েকটা অফিশিয়াল চিঠি দিয়ে বান্ডিলগুলো আড়াল করার চেষ্টা করলেন। তাতে লাভ হলো না। উল্টো আরও ফুলে উঠল মানিব্যাগ।

মানিব্যাগের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হোটেলঅলা বলল, 'এবার বেশ কামিয়েছেন, মশিউ'। প্রশ্ন নয়, বিবৃতির মত শোনাল কথাটা। পিনেট দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। খানিক পরে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ব্যাগটা নিয়ে চললেন দোতলায়, শোবার ঘরে।

করিডরে কার্পেট বিছানো, কয়েকটা টেবিলও পাতা আছে। তাতে ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল, উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ১২ নম্বর ঘরটা পিনেটের। তিনি মাত্র তালায় চাবি ঢুকিয়েছেন, এমন সময় আলো নিভে গেল। নীচতলায় সুইচবোর্ড, ওখান থেকেই ইলেকট্রিসিটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দীর্ঘ এক মিনিট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো পিনেটকে। বাম দিকে মৃদু খচখচ শব্দে তাঁর কপালে ঘাম ফুটল, তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। একটু পরে সিলিং-এর আলো জ্বলে উঠল। দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড, চোখ

বোলাচ্ছেন ঘরে।

ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো, অন্য সময় হলে ঘরের আরাম-আয়েশ ভালই উপভোগ করতেন পিনেট, কিন্তু এ মুহূর্তে সিঁটিয়ে আছেন। দ্রুত কাপড় ছাড়লেন তিনি। ব্যাগ খুলে একটা বই বের করলেন, তারপর ঘরের কোণের বেসিনে গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁত মাজতে। বিছানায় ওঠার আগ মুহূর্তে কার যেন মৃদু পায়ের শব্দ পেলেন পিনেট। জানালা দিয়ে তাকালেন, হোটেলঅলা। পিনেটের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আগ্রহে গাড়ি দেখছে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকল। বিছানায় উঠে পড়লেন পিনেট।

উপন্যাসটা যাচ্ছেতাই। তাই পড়ায় মন বসল না। দারুণ ক্লান্তি লাগলেও ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না মশিউ পিনেটের। বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালানো থাকল। একটু পরে তন্দ্রামত এল তাঁর। হঠাৎ জেগে উঠলেন গাড়ির শব্দে। হোটেল থেকে কেউ গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। একটু পরে মিলিয়ে এল ইঞ্জিনের শব্দ।

অস্বস্তিবোধ করলেন পিনেট। প্রবল ইচ্ছে হলো জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন তাঁর গাড়িটা ঠিক ঠাক আছে কিনা। উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ অস্পষ্ট খচমচ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। সাথে সাথে তাঁর নার্ভগুলো টানটান হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালেন তিনি, শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছেন। ঘড়ির দিকে একপলক তাকালেন পিনেট। দুটো বাজে। খচমচ শব্দটা আসছে হাতের কোণ থেকে। হাতের ওই কোণে টেবিল ল্যাম্পের আলো পৌঁছায়নি। এখন ঘরের আলো জ্বালতে হলে দরজার কাছে যেতে হবে পিনেটকে। আর খালি পায়ে কাজটা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি টেবিল ল্যাম্পটাকে কাত করে ধরলেন হাতের দিকে। ওখানে কিছু একটা আছে, তবে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলের দিকে হাত বাড়ালেন পিনেট চশমার জন্যে। কাজটা করতে তাঁকে ল্যাম্পটাকে খাড়া করতে হলো, আর হাতড়াতে গিয়ে শুনতে পেলেন মৃদু থপ করে একটা শব্দ হয়েছে বিছানার নীচে, কার্পেটে। চশমাটা পড়ে গেছে ওখানে। ঝুঁকলেন তিনি, হাত দুই দূরে চশমাটা, হাত বাড়ালেন চশমা তুলে নিতে।

ঠিক তখন হঠাৎ খচমচ শব্দটা আবার হলো, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন পিনেট। দেখতে পেয়েছেন ছায়া শরীর নিয়ে জিনিসটা সিলিং বেয়ে নামছে, তাঁর কাছে চলে আসছে। চশমা ছাড়াও বোঝা গেল জিনিসটা কী, যদিও ওটার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাইল না মন।

রোমশ একটা জীব, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বিষাক্ত মাকড়সা ট্যারানটুলার কথা মনে করিয়ে দিল। গোল সুপ প্লেটের চেয়েও আকারে বড়, টেলিফোন তারের মত মোটা পা। সিলিং বেয়ে নেমে আসার সময় ওটার পা দেয়ালে ঘষা লেগে খচমচ শব্দ হচ্ছে, গলা থেকে অস্পষ্ট ঘরঘর একটা শব্দও বোধহয় শোনা গেল। এগিয়ে আসছে ওটা, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তীব্র ঘৃণা নিয়ে পিনেট দেখলেন, বাদামী লোমে ভরা মুখটা অশ্লীলভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। লাঠি বা এ ধরনের অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তিনি। শুকনো জিভ টাকরায় লেগে আছে, চিৎকার যে করবেন সে অবস্থাও নেই। পাজামা ভিজে গেছে, কপাল থেকে বইছে ঘামের স্রোত। একবার চোখ বুজলেন তিনি, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকালেন। আশা করলেন চোখ মেলে দেখবেন আসলে এতক্ষণ স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। ওসব মাকড়সা-ফাকড়সার কোনও অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু বিকট প্রাণীটাকে আরও কাছে আসতে দেখে তাঁর আশা নিভে গেল দপ করে। ওটার নীলচে চোখজোড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাথরুমে ভর্তা করে দিয়ে আসা জীবগুলোর মত

স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। প্রবল ঘৃণা এবং ভয় নিয়েও বিস্ময়বোধ করলেন পিনেট। চোখ জোড়া যেন অবিকল হোটেলঅলার মত! থেমে দাঁড়াল জীবটা, তারপর লাফ মেরে নামল বিছানার ওপর। নাকে বিকট দুর্গন্ধ ঝাপটা মারল পিনেটের। বিশাল মাকড়সাটা ভয় ধরানো খচমচ শব্দ তুলে লম্বা পা ফেলে উঠে এল পিনেটের মুখে, তার মুখ এবং চোখ ঢেকে দিল চটচটে আঠাল শরীর দিয়ে। মুখ হাঁ করে একের পর এক চিৎকার দিতে শুরু করলেন মশিউ পিনেট।

'অদ্ভুত একটা কেস,' মশিউ পিনেটের ঘরের বেসিনে হাত ধোয়ার সময় বললেন ডাক্তার। 'ওনার হার্টের অবস্থা ভালই ছিল, তবে আকস্মিক কোন শকে মারা গেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটা ইনকুয়ারী দরকার।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

হোটেলঅলার বউ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভীরু পায়ে নেমে গেল নীচে। নীচের বারে দাঁড়িয়ে হোটেলঅলা মুচকি মুচকি হাসছিল। সে টাকার মোটা একটা বান্ডিল ঢোকাল কাউন্টারের নীচে।

ওপরের ঘরে ছোট বাদামী রঙের একটা মাকড়সা, এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ হবে লম্বায়, মৃত লোকটির কপালের ওপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডাক্তার এক ঝটকায় লাশের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন ওটাকে।

---

## অশুভ যাত্রা

ডাইভারের ভঙ্গিতে শরীর টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড ক্লেটন। রূপোলি স্পেসশিপ 'ফিউচার' নিয়ে মহাশূন্যের অনন্ত যাত্রার উদ্দেশে ডাইভ দিতে যাচ্ছে সে। গভীর দম নিল রিচার্ড ক্লেটন, হাত বাড়াল সামনে। চোখ বুজে স্পর্শ করল ঠাণ্ডা ইস্পাতের লিভার। ইস্পাতের শীতল ছোঁয়ায় সামান্য কেঁপে উঠল শরীর। তারপর লিভারটা ধরে টান মারল নীচের দিকে।

এক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না।

তারপরই হঠাৎ প্রবল একটা ঝাঁকুনি ওকে ছুঁড়ে ফেলল স্পেসশিপের মেঝেয়। নড়ে উঠেছে ফিউচার! সেই সাথে অদ্ভুত একটা শব্দে ভরে গেল ভেতরটা। যেন পাখি দ্রুত ডানা ঝাপটাচ্ছে কিংবা দেয়ালি পোকা একটানা গুঞ্জন তুলছে। শব্দটা একটানা বেজেই চলল। সেই সাথে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে কাঁপতে থাকল ফিউচার। পাগলের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে। ইস্পাতের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফিরছে গুঞ্জনটা। শব্দটা ক্রমে উঁচু হয়ে উঠল। হতবুদ্ধি হয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকল রিচার্ড ক্লেটন। তারপর কোনমতে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ফুলে ওঠা কপালে হাত বোলাতে বোলাতে ধপ্ করে বসল খুদে বাঙ্কে।

স্পেসশিপটা নড়ছে এখনও। ভয়ঙ্কর কাঁপুনিটা কমেনি একটুও। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাতেই দুঃখ, বিস্ময় এবং

হতাশায় চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। ঈশ্বর! প্যানেলটা গেছে। অস্ফুটে বলল ক্লেটন। প্রচণ্ড ধাক্কায় কন্ট্রোল প্যানেলটার কোনও অস্তিত্বই নেই। ভেঙেচুরে শেষ। ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে মেঝেতে। ডায়ালগুলো প্যানেলের নগ্নমুখে এদিক-ওদিক ঝুলছে।

ক্লেটন হতাশ হয়ে বসে রইল ওখানেই। এরচে' করুণ অবস্থা আর কী হতে পারে? তার ত্রিশ বছরের স্বপ্ন এভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তারই সামনে। দশ বছর বয়স থেকেই সে স্বপ্ন দেখে এসেছে একটা স্পেসশিপ তৈরি করবে, উড়ে যাবে অনন্ত অম্বরে। সেভাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছিল ক্লেটন। কোটিপতি বাপের একটা পয়সাও এদিক-সেদিক করেনি। স্পেসশিপ তৈরি করার স্বপ্ন সফল করার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করেছে, রাশানদের সাথে বন্ধুর মত মিশেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে ওদের রকেটগুলো। প্রতিষ্ঠা করেছে ক্লেটন ফাউন্ডেশন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভাড়া করে এনেছে মেকানিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী এবং শ্রমিক। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবশেষে তৈরি হয়েছে তার স্বপ্নযান 'ফিউচার'। ছোট্ট, জানালাবিহীন ফিউচারে ভ্রমণের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই ছিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই যানে ছিল অক্সিজেন ট্যাংক, প্রচুর ফুড ক্যাপসুল এবং স্বচ্ছন্দে হাঁটাহাঁটি করার মত ছ'কদম জায়গাও। আর এই ছোট কেবিনটিই হয়ে উঠেছিল তার সকল স্বপ্নসাধ মেটানোর একমাত্র অবলম্বন। ক্লেটন চেয়েছিল ফিউচারে করেই সে স্বপ্নভূমি মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাবে। সে-ই হবে মঙ্গলগ্রহে পদার্পণকারী প্রথম মানুষ। হিসেব করেও দেখেছে মঙ্গলে যেতে আসতে তার বিশ বছর সময় লাগবে। ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ছুটবে ওর ফিউচার। সেভাবেই সব ঠিকঠাক করা হয়েছিল। পুরো প্যানেল সিস্টেমটাই করা হয়েছিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলার জন্য। কিন্তু শুরুতেই এ কী বিপত্তি!

'এখন আমি কী করব?' ক্লেটন ভাঙা কাঁচগুলোর দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বাইরের পৃথিবীর সাথে তার সকল সম্পর্ক এখন বিচ্ছিন্ন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভাঙা বোর্ডে সে না দেখতে পারবে সময় না দূরত্ব, না বুঝতে পারবে গতি। এই ছোট্ট, বদ্ধ কেবিন ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই। এখানেই হয়তো ওকে বছরের পর বছর বসে থাকতে হবে। একা। নিঃসঙ্গ। নিজেকে সে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখবে তারও উপায় নেই। পড়ার মত বইপত্র কিংবা খবরের কাগজ নেই, নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম। মহাশূন্যের বিশাল গহ্বরে এক কয়েদী যেন সে এখন।

পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে রিচার্ড ক্লেটন। পৃথিবীটাকে এখন সবুজ আগুনের একটা গোলার মত লাগছে। দ্রুত তাকে পেছনে ফেলে সামনে এগোচ্ছে ফিউচার। এগিয়ে যাচ্ছে আরেক আগুনের গোলার দিকে–মঙ্গল যার নাম।

ক্লেটন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখল মহাশূন্যে ওর উত্থানপর্বের দৃশ্যটি। দেখল কমলা রঙের আগুন জ্বেলে ফিউচার ঘন সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বুলেটের গতিতে শূন্যে চলেছে। অসংখ্য লোক হাঁ করে দেখছে তার মহাশূন্য যাত্রা। মৌমাছির ঝাঁকের মত ভিড় সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওর সহকারী জেরী চেজ। সবাই অবাক হয়ে দেখছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেছে ফিউচার। লোকজন এখন নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘরে ফিরছে। কিন্তু কিছুদিন পর ওর কথা তাদের আর মনেও থাকবে না। অথচ তাকে, রিচার্ড ক্লেটনকে, এই উড়োজাহাজেই থাকতে হবে বিশটা বছর।

হ্যাঁ, থাকতে হবে। কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু এই কাঁপুনি থামবে কখন? ভাবছে ক্লেটন। কাঁপুনি ইতোমধ্যেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। ফিউচার যখন তৈরি করা হয় তখন এরকম কোনও ভাইব্রেশনের কথা তার কিংবা বিশেষজ্ঞদের কারও মাথাতেই

আসেনি। তা হলে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হত। কিন্তু এই কাঁপুনি যদি আর না থামে? যদি কুড়িটা বছর ধরেই ফিউচার এভাবে কাঁপতে থাকে? ভাবতেই আতঙ্কে হিম হয়ে যায় ক্লেটন।

বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছে রিচার্ড ক্লেটন। শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা বিশদভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠল সে। ভেবেছিল এভাবে অন্তত কিছুটা সময় পার করা যাবে। এই দীর্ঘ সময় কাটাবে কীভাবে ভাবতেই শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

'আমি অন্তত ব্যায়ামও তো করতে পারি' চিৎকার করে বলল ক্লেটন। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। ছ'কদম সামনে, ছ'কদম পেছনে। কিন্তু শিগ্‌গিরই একঘেয়ে হয়ে উঠল এ হাঁটাহাঁটি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। এগোল ফুড-স্টোর কেবিনেটের দিকে। একটা ফুড ক্যাপসুল বের করে মুখে দিয়ে গিলে ফেলল–সংক্ষিপ্ত খাবার। 'এমনকী খাওয়ার জন্যেও আমাকে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে না। স্রেফ মুখে দিয়ে গিলে ফেললেই হলো।' শঙ্কিত মনে ভাবল সে। ওর মুখ থেকে কখন উবে গেছে হাসি। ফিউচারের কাঁপুনি ওকে যেন পাগল করে ছাড়বে। অস্থির হয়ে সে শুয়ে পড়ল বাঙ্কে, ঘুমাবার চেষ্টা করল। ঘুম এলে হয়তো এই বিশ্রী, একঘেয়ে গুঞ্জন ও কাঁপুনির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। বাতি নিভিয়ে দিল ক্লেটন। চোখ বুজে নিজের বন্দীদশার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই ক্লেটনের মনে প্রশ্ন জাগল, এখন দিন না রাত। কিন্তু স্পেসশিপের মধ্যে দিনরাত্রির তফাত বোঝার উপায় নেই। এখানে দিনও নেই, রাতও নেই। আছে শুধু স্নায়ুকে যন্ত্রণা দেয়া একঘেয়ে শব্দটা। মস্তিষ্ক কুঁড়ে কুঁড়ে

খাওয়া দুঃসহ শব্দটা। বাঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ক্লেটন দেখল ওর পা কাঁপছে। টলতে টলতে এগুলো সে কেবিনেটের দিকে। ফুড ক্যাপসুল গিলল কয়েকটা।

আবার বাঙ্কে এসে বসল ক্লেটন। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছে। পরিচিত অপরিচিত সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন সে এখন। অথচ এখানে করার মত কিছুই নেই। জেলখানার নিঃসঙ্গ কয়েদীদের চেয়েও খারাপ অবস্থা তার। ওরা বরং ওর এই সেলের চেয়ে বড় জায়গায় থাকে, সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারে; প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে তাজা বাতাসে। আর দু'একজন হলেও মানুষের দেখাও পায় তারা। কিন্তু তার অবস্থা! সম্পূর্ণ বিশ্ব সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এক গুহাবাসী যেন সে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা পেয়ে বসছে ওকে। জীবন্ত কাউকে, কোনও একটা কিছু দেখার তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করছে সে নিজের অন্তরে। সামান্য একটা জ্যান্ত পোকার দেখা পেলেও জীবনের সমস্ত সম্পদ তাকে দিতে পারে এখন ক্লেটন। শুধু একটু প্রাণের স্পন্দন দেখতে চায় ও।

এই লাগাতার একঘেয়ে শব্দ ও অসহ্য ঝাঁকুনি সয়ে যাওয়া, মেঝেতে গুনে গুনে পা ফেলা, ক্যাপসুল খাওয়া আর ঘুমানো ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু করার নেই ক্লেটনের। ভাবনাগুলোও যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একসময় হঠাৎ হাতের নখ কাটার প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসল তাকে। প্রচুর সময় ব্যয় করে কাজটা সারল সে। কিন্তু নখ কেটে কি সময় পার করা যায়? আর কোনও কাজ না পেয়ে সে এবার তীক্ষ্ণ চোখে নিজের জামাকাপড়গুলো পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোট্ট আয়নাতে নিজের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা দেখে গেল সে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কেবিনের প্রতিটি জিনিস দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু তারপরও ঘুম আসার মত ক্লান্তি অনুভব করল না।

মাথাটা দপদপ করতে লাগল ক্লেটনের। চিনচিনে একটা ব্যথা। মনে হচ্ছে এই জীবনে ব্যথাটা থেকে রেহাই মিলবে না। ঘুম আসছে না, তবুও বাঙ্কে গিয়ে শুলো সে। শুয়ে জোর করে চোখ বুজল। আস্তে আস্তে তন্দ্রার মত এল। কিন্তু ফিউচারের ঝাঁকুনিতে বারবার কেঁপে উঠল শরীর, তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল বারবার, একসময় পুরোপুরি জেগে গেল সে। বাঙ্ক ছেড়ে উঠে আলো জ্বালল ক্লেটন। এবং আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

'সময় হচ্ছে আপেক্ষিক' বন্ধুরা সবসময় বলত ক্লেটনকে। এখন সে হাড়ে হাড়ে কথাটার সত্যতা টের পাচ্ছে। সময় জানবে, এমন কোনও কিছুই নেই ওর কাছে। না আছে ঘড়ি, না অন্যকিছু। এমনকী চাঁদ কিংবা সূর্যের চেহারা দেখারও কোনও উপায় নেই। কতসময় ধরে এই স্পেসশিপে আছে সে? প্রাণপণে চেষ্টা করল ক্লেটন মনে করতে। কিন্তু পারল না।

আচ্ছা সে কি প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর খাবার খেয়েছে নাকি দশ ঘণ্টা অন্তর? অথবা বিশ ঘণ্টা পরপর? প্রতিদিন কি সে একবার করে ঘুমিয়েছে নাকি তিন অথবা চারদিনে মাত্র একবার ঘুমিয়েছে? সে ক'বার হাঁটাহাঁটি করেছে মেঝেতে?

ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। সে যদি সত্যি সত্যি সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলে তা হলে তো মহাসর্বনাশ হবে। এই মহাশূন্যে, স্পেসশিপে যেখানে অজানার উদ্দেশে উড়ে চলেছে, সেখানে তো সে অচিরেই পাগল হয়ে উঠবে। একা, এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাকে কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই হবে আবার ভাবনটা ফিরে এল ওর মধ্যে।

এখন সময় কত?

কিন্তু এই পাগল করা চিন্তা নিয়ে আর ভাবতে চায় না ক্লেটন। সে এখন অন্যকিছু ভাবতে চায়। অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত

থাকতে চায়। যে পৃথিবী ছেড়ে ও চলে এসেছে সেই দুনিয়া এখন সে ভুলে থাকতে চায়। নয়তো পেছনের স্মৃতি ওকে আরও চরমে পৌঁছে দেব।

'আমি ভয় পাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল ক্লেটন। 'মহাশূন্যের এই অন্ধকারে একা থাকতে ভয় লাগছে আমার। হয়তো আমি এতক্ষণে চাঁদকে পেছনে ফেলে এসেছি। হয়তো পৃথিবী থেকে এখন দশ লক্ষ মাইল দূরে চলে এসেছি।'

ক্লেটন হঠাৎ বুঝতে পারল, নিজের সাথে একা একা কথা বলে চলেছে সে। পাগলামির লক্ষণ! তবুও কথা বলে যাবে সে। থামবে না। এভাবে কথা বলে অন্তত ওর চারপাশ ঘিরে থাকা ভয়ঙ্কর গুঞ্জনের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

'আমি ভয় পাচ্ছি' ক্লেটনের ফিসফিসানি ছোট্ট ঘরটিতে যেন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আচ্ছা, এখন কটা বাজে? একনাগাড়ে এভাবে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ক্লেটন। চোখ বুজে এল। আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলে নিজেকে বেশ তাজা মনে হলো তার। 'আমি আসলে হঠাৎ বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম,' আপন মনে বলল সে। আসলে স্পেসশিপের ক্রমাগত, একঘেয়ে শব্দটা ওর স্নায়ুগুলোকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে। ভেতরের অক্সিজেনের চাপে ওর মাথা ঝিমঝিম করছে, হতবুদ্ধি মনে হয়েছে নিজেকে। হয়তো ক্যাপসুলগুলো প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে শরীর আর দুর্বল ঠেকছে না তার। হাসি ফুটল ক্লেটনের মুখে। পায়চারী শুরু করল মেঝের ওপর। আর পায়চারী করতে করতে সেই ভাবনাটা আবার পেয়ে বসল তাকে। আজ কী বার? যাত্রা শুরুর পর ক'সপ্তাহ কেটেছে? হতে পারে এক মাস চলে গেছে; কিংবা একবছর অথবা দু'বছর? পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিশ্চয়ই এসে পড়েছে সে? কেমন জানি স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে সবকিছু। ক্লেটনের মনে হলো ওর ফিউচার এখন মঙ্গলগ্রহের

কাছাকাছি চলে এসেছে। পেছনের কথা বাদ দিয়ে সামনে কী ঘটতে পারে তাই নিয়ে ভাবতে লাগল ক্লেটন।

সময় যাবার সাথে সাথে সবকিছুর একটা রুটিনও স্থির হয়ে গেল। অভ্যাসমত পায়চারী করছে ক্লেটন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্যাপসুল খেয়ে শুয়ে পড়ছে। এক সময় ঘুমিয়েও পড়ছে, ঘুম থেকে জেগে আবার পায়চারী করছে।

রিচার্ড ক্লেটন ধীরে ধীরে পরিবেশ এবং নিজের শরীর সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেতে লাগল। মাথার ভেতর একঘেয়ে শব্দটা যেন ওর শরীরেরই একটা অংশ হয়ে উঠল। আর এই শব্দটাই যেন ওকে জানান দিয়ে চলল সে একটা স্পেসশিপে ছুটে চলেছে-মহাশূন্যের পথ ধরে। ক্লেটন এখন আর নিজের সাথে একা একা কথাও বলে না। নিজেকে সে যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। ওর চোখে এখন একটাই স্বপ্ন—মঙ্গলগ্রহ। স্পেসশিপটা যেন তার প্রতিটি ঝাঁকুনির সাথে একভাবে বলে চলেছে *মঙ্গল—মঙ্গল—মঙ্গল*।

হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। রিচার্ড ক্লেটন বুঝতে পারল সে ল্যান্ড করতে চলেছে। ফিউচারের নাক নিচু হয়ে গেল, নীচের দিকে কাঁপতে কাঁপতে নামতে লাগল স্পেসশিপ। লালরঙের গ্রহটার সবুজ তৃণভূমির দিকে তার যন্ত্রযান এগিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। ক্লেটন টের পাচ্ছে তার যানের গতি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে নামছে।

অবতরণ করল ফিউচার। স্পেসশিপের দরজা খুলে ক্লেটন বেরিয়ে এল বাইরে, বেগুনি লাল রঙের ঘাসে আলতো করে পা ফেলল। শরীর বেশ ঝরঝরে আর হালকা লাগল। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া সূর্যালোক পৃথিবীর চেয়ে প্রখর ও উজ্জ্বল লাগল।

কিছু দূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনভূমি। বড় বড়

গাছে ঝুলে আছে লাল রঙের রসালো ফল। ক্লেটন জাহাজ ছেড়ে এগোল জঙ্গলের দিকে। কী চমৎকার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ওর খুব ভাল লাগল। ওকে দেখেই যেন সারির প্রথম গাছটি মাটির দিকে ঝুঁকে থাকা 'হাত' দু'টো তুলে সম্ভাষণ জানাল।

হাত–এখানে গাছেরও হাত আছে! দু'টো সবুজ হাত এগিয়ে এল ক্লেটনের দিকে। সাপের মত লম্বা আর মসৃণ হাত দু'টো দিয়ে গাছটা ওকে আঁকড়ে ধরল, তুলে ফেলল শূন্যে। শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছে হাতদু'টো। গুঁড়ির সাথে গাছটা চেপে ধরল তাকে। অসম্ভব বিস্ময়ে ক্লেটন দেখল দূর থেকে যেগুলোকে লালরঙের ফল মনে করেছিল সেগুলো আসলে ওদের মাথা। এবং রংটাও পুরোপুরি লাল নয়। বেগুনি ভাব আছে একটা।

বেগুনি লাল রঙের ভয়ঙ্কর মাথাগুলো মরা ছত্রাকের মত চোখ তুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে ক্লেটনের দিকে। প্রতিটি মুখে বাঁধাকপির মত ভাঁজ। থকথকে, নরম মাংসপিণ্ডের মত লাগছে দেখতে। বিশাল হাঁ করে আছে সব ক'টা। ক্ষুধার্ত ভঙ্গি। যেন ওকে চিবিয়ে খাবে। হঠাৎ সবুজ হাতগুলো ওকে জ্যান্ত, ঠাণ্ডা গুঁড়ির সাথে আরও শক্ত করে চেপে ধরল, ক্লেটন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল বেগুনি লাল রঙের একটা মুখ–মুখটা দেখতে অনেকটা মেয়েদের মত–নড়ে উঠেছে। মুখটা বাড়িয়ে দিচ্ছে চুম্বনের ভঙ্গিতে, যেন আগ্রাসী চুমু খাবে।

ভ্যাম্পায়ারের চুম্বন! রক্তাক্ত, ফাঁক করা ঠোঁট দু'টো দেখে ক্লেটনের তাই মনে হলো। মুখটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ক্লেটন পাগলের মত ধস্তাধস্তি শুরু করল। কিন্তু হাতগুলো ওকে চেপে ধরে রইল। নেমে এল মুখটা ওর মুখের ওপর। চুম্বন করল। প্রচণ্ড ছ্যাঁকা খেল ক্লেটন। মনে হলো কেউ বরফ ঠেসে ধরেছে মুখে। হিমশীতল স্পর্শে হঠাৎ ক্লেটনের দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল।

এ অবস্থা থেকে একসময় জেগে উঠল রিচার্ড ক্লেটন। জেগে

উঠেই বুঝতে পারল আসলে স্বপ্ন দেখছিল সে এতক্ষণ। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। মুখটা দেখার জন্য বাঙ্ক ছাড়ল। এগিয়ে গেল আয়নার দিকে। তাকাল। ভয়ানক চমকে উঠল। একী দেখছে সে? কাকে দেখছে? নাকি এখনও স্বপ্নই দেখছে!

বৃদ্ধ একটা লোক তাকিয়ে আছে আয়নায়। সারামুখে বলিরেখা, দাড়ির জঙ্গলে প্রায় ঢেকে আছে। ফুলোফুলো গাল ভেতরের দিকে ডেবে গেছে। চোখ দু'টোর অবস্থা সবচে' ভয়াবহ। চোখ দেখে ক্লেটনের বিশ্বাসই হতে চাইছে না ও দু'টো তাঁর নিজের চোখ! কোটরের মধ্য থেকে লাল টকটকে দু'টো চোখ অসম্ভব ভয় পাওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। হাত দিয়ে মুখটা স্পর্শ করল সে, আয়নার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেল হাতে নীল নীল শিরা জেগে উঠেছে। মাথার চুল ধূসর। ক্লান্তভাবে সে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল।

রিচার্ড ক্লেটন বুড়ো হয়ে গেছে!

কতদিন! কে জানে কত বছর ধরে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সে। নিশ্চয়ই অনেক বছর হবে। নইলে শরীরের এত পরিবর্তন হয় কীভাবে? বর্তমানের এই অস্বাভাবিক জীবনই ওর বয়স বাড়িয়ে দিচ্ছে দ্রুত। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দারুণ ব্যাকুলতা অনুভব করল ক্লেটন। আরও ভয়াবহ কোনও স্বপ্ন দেখার আগেই তাকে এই অশুভ যাত্রা শেষ করতে হবে। সময়ের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক শক্তি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। টলতে টলতে বাঙ্কে ফিরে এল ক্লেটন। ভীষণভাবে কাঁপছে। নক্ষত্রলোকের অন্ধকার ভেদ করে ফিউচার তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলল।

হঠাৎ ক্লেটনের মনে হলো বিশাল হাতুড়ি দিয়ে কারা যেন দমাদম দরজায় আঘাত করছে। প্রচণ্ড শক্তিতে বাড়ি মেরেই

চলেছে। হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়ল দরজাটা। ভীষণ চেহারার কয়েকটা মূর্তি ঢুকল ভেতরে। ধাতব মূর্তি। ওরা এসেই দু'দিক থেকে ক্লেটনকে বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। লোহার মেঝের ওপর দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে দানবগুলো। ওদের ধাতব পায়ের আওয়াজ উঠছে লোহার মেঝেয়। ইস্পাতের তৈরি বিশাল এক যানের সামনে দানবগুলো নিয়ে এল ওকে। যানটা দেখতে মিনারের মত। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে ওপরে। ওরা ক্লেটনকে নিয়ে সেই ধাতব সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কিন্তু এ ওঠার যেন কোন শেষ নেই। উঠছে তো উঠছেই। সেই সাথে ধাতব পায়ের একটানা আওয়াজ উঠছে–ঢং, ঢং, ঢং। ধাতব মুখ কখনও ঘামে না। ধাতব মানুষ কখনও ক্লান্ত হয় না কিন্তু ক্লেটন তো ধাতব নয়, রক্তমাংসের মানুষ। প্রচণ্ড হাঁফিয়ে গেছে সে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। তবু তাকে টেনে নিয়ে চলল দানবগুলো। দীর্ঘসময় পরে অবশেষে শেষ হলো উত্থানপর্ব। চুড়োয় উঠে টাওয়ার রুমের ভেতরে ওরা ছুড়ে ফেলল তাকে। তারপর তাদের ধাতব কণ্ঠ খনখন করে উঠল, গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের মত।

*'হে–প্রভু–তাকে–আমরা–একটা–পাখির–মধ্যে–পেয়েছি।'*

*'তার–শরীর–নরম–বস্তু–দিয়ে–তৈরি।'*

*'সে কোনও–আশ্চর্য–উপায়ে–বেঁচে–আছে।*

*'সে–একটা–প্রাণী।'*

তারপর একটা গুমগুম শব্দ উঠে এল টাওয়ার রুমের মাঝখান থেকে।

*'আমি ক্ষুধার্ত।'*

মেঝে থেকে অকস্মাৎ উদয় হলো একটা লোহার সিংহাসন। এ হলো ধাতব দানবদের প্রভু। জিনিসটা বিরাট আকৃতির

লোহার একটা চোরাগর্ত। গর্তের চারদিকে ঘিরে আছে বেলচা আকৃতির ভয়ঙ্কর দু'টো চোয়াল। চোয়াল দু'টো ক্লিক করে ফাঁক হয়ে গেল, ঝকমক করে উঠল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। গর্তের গভীর থেকে গমগমে কণ্ঠটা ভেসে এল, *'আমাকে খেতে দাও।'*

ধাতব দানবরা ক্লেটনকে ধরে ছুঁড়ে মারল সেই হাঁ করা বিশাল গর্তের মধ্যে। বিশাল চোয়াল দু'টো তৎক্ষণাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলো বসে গেল মাংসল দেহে...

প্রচণ্ড চিৎকার করে জেগে উঠল ক্লেটন। কাঁপা হাতে আলো জ্বালল, তাকাল আয়নায়। ওর বেশিরভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে। আগের চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। ক্লেটন অবাক হয়ে ভাবল এভাবে একটার পর একটা দুঃস্বপ্নের ধাক্কা ওর মস্তিষ্ক আর কত সইতে পারবে।

ফুড ক্যাপসুল খাওয়া, কেবিনে হাঁটাহাঁটি, একঘেয়ে শব্দটা শোনা, আর বাঙ্কে শুয়ে পড়া–ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু নেই রিচার্ড ক্লেটনের জীবনে, আর শুধু বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গোনা। এভাবে কতযুগ অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে জানে না সে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে–দিনের হিসেব রাখে না ক্লেটন। আর ঘোরের মধ্যে একটার পর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে যেতে লাগল। প্রতিটি দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠে আতঙ্কিত চোখে সে লক্ষ করে বয়স আরও বেড়ে গেছে তার। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে দ্রুত। কখনও কখনও সে ভীত হয়ে ভাবে যাত্রা শুরুর আগে যে হিসেব নিকেশ সে করেছিল তাতে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোনও ভুল থেকে গিয়েছিল। হয়তো সে সৌরমণ্ডলের চারদিকেই ক্রমাগত ধীর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে জীবনেও মঙ্গলে পৌঁছুতে পারবে না। পরক্ষণে মনে অশুভ

চিন্তাটা খেলে যায়—যদি এমন হয়, সে মঙ্গলও পার হয়ে এসেছে, সৌরজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন মহাশূন্যের অনির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে বেড়াচ্ছে!

চিন্তা করতে করতে মাথা গুলিয়ে আসে ক্লেটনের। আর ভাবতে পারে না সে, ক্যাপসুল খেয়ে শুয়ে পড়ে বাঙ্কে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথা মনে পড়ে তার, শঙ্কিত হয়ে পড়ে। পৃথিবী কি এখনও বেঁচে আছে? অস্তিত্ব লোপ পায়নি তো তার? এমনও হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধে পুরো পৃথিবী এক বিরাট ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। অথবা বিরাট কোনও উল্কার আঘাতে শেষ হয়ে গেছে সাধের ধরিত্রী। কিংবা এমনও ঘটা বিচিত্র নয় নক্ষত্রলোক থেকে ছুটে আসা মৃত্যুরশ্মির আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে দুনিয়া। ভয়াবহ সব আশঙ্কা ঘিরে রাখে ক্লেটনকে। কখনও ভাবে গ্রহান্তরের প্রাণীরা পৃথিবী দখল করে নেয়নি তো? কিন্তু এসব তার ক্ষণিকের ভাবনা। সবসময় তার মন জুড়ে থাকে কীভাবে, কবে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুবে। স্বপ্নের মঙ্গলকে না দেখে মরেও তো শান্তি পাবে না সে। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

এমনি করে কেটে যেতে লাগল সময়। ক্লেটনের প্রায়ই মনে হত স্পেসশিপের বাইরে থেকে কারও যেন কণ্ঠ ভেসে আসছে। মহাশূন্যের বিকট অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে ভৌতিক আর্তনাদ। দুঃস্বপ্নেরা ফিরে ফিরে এল তার কাছে। এরমধ্যে কতদিন, কতঘণ্টা পেরিয়ে গেছে জানে না ক্লেটন। কিন্তু যখনি আয়নার দিকে তাকায়, ক্লেটন দেখতে পায় তার বয়স আরও দ্রুত বেড়ে চলছে। চুল বরফের মত সাদা, মুখ ভরে গেছে বলিরেখায়। সুস্থভাবে কিছু চিন্তা করারও শক্তি পাচ্ছে না সে। স্পেসশিপের একঘেয়ে, যন্ত্রণাদায়ক কাঁপুনি ও শব্দের মধ্যে মড়ার মত পড়ে আছে সে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে।

ঘটনাটা যে কী ঘটল প্রথমে ভাল করে বুঝতে পারেনি ক্লেটন।

চোখ বুজে নিশ্চল শুয়েছিল সে। হঠাৎ অনুভব করল অবিশ্রাম কাঁপুনিটা আর নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ক্লেটন ভাবল, এবারও সে নির্ঘাত স্বপ্নই দেখছে। চোখ ঘষতে ঘষতে কোনমতে বিছানায় উঠে বসল ক্লেটন। ভাল করে তাকিয়ে বুঝল—না, ফিউচার নড়ছে না। নিশ্চয়ই সে ল্যান্ড করেছে।

ফিউচারের কম্পন থেমে গেলেও ক্লেটনের শরীরের কাঁপুনি থামেনি। বছরের পর বছর একাধারে কম্পনের ফল এটা। উঠে দাঁড়াতে ভয়ানক কষ্ট হলো ক্লেটনের। কিন্তু এখন যে তাকে উঠতেই হবে। সময় এসেছে। এ মুহূর্তটির জন্য সে এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছে। তার স্বপ্ন এখন সফল হয়েছে। তার ফিউচার ল্যান্ড করেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল ক্লেটন। দরজার হাতলটা প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ওপরের দিকে তুলল। খুলে গেছে দরজা। ঝকঝকে সূর্যের আলো এসে চোখে বাড়ি মারল। শরীর ছুঁয়ে গেল বাতাস। আলোতে চোখ যেন ঝলসে গেল ক্লেটনের। বুক ভরে শ্বাস টানল—পা বাড়াল বাইরে—

ক্লেটন সোজা গিয়ে বাধা পড়ল তার সহকারী জেরী চেজের আলিঙ্গনের মধ্যে। চেজ বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্লেটনের অসম্ভব রোগা, নিস্তেজ চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কে? মি. ক্লেটন কোথায়?' তারপর ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। 'আ...হায়...মি. ক্লেটন...। কিন্তু আপনার একী দশা, সার? আপনি যখন যাত্রা শুরু করলেন তখনই বিস্ফোরণটা ঘটল। স্পেসশিপ এই জায়গা ছেড়ে নড়তেই পারেনি। কিন্তু ভয়ানক কাঁপছিল বলে আপনাকে উদ্ধার করতে যেতে পারছিলাম না আমরা। এই একটু আগে কাঁপুনি থেমেছে। কিন্তু আপনার কী হয়েছে, সার? এমন লাগছে কেন আপনাকে?'

ফ্যাকাসে নীল চোখ জোড়া খুলে গেল ক্লেটনের। কথা বলার

সময় ঝাঁকি খেল শরীর, ফিসফিসিয়ে অস্ফুটে বলল, 'আ-আমি সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলাম, কত-কতদিন আমি ফিউচারে ছিলাম?'

বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে জেরী চেজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। আস্তে করে বলল, 'মাত্র এক সপ্তাহ; সার।'

আস্তে চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে এল, সামান্য কেঁপে স্থির হয়ে গেল দেহটা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে রিচার্ড ক্লেটন তার অশুভ যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়ে।

---

## শূন্য

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে একঠায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ক্রামার, কিছু শোনার চেষ্টা করল, তার পেছনের রাস্তাটা খালি এবং নির্জন, মিশে গেছে দিগন্তরেখার সাথে। যেন কার্ডবোর্ডের ওপর চকখড়ির একটা হালকা দাগ। মাথার ওপরে শুকনো, স্থির বাতাসে নিঃসঙ্গ একটা কিলোটা চক্কর দিচ্ছে, খুঁজছে শিকার। নেই, ওকে কেউ অনুসরণ করার কোনও চিহ্ন নেই।

ক্রামার ওর জিনিসপত্রগুলো আবার চেক করল: ক্যান্টিন, খাবারের ট্যাবলেট, স্যান্ড মাস্ক, আর সবচে' মূল্যবান বস্তুটি–ম্যাপ। ছোট অয়েলস্কিন থলের মধ্যে রাখা প্রাচীন ম্যাপটার দিকে চোখ বুলাতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সে।

সোমবার। সকাল ১১:১৪। ঘড়ি দেখল ক্রামার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ঠিক এগারো দিনের দিন সে 'ক্যানাল টোয়েন্টি এইট নর্থ ওয়েস্ট'-এ পৌঁছুবে। তারপর আর অসুবিধে নেই। জাল পাসপোর্ট দেখিয়ে সহজেই ক্রেটার সিটি পোর্টে ঢুকে যাবে ক্রামার। প্রতিদিন দুপুরের নিয়মিত 'আর্থ এক্সপ্রেস'-এ চড়ে সে পগার পার হবে। ব্লানচার্ডের বাপেরও সাধ্য নেই বুঝতে পারে ওই পথে সে পালিয়েছে। মাসখানেক আগে যখন প্ল্যানটা করল ক্রামার তখনই প্রতিটি ডিটেইল সে পরীক্ষা করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়েছে সমস্ত কাজ।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ক্রামার, আনমনে গুণছে:

ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন। লেভেল ওয়ান। কালের আঁচড়ে মলিন, অস্পষ্ট সাইনবোর্ডটা হঠাৎ চোখে পড়ল:

**এই খালে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ**

**আদেশক্রমে**

**জারা**

নামটা পড়ে অবাক হলো ক্রামার। জারা, ইতিহাস বইতেই শুধু এই নামটা দেখেছে সে। জারা, মার্শিয়ান রাজত্বের শেষ সম্রাট, বিস্মৃত হয়েছে কবে। ক্রামার মনে করার চেষ্টা করল তৃতীয় নাকি চতুর্থ সম্রাটের সময় এই খালগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

একশো আটাশ, একশো উনত্রিশ। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লেভেল। আরেলিয়াম স্টীলের তৈরি প্রকাণ্ড এক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রামার। টর্চের আলোতে দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটা যেন ভেঙচি কাটল ওকে:

**এই খালে প্রবেশ সম্পূর্ণ...**

পকেট থেকে একটা চাবি বের করল ক্রামার। খুব সাবধানে রাজকীয় সীলটা তুলল, চাবি তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিল। আস্তে খুলে গেল দরজা।

ভেতরে ঢুকল ক্রামার। সতর্কতার সাথে সীলটাকে আবার আগের জায়গায় লাগাল। ওর অনুপ্রবেশের কোনও চিহ্নই আর থাকল না। নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল ক্রামারের মুখ।

ক্যানাল গ্র্যান্ড-উত্তর আর দক্ষিণ মঙ্গলগ্রহের মধ্যে যোগসূত্রতার প্রধান ধমনী। ক্যানাল গ্র্যান্ড মিশেছে শূন্যে, ওর পলায়নের উৎকৃষ্ট পথ। ক্রামার জানে পৃথিবীর কোনও মানুষ কিংবা মার্শিয়ান কখনও শূন্যে অভিযানে বেরোয়নি, ওখানে গেলেও কেউ ফিরে আসেনি কোনওদিন। শূন্য যেন এক বিশাল দানব। গ্রাস করে সবাইকে। আজও শূন্যকে নিয়ে বহু গল্পকথা প্রচলিত, বেশিরভাগই হয়তো কুসংস্কার থেকে উদ্ভূত, কিন্তু এটা

ঠিক শূন্যে এ পর্যন্ত যে-সব অভিযান চালানো হয়েছে, পাঠানো হয়েছে রকেট শিপ, প্লেন ইত্যাদি–কোনটারই আর সন্ধান মেলেনি। শূন্য, একা এবং বিশাল, লাল রঙের গ্রহটাকে দুই ভাগে ভাগ করে অবিচল দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রুত সামনে পা বাড়াল ক্রামার। ওর পরনে গরম, আরামদায়ক স্পেসসুট, মাথায় হেক্সটার হেলমেট। হাঁটতে হাঁটতে খালের মাঝখানে চলে এল। মাটি এখানে শক্ত, ফুটপাথের মত সমতল। দু'পাশের দেয়ালগুলো উঁচু এবং অন্ধকার।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে ক্রামার। ভাবছে মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। মাসখানেক আগেও সে ফাগান্ডা-র মেট্রোপলিটান পাওয়ার ইউনিটের সাধারণ একজন রেশিও ক্লার্ক ছিল। ছকে বাঁধা জীবনটা ছিল একঘেয়ে। মাঝে মধ্যে দু'একটা চুরিচামারির ঘটনা খানিকটা উত্তেজনার খোরাক যোগাত। তারপর একদিন হঠাৎ করেই প্ল্যানটা মাথায় এল ওর।

প্ল্যানটা করেছিল সে শূন্যের গোপনীয়তা জানার জন্য, যে গোপনীয়তা সহস্র বছর ধরে মানব জাতিকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। ৩০৯১ সালে ইতিহাসবিদ স্টোলা লিখেছিলেন:

*আমি নিশ্চিত যে ভয়ঙ্কর কোনও বিপর্যয়ের কারণে খালগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে এবং পূর্ববর্তী মার্শিয়ান রাজবংশের যে পতন শুরু হয়েছিল তার পেছনে ওই করিডর যাকে আমরা শূন্য বলে জানি, তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।*

*আমরা নিশ্চিতভাবে এটাও জানি, ক্যানাল গ্র্যান্ড বহু আগেই ওই করিডরকে গ্রাস করে চলে গেছে, এবং বর্ণালিবীক্ষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় মহাখালটির কোথাও জমা আছে মহামূল্যবান রেটনাইট যার বৈজ্ঞানিক নাম কেমিক্যাল এক্স। কেমিক্যাল এক্স আজও মানব জাতির সর্বাধিক প্রত্যাশার বস্তু। আমার কোনই সন্দেহ নেই একদিন অবশ্যই এই মহামূল্যবান*

*বস্তুটি আবিষ্কার হবে এবং জানা যাবে শূন্যের সকল রহস্য।*

ক্রামার জানে ইন্টারপ্ল্যানাটেরী কাউন্সিলে নয়জন সদস্যের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে চোদ্দ কিলোগ্রাম রেটনাইট সংরক্ষিত আছে। রেটনাইট এক ধরনের ড্রাগ, মেন্টালস্টিমুল্যান্ট, ঠিকমত ডোজ নিলে মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি বাড়িয়ে দেয় হাজার গুণ। রেটনাইট-এর ডোজ যে নিতে পারে সে পরিণত হয় সুপার ইন্টেলেকচুয়ালে।

ক্রামার এই পরশমণির সন্ধানই চায়। চায় কারণ রেটনাইট তার জন্য সাফল্যের দ্বার খুলে দেবে। ওকে আর ছোটখাট চুরি বা ঠগবাজী করতে হবে না, পুলিশের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেও হবে না।

হেলমেটের চিবুকের দিকে একটা বোতামে চাপ দিল ক্রামার। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্শিয়ান চুরুট বেরিয়ে এল একটা র‍্যাক থেকে, টুপ করে ওর ঠোঁটের ওপর পড়ল। খুদে একটা তাপপ্রবাহ ওটাকে ছুঁয়ে গেল, জ্বলে উঠল চুরুট। ঘাড়ের পেছনের এগজস্ট বালব্ ফুলে উঠল ধোঁয়া বের করে দেয়ার জন্য। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে হেঁটে চলল ক্রামার।

প্ল্যানের সূচনাপর্ব ক্রামারের মাথায় এসেছিল অদ্ভুত উপায়ে। ফাগান্ডার ছোট এক কিউরিও শপে সে পুরানো একটা ফুলদানি কিনেছিল। ফুলদানিটার একপাশে ছিল কিছু বর্ণমালা, অন্যপাশে ছন্দহীন একটা কবিতা।

আশ্চর্য হয়ে ক্রামার আবিষ্কার করল বর্ণমালা আর কবিতা দুই মিলে ইঙ্গিত করছে 'ব্যুরো অভ স্ট্যান্ডার্ডস'-এর প্রাচীন এক পার্চমেন্টকে।

ক্রামার পরদিন রাতে লুকিয়ে থাকল গ্যালারিতে। একশো ছাব্বিশটা গ্লাসকেস থেকে বাছাই করে একটা বিশেষ বই চুরি করল সে ওটার মধ্যেই শূন্যের সকল রহস্য নিহিত, জানত ও।

কিন্তু বই চুরির ব্যাপারটা শিগগিরই জানাজানি হয়ে যাবে যদি হোম ভাল্লাকে চিরতরে সরিয়ে না দেয় সে। হোম ভাল্লা মার্শিয়ান ভাষাবিজ্ঞানী। বহুবছর গবেষণায় নিয়োজিত থাকার পর কিছুদিন আগে ঘোষণা দিয়েছে অচিরেই সে প্রাচীন মার্শিয়ানদের সকল পুস্তকের মর্মার্থ উদ্ধার করবে।

সুযোগের সন্ধানে থাকল ক্রামার। জানল হোম ভাল্লা ছুটি কাটাতে কিছুদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে যাবে। তারপর সে একদিন ভাল্লার বাড়িতে ঢুকে হিট গানের আঘাতে ভাল্লাকে মেরে লাশটাকে লুকিয়ে ফেলল নগরীর পরিত্যক্ত টিউবগুলোর একটাতে।

কিন্তু ব্ল্যানচার্ড? হ্যাঁ, ব্ল্যানচার্ড সম্ভবত তিনটে ঘটনার মধ্যে কোনও ক্লু খুঁজে পাবে: চুরি যাওয়া বই, হোম ভাল্লার মৃত্যু এবং ক্রামারের অন্তর্ধান। কিন্তু সব জানতে ওরও সময় লাগবে। ইতিমধ্যে ক্রামার আইনের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

হাঁটার সময় খালটাকে ভাল করে লক্ষ করল ক্রামার। ধারাল ব্লেডের মত সোজা চলে গেছে গ্র্যান্ড ক্যানাল সামনের দিকে। দেয়ালগুলো খাড়া, লাল পাথরের। করাতের মত কালো, খাঁজকাটা দাগ দেখল সে মাটিতে। শুকিয়ে যাওয়া পানির দাগ, জানে ক্রামার।

শূন্যের রহস্য জানার জন্য কত অভিযাত্রী এই পথ পাড়ি দিয়েছে কে জানে, কিন্তু সবাই শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ থেকেছে। যদি শূন্যের গর্ভে রেটনাইট থেকেই থাকে তা হলে কোন্ সেই শক্তি সকল অনুপ্রবেশকারীদের গ্রাস করে নিচ্ছে?

চুরি করা বইটা ক্রামারকে হতাশই করেছে। গোলক ধাঁধার মত অসংখ্য খাল আঁকা আছে বইয়ের মানচিত্রে, কিন্তু আসল রহস্য সম্পর্কে একটা কথাও উল্লেখ নেই।

দুপুরের দিকে বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল ক্রামার। আধঘণ্টা পর আবার যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর এগোবার পর ওর চোখের

ওপর 'ভিশন প্লেট'-এ ম্লান একটা আলো জ্বলে উঠল।

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল ক্রামারের শিরদাঁড়া বেয়ে। ভিশন প্লেটে একটা লাল দেয়াল আর বড় একটা দরজা দেখতে পেল সে। ওই দরজা পেরিয়ে এসেছে সে বহুক্ষণ আগে। ক্রামার দেখল খুলে গেল দরজাটা, স্পেসসুট পরিহিত এক লোক আবির্ভূত হলো। ক্রিস্টাল হেলমেট মাথায় তার, চেহারা স্পষ্ট চেনা গেল। ব্ল্যানচার্ড!

পুলিশ ইন্সপেক্টর ব্ল্যানচার্ড মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল, বালু পরীক্ষা করছে। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, দ্রুত পা বাড়াল সামনে।

গালি দিল ক্রামার। দু'ঘণ্টাও হয়নি হোম ভাল্লাকে সে খুন করে এসেছে, এরই মধ্যে ধূর্ত লোকটা ওর পিছু লেগে গেল? এত দ্রুত সে কী করে এখানে হাজির হলো! ক্রামার নিশ্চয়ই কোনও চিহ্ন ফেলে এসেছে।

আতঙ্কের একটা ঢেউ মুহূর্তের জন্য গ্রাস করল ক্রামারকে। পরক্ষণে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনল সে। শুয়ে পড়ল বালুতে, খাবার ট্যাবলেট চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

ভোরের আগে ঘুম ভেঙে গেল ক্রামারের। আবার এগোতে শুরু করল অন্ধকারে। কিন্তু সূর্যের প্রথম আলো গ্র্যান্ড ক্যানালে প্রবেশ করতেই তিনটে কোয়ানথ্র ওকে আক্রমণ করে বসল।

কোয়ানথ্রগুলোর বছরের এই সময় দক্ষিণ মণ্ডলে থাকার কথা। এগুলো কোত্থেকে এল? সোর্ড ফিশ চেহারার তিনটে কিম্ভূত কোয়ানথ্র-র পাখার আওয়াজ প্রবল আঘাত হানল ক্রামারের ইয়ার ফোনে।

এক গুলিতে প্রথমটাকে মেরে ফেলল ক্রামার। হিট পিস্তলের ডাবল চার্জে দ্বিতীয় পাখিটা মারাত্মক আহত হলো, কিন্তু তৃতীয়টা ইস্পাত কঠিন দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর গতিতে তেড়ে এল ওর গলা লক্ষ্য করে।

ঝট করে মাথা সরাল ক্রামার। একটুর জন্য ধারাল দাঁত বসল না গলায়। পকেট থেকে ছুরি বের করার আগেই ভয়ঙ্করদর্শন পাখিটা কামড় দিল ওর কাঁধে। একই সঙ্গে ওটার বুকে চকচকে ব্লেড ঢুকিয়ে দিল ক্রামার। প্রাণহীন দেহটা ছিটকে পড়ল দূরে।

অনেকক্ষণ হাঁপরের মত হাঁপাল ক্রামার। একটু সুস্থির হতেই চিন্তাটা মাথায় এল ওর।

তিনটে কোয়ানথ্রকে মেরেছে সে। তার মানে বাকি সাতানব্বইটা কাছে পিঠেই আছে। কোয়ানথ্ররা সবসময় একশোর একটা ঝাঁক মেলে ওড়ে। কাঁধের যন্ত্রণা সত্ত্বেও ক্রামারের মুখে চওড়া হাসি ফুটল, মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে ওর।

হ্যাভারস্যাক খুলল ক্রামার, তিনটে মৃতদেহের গায়ে লবণ ছিটাতে শুরু করল। লবণ খেতে খুব পছন্দ করে কোয়ানথ্ররা। তা ছাড়া শিগগিরই ওরা টের পেয়ে যাবে ঝাঁক থেকে তিনজন নিখোঁজ। সঙ্গীদের খুঁজতে বেরুবে ওরা। লবণের গন্ধে গোটা ঝাঁকটা হাজির হবে এখানে, থাকবেও অনেকক্ষণ। আর তখন যদি ব্ল্যানচার্ড এসে হাজির হয়...! নতুন উদ্যমে হাঁটা দিল ক্রামার।

ডুরেসিলেন্ট টেপ লাগাতেই কাঁধের কাটা দাগটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু বেজার হয়ে ক্রামার আবিষ্কার করল কোয়ানথ্রর আক্রমণে ওর ভিশন সেটের ক্ষতি হয়েছে। ব্ল্যানচার্ডকে দেখার জন্য যতবার সুইচ টিপল সে, প্রতিবারই ভিশন প্লেট ঝাপসা হয়ে থাকল।

দ্বিতীয় দিন রাতে ফার্স্ট ওয়ে স্টেশনে পৌঁছুল ক্রামার। দরজাহীন খুদে একটা ঘরে ঢুকল, মেঝেতে আবর্জনা বোঝাই। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সে। এদিক ওদিক তাকাতেই এক দেয়ালের গায়ে অক্ষত একটা স্প্যানার গ্লাস চোখে পড়ল

ক্রামারের। গ্লাসটা পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল ও। গ্লাসটার ব্যাটারির সঙ্গে নিজের সুটের ডিভাইসের কানেকশন লাগিয়ে বোতাম টিপতেই গ্লাসের গায়ে হিজিবিজি রেখা ফুটে উঠল। কয়েক সেকেন্ড পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল পর্দা। ব্ল্যানচার্ডকে স্পষ্ট দেখা গেল, নাছোড়বান্দার মত এগিয়ে আসছে। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। কানেকশন খুলল ক্রামার। আরেকটা চুরুট ধরাল। ধোঁয়া ফুঁকতে ফুঁকতে সতর্ক চোখে চারদিক লক্ষ করতে লাগল। নাহ্, ধূর্ত ইন্সপেক্টরটাকে ফাঁদে ফেলা যায় তেমন কিছু নেই এই ঘরে। বেরিয়ে এল ক্রামার, সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটা ধরল।

রাস্তার ডানধারে একটা গম্বুজাকৃতির বাড়ি চোখে পড়ল ক্রামারের। খাল শ্রমিকরা এখানে বহু আগে রাত্রিযাপন করত। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু একটা টাওয়ার। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মার্শিয়ান রাজবংশ টাওয়ারটাকে ক্যানাল গ্র্যান্ডে ঢোকা এবং বেরুবার সময় ট্রাফিক সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করত।

সর্বশেষ বিল্ডিংটার চেহারা এখনও ভাল। বিল্ডিংটায় দরজাও নেই। বালুর একটা স্তূপ জমে আছে ওখানে। ফুট পাঁচেক উঁচু। ভেতরে ঢুকল ক্রামার। তনুভূত বায়ু (rare-fied air) ভেতরের জিনিসগুলো এখনও ঠিকঠাক রেখেছে।

লম্বা ডেমড়েম বারটা এক দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আছে এখনও। ছোট কয়েকটা চোরা-কুঠুরি দেখতে পেল ও। ওগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর ইলেকট্রো হিপনোটিক মেশিন।

একটা ভাঙাচোরা মেশিনের সামনে এসে দাঁড়াল ক্রামার। আগের শতাব্দীর মার্শিয়ানরা সেল্ফ অ্যাপ্লাইড হিপনোটিজম-এর দক্ষতা অর্জন করেছিল। মেশিনটা তুলে নিল ক্রামার, দরজার কাছে চলে এল। বালির স্তূপের ওপর বসাল ওটাকে, তারপর দ্রুত হাতে কাজ শুরু করল। এসব মেশিন কী করে সচল করা

যায় জানা আছে ক্রামারের। আর হাতের কাছে তো ইন্সট্রুমেন্ট রয়েইছে। অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসটাকে আগের অবস্থায় রূপ দিল ক্রামার। সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল। ইলেকট্রিক স্টাইলাসটা বের করে সম্মোহন যন্ত্রের রিফ্রাক্টো গ্লাস প্যানেলে গোটা গোটা অক্ষরে লিখল:

'ব্ল্যানচার্ড আমি জানি তুমি আমার পিছু নিয়েছ, কিন্তু এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি জানতে চাও আমি কোন্ খাল দিয়ে গিয়েছি, তা হলে জবাবটা গ্লাসের মধ্যে থেকে খুঁজে নাও।'

নিজের নাম দস্তখত করে নিঃশব্দে হাসল ক্রামার, এই ফাঁদটা বেশ জটিল। কিন্তু ব্ল্যানচার্ডও কম ধুরন্ধর নয়, জানে সে, তবে ব্ল্যানচার্ডকে এই পথে অবশ্যই আসতে হবে, ক্লু খুঁজবে। হিপনোটিজম মেশিনটাকে চোখেও পড়বে, এবং তারপর লেখাটার দিকে তাকাবে সে।

রিফ্রাক্টো গ্লাসের দিকে তাকানো মাত্র কাজ শুরু করে দেবে যন্ত্র। দ্রুত এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে সে, আর জাগবে না। আর যদি সে পিছু হটে আসতে চায়, তা হলে ধাক্কা খাবে দেয়ালের সঙ্গে। ভারী গার্ডারটা ওখানে জায়গামত ঝুলিয়ে রেখেছে ক্রামার। ওকে একেবারে পিষে ফেলবে।

এই ওয়ে স্টেশনে পাঁচটি খুদে খাল এসে মিশেছে গ্র্যান্ড ক্যানালের সঙ্গে। কিন্তু ক্রামার কোনও খালের দিকেই যাবে না। কথাটা সে লিখেছে স্রেফ তার অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। উৎফুল্লচিত্তে ক্রামার ক্যানাল গ্রান্ড ধরে হাঁটতে লাগল।

যেতে যেতে ক্রামার বার কয়েক চেষ্টা করল তার ভিশন সেটটাকে ঠিক করতে। একবার প্রায় ঠিক হয়ে এসেছিল কিন্তু পরক্ষণে ঝাপসা হয়ে গেল ছবি, তারপর কন্ট্রোল থেকে আর সাড়াশব্দই এল না। কাঁধের যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে, বাঁ

হাতটা অবশ ঠেকছে। ক্রামার টের পেল বগলের নীচের গ্ল্যান্ড ফুলে উঠেছে।

দুপুরের দিকে ক্রামার লক্ষ করল চারপাশের দৃশ্যপটের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। ক্যানালের দেয়ালগুলো যেন আরও গভীর, আরও চেপে আসছে। বড়বড় পরিখাগুলোর রঙ টকটকে লাল, ঝলসে দিচ্ছে চোখ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্রামার, চোখ বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। সিকিমাইল দূরে ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে কালো রঙের বিশাল এক পাথরের ঢিবি।

পাহাড়! কাছে যেতেই বড়বড় বোল্ডারগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল ক্রামার, একটার ওপর আরেকটা স্তূপ হয়ে আছে, কেমন ভয় ধরানো একটা ভাব আছে ওগুলোতে। এগুলো এখানে এল কোত্থেকে? ক্যানালের মাথার ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই গড়িয়ে আসেনি, আর শিলাস্তূপের আকৃতিটা এত নিখুঁত যে ক্রামারের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না এটা প্রকৃতির কোনও সৃষ্টি।

সাবধানে আগে বাড়ল ক্রামার। বিশ গজ দূরত্ব থাকতে সে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, ভয়ের একটা ঢেউ ওকে নাড়া দিয়ে গেল। পাথরগুলোর মধ্যে জ্যান্ত কী যেন একটা আছে। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে ওর দিকে যেন তাকিয়ে আছে পাথরগুলো।

হঠাৎ গলা চিরে ভয়ার্ত একটা চিৎকার বেরুল ক্রামারের, ঘুরেই দৌড় দিল। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সেকেন্ডের জন্য পেছন ফিরে চাইল ও, অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। 'পাথরগুলো' ঢিবি থেকে নেমে এসেছে, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল শক্ত মাটিতে। ধীরে, তবে নির্ভুল নিশানায় ওকে অনুসরণ শুরু করল 'ওরা'।

ক্রামারের চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। বুঝতে পারল কীসের পাল্লায় পড়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানালের মূর্তিমান আতঙ্ক ওগুলো—ক্যানালব্রাস।

প্রথমদিকে সহজেই দৌড়ে ওদের পেছন ফেলে দিল ক্রামার। কিন্তু ওরাও গতি বাড়ালে দিশেহারা বোধ করল সে। বালির ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে ক্যানালব্রাসেরা, যেন ওজন শূন্য। পেছন ফিরলেই ওগুলোর গুহার মত মুখ আর অসংখ্য চোখ দেখতে পাবে ভেবে ওদিকে তাকাল না ক্রামার।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে সে। ক্যানালব্রাসরা অজৈব, তবে সর্বভুক। ওরা জৈব পদার্থ বা প্রাণী থেকে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু মাটির ওপর এমনভাবে পড়ে থাকে যেন কয়লার একটা ডিপো।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে ক্রামার। কীভাবে দানবগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবে জানে না। হঠাৎ অনেকদিন আগে একটা বইতে পড়া তথ্যটা মনে পড়ে গেল ওর। ক্যানালব্রাসরা সব-সনিক কম্পন সহ্য করতে পারে না। একমাত্র এই জিনিসটাই ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু ক্রামারের কাছে এই মুহূর্তে ভাইব্রেটর নেই, তবে হিট পিস্তল আছে। উন্মাদের মত হোলস্টার থেকে একটানে অস্ত্রটাকে বের করল ক্রামার, ঘুরে দাঁড়াল, এবং গুলি করল।

রেজাল্ট কী হবে জানা ছিল না ক্রামারের। নল থেকে আগুনের একটা ঝলক বেরুল শুধু, যেন ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ক্যানালব্রাসদের দলটা। স্লো মোশন ছবির মত একসঙ্গে ঘুরে গেল সব ক'টা, রণেভঙ্গ দিল। আগের জায়গায় ফিরে গেল ওরা, একটা আরেকটার ওপর চড়ে বসল, ঠিক আগের পজিশনে ফিরে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ক্রামার, এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না একটু আগের ঘটনাটাকে। তারপর সাহসের সঙ্গে পরীক্ষাটা করল।

ক্রামারের হিট পিস্তলটা লেটেস্ট গান-লারকিটন টাইপের, বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ছোট্ট যন্ত্রটা কম্পন নিয়ন্ত্রণে ওস্তাদ। খুব

কম অস্ত্রেই সুপার-সনিক চার্জ থাকে। ক্রামারের পিস্তলটা সেগুলোর মধ্যে একটা।

সাব-সনিক চার্জ দিয়ে যদি ক্যানালব্রাসদের সাময়িকভাবে স্থির করে দেয়া যায়, তা হলে সুপার-সনিক কিংবা আলট্রা-সনিক ওয়েভ দিয়ে ওদের সচল করা কি সম্ভব নয়?

সেই চেষ্টাই চালাল ক্রামার, অস্ত্রটা অ্যাডজাস্ট করল, গুলি ছুঁড়তেই পাথুরে আকৃতিগুলো যেন জীবন ফিরে পেল। সাব-সনিক আগুনের একটা গোলা ওদেরকে আগের মত আগ্রাসী হামলা চালানোর পর্যায়ে নিয়ে গেল।

আবিষ্কারের আনন্দে একটা সিগার ধরাল ক্রামার। পনেরো মিনিটের মধ্যে সে তৃতীয় ফাঁদটা পাতল। যদিও এই ফাঁদ পাতার কোনওই দরকার ছিল না। কিন্তু কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ক্রামার।

হিট গানটা বালুতে পুঁতল সে, শুধু ব্যারেল আর ট্রিগারটা বেরিয়ে থাকল। একটা দড়ি শক্ত করে আড়াআড়ি বাঁধল ক্যানাল ফ্লোরের বিশগজ জায়গা জুড়ে। দড়ির একটা গিঁট বাঁধা থাকল ট্রিগারের সঙ্গে। ব্যারেলটা সোজা তাক করে রাখল ক্রামার ক্যানালব্রাসদের দিকে।

'এখন,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'যদি এই পথে ব্ল্যানচার্ড ওয়ে স্টেশনের দিকে আসে তা হলে সে মস্ত একটা সারপ্রাইজ পাবে। আসলে আজকালকার যুগে মস্তিষ্ক না থাকলে কোনও কাজ করা সম্ভব না।'

আত্মতুষ্টিতে বলীয়ান ক্রামার জ্যান্ত পাথরগুলোকে পেছনে রেখে লম্বা পায়ে ক্যানালের দিকে এগোল।

সিকি মাইল এগোবার পর ও চুরি করা ম্যাপটা বের করে চোখ বোলাতে লাগল। ম্যাপ আঁকা বইটা হাতে নিয়ে চারদিকে লক্ষ করতে করতে হাঁটতে লাগল।

প্রতি একশো গজ যাওয়ার পর একবার করে থামল ক্রামার,

গ্র্যান্ড ক্যানালের শাখা মুখগুলোকে পরীক্ষা করে দেখল। কোনও কোনওটা গ্র্যান্ড ক্যানালের মতই বড়। একবার সন্দেহ হলো ক্রামারের, পথ ভুল ধরেছে কিনা। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। চলার গতি একটুও শ্লথ হলো না। গ্র্যান্ড ক্যানালের মূল ধমনীতে ঘুরপাক খেলেও একসময় ঠিকই আসল জায়গায় পৌঁছে যাবে, শপথ করল ক্রামার।

এদিকটাতে, গ্র্যান্ড ক্যানালের দেয়ালের গায়ে অসংখ্য চিত্রলিপি চোখে পড়ল ক্রামারের। অনেক লেখাই মুছে গেছে, কিছু অস্পষ্ট। তবুও চেষ্টা করল যদি পড়া যায়। একটা চিত্রলিপি পড়তে গিয়ে ধাক্কা খেল, ভ্রূ কুঁচকে উঠল। অনুবাদ করল ক্রামার: *'প্রতিধ্বনি থেকে সাবধান।'*

কিন্তু চিত্রলিপির কথা একটু পরই সে ভুলে গেল। ব্ল্যানচার্ডের অবস্থান জানার জন্য ভিসা সেটে হাত লাগাল। যন্ত্রটা কর্কশ শব্দ তুলল, গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল, এক সেকেন্ডের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েই আবার নষ্ট হয়ে গেল।

ওই এক সেকেন্ডেই যা দেখার দেখে নিয়েছে ক্রামার। বালুর সমুদ্র ভেঙে অপ্রতিরোধ্য গতিতে থপথপ করে এগিয়ে আসছে ব্ল্যানচার্ড। দুটো ফাঁদকেই সে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। চমকে উঠল ক্রামার। লোকটাকে কি কিছুতেই থামানো যাবে না?

অজান্তেই হাঁটার গতি দ্রুততর হলো ক্রামারের, প্রতিটি পদক্ষেপে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর। কাঁধের ব্যথাটা বেড়ে গেছে খুব।

লক্ষ করল ক্রামার ক্যানালের লাল রঙের দুই তীরের দ্যুতি অনেকটাই ম্লান হয়ে আসছে, কেমন ধাতব রঙের লাগছে। এদিকের তীরের দেয়ালের রঙ ক্রমশ স্লেটরঙা হয়ে উঠল, আরও উঁচু, যেন টানেলের মত মাথায় সমকেন্দ্রী হয়ে আছে। হঠাৎ টের পেল ক্রামার একটা অস্বস্তিবোধ ঘিরে ধরছে ওকে, ইচ্ছে করল চিৎকার করে এই ভয়াবহ নৈঃশব্দ ভেঙে খান খান করে দেয়।

আরও হাত বিশেক এগোবার পর ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল মনে। যেন শব্দহীন এই নীরবতা চেপে বসছে কানে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ক্রামার এগিয়ে গেল কাছের দেয়ালটার দিকে। একটা বড় পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে পাগলের মত ধাতব দেয়ালটায় আঘাত করতে লাগল। কিন্তু কোনও শব্দ হলো না। যেন কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সে তুলোর বস্তা পিটাচ্ছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ক্রামার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল পাথরের টুকরোটা থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুট দিল ক্যানালের পথ ধরে। ছায়ার মত জিনিসটা, কিন্তু হাত-পা আছে, বোতামের মত ছোট্ট একটা মাথাও চোখে পড়ল।

টুকরোটা দিয়ে আবারও আঘাত হানল ক্রামার। আবারও একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে সবেগে ছুটে গেল সামনে। ক্রামার শুয়ে পড়ল বালুতে, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বিপরীত দিকের দেয়াল থেকে এবার আবির্ভূত হলো ওরা, বারোজনের একটা দল। গুঞ্জনের শব্দ উঠল, ধীরে বেড়ে চলল আওয়াজটা। ভয়ঙ্কর শব্দটা প্রায় পাগল করার জোগাড় করল ক্রামারকে। হেডসেটের সুইচ অফ করে দিল সে। কিন্তু শব্দের কম্পনটা যেন ঢুকে গেল ওর স্পেসসুটের ভেতরে, হেক্সটার হেলমেটের মধ্যে। যেন ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে ছায়ামূর্তিগুলো ক্রমাগত বাড়ি মেরে চলেছে ওর মাথায়।

এগুলোই কি সেই প্রতিধ্বনি তোলা ছায়ামূর্তি যাদের কথা কিছুক্ষণ আগে এক চিত্রলিপিতে দেখে এসেছে ক্রামার? নাকি গোটা ব্যাপারটাই ওর মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা, আহত হাতের আঘাতজনিত জ্বরের ফল? জানে না সে।

ক্রামার ওখানেই তালগোল পাকিয়ে বসে থাকল। এক সময় প্রতিধ্বনিটা পুরোপুরি থেমে গেল। ক্রামার ভাবল এটাকেও ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা। শেষ একটা ফাঁদ, যেটা ব্ল্যানচার্ডকে থামিয়ে দিতে পারবে চিরতরে।

কিন্তু ভাবনা চিন্তার বেশি সময় নেই ওর হাতে। পেছন ফিরে তাকাল ও, সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রবল অবিশ্বাসে।

একটা লোক বালুর ওপর দিয়ে ধীরগতিতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ব্ল্যানচার্ড!

লাফিয়ে উঠল ক্রামার, যেন ভূতে তাড়া করেছে এমন ভাবে দৌড় দিল সে, এক মুহূর্তের জন্যেও আর কোথাও থামল না। প্রাণভয়ে দৌড়ে চলল সে।

দিন ছয় পরে ক্রামার তার অভিযানের শেষ পর্বে চলে এল। ক্রামারের বিশ্বাস এখন যে কোনও মুহূর্তে রেটনাইট ডিপোজিটের গুহামুখটা তার চোখে পড়তে পারে। আর তারপরই সকল দুশ্চিন্তা আর টেনশনের অবসান হবে। প্রচুর পরিমাণে রেটনাইট নেবে সে। বইতে লেখা আছে ওটাকে পরিশুদ্ধ করার নিয়ম। ক্যানাল টুয়েন্টি এইট নর্থ-ওয়েস্টের পথ ধরে এগোলে যেভাবেই হোক সে পৌঁছে যাবে ক্রেটার সিটিতে। ব্ল্যানচার্ড যদিও এখন তার খুব কাছে চলে এসেছে, কিন্তু সে ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

তাকে এক বছর—বড় জোর ছয় মাস সময় দাও, সাফল্য হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে ক্রামার। মনের দরজা খুলে যাবে ওর, সকল দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দেবে সে। আর আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে সে তখন।

কিন্তু তারপরও একটা প্রশ্নের জবাব অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে—ওই শূন্য। ক্যানাল গ্র্যান্ডে প্রবেশ করার পর থেকে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছে ক্রামার। কিন্তু জোঁকের মত সেঁটে আছে ওটা মস্তিষ্কে। কিন্তু ও যতই নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই চিন্তাটা ওকে আলোড়িত করছে।

ওটা সামনে কোথাও হবে, হয়তো একটা উপসাগরের মত, যেটাকে তার পাড়ি দিতেই হবে। কিন্তু ওখানে না পৌঁছা পর্যন্ত

প্রশ্নটার জবাব সে পাচ্ছে না।

ক্যানালের আশপাশ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে লাগল ক্রামার। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত আর বাহুতে কোনও সাড়া নেই, যেন শরীরের কোনও অঙ্গ নয় ও দুটো। বিশ্রামের সময় প্রতিবার ও চোখের সামনে লাল ফুটকি ফুটতে দেখল।

বেলা তিনটার দিকে ক্রামার বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল ক্যানালের বাঁ দিকের দেয়াল স্পর্শকের মত উঠে গেছে ওপরে, ওর সামনে সৃষ্টি করেছে এক বিশাল উপবৃত্ত। একই সঙ্গে বালুর মেঝে নেমে গেছে নীচের দিকে, গভীর থেকে গভীরে। এক সময় তীর আর চোখেই পড়ল না ওর।

ঘণ্টাখানেক পর একটা দৃশ্য দেখে সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ক্রামার।

সিকি মাইল সামনে, ক্যানালের ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অদ্ভুত কিছু বস্তু। ক্রামার দেখল ওগুলোর মধ্যে রয়েছে আধুনিক রকেট শিপ, ত্রিশ শতাব্দীর বিশাল ডানাওয়ালা স্টেপটো বিমান। সবগুলো চুপচাপ পড়ে আছে, দরজা খোলা। যেন ক্রুরা বাইরে গেছে কিছুক্ষণের জন্য, এখুনি ফিরবে।

কিন্তু কাছে আসতে ক্রামার বুঝল উড়ুক্কু যানগুলো বহুদিন থেকে এভাবে পড়ে আছে। কাঠামোর অর্ধেক ডুবে আছে বালুতে। জীর্ণ চেহারা, কাঁচের রঙ হলদেটে।

মোট বিশটা যান, গুণল ক্রামার, এর মধ্যে একটার নাম পড়ে যানটাকে চিনতে পারল সে। গোলিয়াথ। বহু আগে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। পুরানো বাহনগুলোর বেশিরভাগই সে ইতিহাস বইতে দেখেছে।

ক্রামার বুঝতে পারল বিমানগুলোর শেষ গন্তব্য ছিল এখানেই। ওরা হয়তো শূন্যকে আবিষ্কারের আশায় এতদূর এসেছিল। কিন্তু ক্রুদের কী হলো? তারা আর ফেরেনি কেন?

শেষ বিমানটা পার হয়ে খানিক এগোবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল

ক্রামার। অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। অয়েলস্কিনের খুদে বটুয়াটা খুলে বইটা বের করে মনোযোগ দিয়ে একটা জায়গায় চোখ বোলাতে শুরু করল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস ধ্বনি বেরিয়ে এল ক্রামারের গলা থেকে। আরি, জিনিসটা তো আগে চোখে পড়েনি ওর। কিন্তু ক্যানালের এই জায়গাটা ম্যাপে চিহ্নিত আছে। তার চেয়েও বেশি, মানচিত্র স্পষ্ট বলছে বিশাল এক বাটির মধ্যে জমা হয়ে আছে মহামূল্যবান সেই পরশমণি—রেটনাইট।

ক্যানালের মুখে দুটো ট্রেইল দেখা যাচ্ছে। একটা সরু, ডট লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা। অন্য ট্রেইলটা বড়, দুটি মাত্র শব্দে প্রাচীন মার্শিয়ানদের প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। *এ-ক্রি মেনাগ্রা*, লেখা আছে ম্যাপে।

ক্রামার উঠে দাঁড়াল, পুব দিক লক্ষ্য করে শ'খানেক গজ হেঁটে গেল। কিন্তু কোনও ট্রেইল চোখে পড়ল না। ধু ধু বালু ছাড়া কিছু নেই। তারপর, অন্যমনস্কভাবে মাথা সামান্য ওপরে তুলতেই ওটাকে দেখতে পেল সে।

ওর সামনে একটা সরু করিডর, ম্যাপে বর্ণিত ট্রেইলটার মত। বালুর মেঝে ওখানে ঢালু হয়ে আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। কিন্তু করিডরের মুখে একটা চকচকে ভাব। যেন ডাবল গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

দুটো ট্রেইলের একটাকে আবিষ্কার করেও এবার আর লাফিয়ে উঠল না ক্রামার। সরু ট্রেইলটার তো খোঁজ পাওয়া গেল, কিন্তু বড়টা কোথায়? ওটা হয়তো আরও সামনে হবে। ম্যাপটাকে ফেলে দিল সে বালুতে, মাড়িয়ে গেল। যেন ভুলে ফেলে গেছে ওটাকে।

পুবদিক ধরে হাঁটতে থাকল ক্রামার। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। দ্বিতীয় ট্রেইলটা বড়, বেশ বড়। বালু থেকে একটা পাথুরে দেয়াল উঠে গেছে ওর সামনে। এখানেও,

ট্রেইলের মুখে গ্লাসের মত জিনিসটাকে দেখতে পেল ও।

তবে ইতস্তত না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্রামার। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস বোধ করল সে। পেছনের পথটা বন্ধ হয়ে গেছে, এরকম একটা অনুভূতি একই সঙ্গে কাজ করল ওর ভেতরে।

*এ-ক্রি মেনাগ্রা?* কী মানে ওই শব্দগুলোর? মেনার, জানে ক্রামার, প্রাচীন একটি মার্শিয়ান শব্দ। মানে হচ্ছে কুঞ্চিত বা বক্র হওয়া। আর ক্রি শব্দের অর্থও তার জানা—উন্মুক্ত, ফাঁকা জায়গা।

দাঁড়িয়ে গেল ক্রামার, শীতল একটা স্রোত নার্মল মেরুদণ্ড বেয়ে। শব্দগুলোর সম্পূর্ণ অর্থ এখন ওর কাছে পরিষ্কার। তা হলে শূন্যের আসল রহস্য হচ্ছে এই! কেন অভিযাত্রীরা শূন্যে যাত্রা করেও আর ফিরে আসেনি বুঝতে পেরে গা ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্রামারের, কেন গ্র্যান্ড ক্যানাল শুকিয়ে গেছে তার জবাবও পেয়ে গেছে সে ইতিমধ্যে। এ আলাদা এক জগৎ—আলাদা ডাইমেনশন—এখানে যে একবার প্রবেশ করে সে আর ফেরে না, নিখোঁজ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। শূন্য তাকে গ্রাস করে।

খুব আস্তে আবার হাঁটতে শুরু করল ক্রামার। জোর করে চোখ দুটো সামনের দিকে নিবদ্ধ রাখল সে। কিন্তু একসময় আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, ঘুরে দাঁড়াল।

নেই! ওর পেছনে কিচ্ছু নেই। যেন যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে গ্র্যান্ড ক্যানাল। আছে শুধু বিশাল এক অন্ধকার কালো পর্দা। আর সামনে সীমাহীন এক দূরত্ব।

---

# হন্তারক

## পূর্বাভাস

তার কোনও নাম নেই। তার বাড়ি এক সূর্যের এক গ্রহে, পৃথিবী থেকে ৮০ আলোকবর্ষ দূরে, অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে, এত দূরে যে ওখানকার সূর্য পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। তাই ওই গ্রহের নাম জানে না মানুষ।

যাকে নিয়ে আমাদের গল্পের শুরু সে তার গ্রহের এক ভয়ংকর অপরাধী। সে একদিন এমন একটি অপরাধ করে বসল, সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নির্বাসনে। আর তার নির্বাসন ঘটল পৃথিবীতে। তবে স্পেসশিপে চড়ে আসেনি সে, তাকে পাঠানো হয়েছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক ফোর্স বিমের সাহায্যে। পৃথিবীতে পৌঁছুতে তার মাইক্রো সেকেন্ড সময় লেগেছে মাত্র। পৃথিবীর মানুষ জানে না কী নিষ্ঠুর এবং নির্দয় এক হন্তারক তাদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় হলেই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে সে। শুরু হলো দুঃস্বপ্নকে হার মানানো এক হরর কাহিনি...

## এক

তার নাম না থাকলেও রয়েছে অসাধারণ 'উপলব্ধি' ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সাহায্যে সহজেই সে অচেনা এই গ্রহের অজানা

পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। তার নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই, নেই চোখ বা কান। তবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা এত প্রখর যে সহজেই আশপাশের সবকিছু 'দেখতে' পায়, তার সীমানার মধ্যে পড়ে, এমন কোনও শব্দ তার অদৃশ্য 'কান' এড়িয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি বিশ গজের মত জায়গা সে বেশ পরিষ্কার দেখার ক্ষমতা রাখে, আরও বিশ গজ দূরে তার নজর যায় বটে, তবে ঝাপসা দেখে। এই তো পাশের গাছের ছাল বাকল সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে মাটির নীচে পোকাদের নড়াচড়ার শব্দ। ব্যাপারটা তাকে অবাক করে তুলছে। কারণ, নিজের জগৎ ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের স্পন্দন থাকতে পারে তার জানা ছিল না। তবে উপলব্ধি ক্ষমতা বলছে পোকাগুলো তার জন্য বিপজ্জনক নয়। এমনকী মাথার ওপর, গাছের ডালে ছোট ছোট কয়েকটি পাখি বসে আছে, ওরাও কোন বিপদ ডেকে আনবে না।

এ গ্রহের বিশাল সব গাছ দেখে সে অভিভূত। আর অবাক লাগছে চারপেয়ে একটি প্রাণীকে দেখে। ওটা প্রাকৃতিক একটা গুহার গর্তে ঘুমাচ্ছে, তার থেকে দশ গজ দূরে।

প্রাণীটা যেহেতু ঘুমাচ্ছে, তাই সে জানে সহজেই সে ওটার মনের ভেতর ঢুকে যেতে পারবে। তারপর ওকে দিয়ে যা খুশি করানো তার জন্যে কোনও ব্যাপারই নয়। তবে এসব ছোটখাট প্রাণী দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য কতটা সাধন করা যাবে, সে ব্যাপারে তার সন্দেহও রয়েছে।

সে 'পারসেপটর সেন্স' বা উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে স্ক্যানিং করে চলছিল চারপাশ। মনোযোগ কেড়ে নিল একটা ছুরি। জং ধরা, ভাঙা ব্লেডের একটা জ্যাকনাইফ। কেউ ফেলে দিয়েছে অনেক আগে। ওটাকে যে ছুরি বলে তাও জানে না সে। তার কাছে ওটা স্রেফ আর্টিফ্যাক্ট বা শিল্পকলা ছাড়া কিছু নয়। আর আর্টিফ্যাক্ট মানেই বুদ্ধিমান জীবন! তবে বুদ্ধিমান জীবন প্রতিকূল

এবং বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। কারণ সে ছোট এবং অসহায়। তাই তার উচিত বুদ্ধিমান জীবনের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আগে জেনে নেয়া, সেক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীটা হতে পারে পরীক্ষা করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। ঘুমন্ত প্রাণীটার মনের ভেতর প্রবেশ করে বরং সে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানার সুযোগ পাবে, এভাবে স্ক্যানিং করার চেয়ে।

সে একটা মেঠো পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে, কয়েক হাত দূরে লম্বা ঘাসের জঙ্গল, ওখানে লুকালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সে চেষ্টা করল এগোতে, পারল না। তবে অবাক হলো না। কারণ তার গ্রহের তুলনায় এ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক বেশি। তাদের গ্রহে চলাফেরার প্রয়োজন হলে, শূন্যে স্রেফ ভাসিয়ে তোলে নিজেদেরকে। কিন্তু এখানে সে এটা করতে পারছে না। কারণ এখানে কারও ওপর ভর করে তাকে চলতে হবে, কাউকে তার 'হোস্ট' বানাতে হবে। আর এমন 'হোস্ট' করার মত একজনকেই সে দেখতে পাচ্ছে—ঘুমিয়ে আছে গুহায়। তবে ওটা খুব ছোট, তার অর্ধেক ওজনও হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

হঠাৎ তার পারসেপটর সেন্সে কী যেন ধরা পড়ল। সে ওদিকে পুরো মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। বিপদ হলে খামোকা ওই ছোট প্রাণীটাকে নিয়ে মেতে থাকার মানে হয়-না। আগে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

প্রথমে শুধু কম্পন টের পেল সে, মাটি কাঁপছে, হেঁটে আসছে কেউ, বড় কিছু একটা। তারপর বাতাসে আরেকটা কম্পন ভেসে এল। কথা বলছে কেউ। কোনও বুদ্ধিমান প্রাণী। তবে একজন নয়, দু'জন। একজন বেশ উঁচু গলায় কথা বলছে, অপরজন খানিক নিচু গলায়। কথা বুঝতে পারছে না সে, বোঝার কথাও নয়। সে ওদের চিন্তা-ভাবনার মাঝে ঢুকতে পারল না, তার গ্রহের জীবরা শব্দ উচ্চারণ করে না, পরস্পরের

মাঝে যোগাযোগ রক্ষা হয় টেলিপ্যাথির মাধ্যমে।

এক সময় ওরা দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল। দু'জনই বটে। একজন তার সঙ্গীর চেয়ে সামান্য লম্বা, তবে দু'জনেই পরিণত বয়স্ক। সন্দেহ নেই দু'জনেই বুদ্ধিমান প্রজাতির, ওদের পরনে পোশাক—শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীরাই পোশাক পরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। দু'জোড়া হাত এবং দু'জোড়া পা দেখা যাচ্ছে। বাহ্, এরা তার চমৎকার 'হোস্ট' হতে পারবে। তবে এ মুহূর্তে এ নিয়ে ভাবার সময় নেই তার। তার এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন। নিজেকে বাঁচাতে হবে।

ওরা দু'জন দুই লিঙ্গের। একটি মেয়ে, অপরটি ছেলে। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছে এদিকেই। সর্বনাশ! এখনই তো দেখে ফেলবে ওকে। তা হলেই কম্ম সারা।

মরিয়া হয়ে সে তার একমাত্র অবলম্বন ঘুমন্ত, চারপেয়ে প্রাণীটার ওপর সওয়ার হলো, তার মনের ভেতর ঢুকে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলল। তারপর ওটাকে জাগিয়ে তুলে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। আপাতত এটার ওপরেই সে ভর করে থাকবে। সে ছেলে মেয়ে দুটোকে ভাল করে দেখতে চায়। ওদের সম্পর্কে জানতে চায়। অবশ্য তার ভয়ও আছে। সে যে প্রাণীটার শরীরে ঢুকে পড়েছে, ওটা যদি ওদের চোখে পড়ে যায় তা হলে বিপদ হতে পারে। ওরা তার হোস্টকে মেরে ফেলতে পারে। হোস্টকে মেরে ফেললেও তার অসুবিধে নেই। অসুবিধা হবে ঘুমন্ত কোনও প্রাণীর ওপর সওয়ার হবার আগেই সে যদি ধরা পড়ে যায়, তা হলে। অবশ্য সুযোগ বুঝে হোস্টকে নিজেই হত্যা করবে সে বা মরতে বাধ্য করবে। তা হলেই তার পক্ষে সম্ভব হবে অন্য কোনও ঘুমন্ত প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়ে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলা। বর্তমান হোস্টটি এত ছোট এবং ভঙ্গুর যে, এর ওপর ভর করে থাকলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করা কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না তার পক্ষে।

ওই ছেলেটির নাম রনি বেরেট, মেয়েটি শার্লি রকফিল্ড। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, বিয়ে করবে শীঘ্রি। জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা, ফুর্তি করবে।

রনির বাঁ হাত নিজের ডান হাতের মুঠোয় চেপে হাঁটছিল শার্লি, হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রনি, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকাল শার্লির দিকে। শার্লি উঁকি মেরে কী যেন দেখছে।

'দেখ, রনি,' বলল সে। 'একটা মেঠো ইঁদুর। কী করছে দেখ!'

'দূর, ইঁদুর দেখলেই গা ঘিনঘিন করে আমার।' মুখ বাঁকাল রনি।

ইঁদুরটা, ওদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে, রাস্তায় বসে আছে, প্রেইরি কুকুরের মত। সামনের ছোট ছোট পা দুটো দ্রুত নাড়ছে, যেন ওদের সঙ্কেত দিতে চাইছে। খুদে, তীক্ষ্ণ চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে ওদের ওপর।

'কোনও ইঁদুরকে এমন অদ্ভুত কাজ করতে দেখিনি কোনদিন,' মন্তব্য করল শার্লি, 'মোটেও ভয় পাচ্ছে না আমাদেরকে, লক্ষ করেছ? এটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়, বলো তো? পুষব!'

রনি বাধা দেয়ার আগেই উবু হলো শার্লি, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ইঁদুরটাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে খুদে প্রাণীটাকে দেখতে দেখতে বলল, 'ইস, রনি। কী সুন্দর!'

'মানলাম সুন্দর,' বলল টমি, 'এখন ওটাকে ছেড়ে দাও। বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না।'

'আচ্ছা বাবা, নেব না। এমনি দেখলাম ওকে ধরতে পারি কিনা। উহ্!' ছুড়ে ফেলল সে ইঁদুরটাকে, যন্ত্রণায় মুখ বাঁকাল। 'খুদে শয়তানটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে।'

ইঁদুরটা ফুড়ুৎ করে দৌড় দিল, খানিক দূরে গিয়ে থেমে

দাঁড়াল, পেছন ফিরে দেখল ওরা ধাওয়া করেছে কি-না। না, ধাওয়া করছে না। ওরা এমনকী তার দিকে তাকাচ্ছেও না। ওরা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদেরকে নিয়ে।

'বেশি লেগেছে, সোনা?' উদ্বিগ্ন দেখাল রনিকে।

'না, তেমন না, আরে, দেখ!' শার্লি তাকাল রাস্তায়।

দৌড়ে আসছে ইঁদুরটা রনির দিকে। ট্রাউজার বেয়ে উঠতে শুরু করল, এক ঝাপটা মেরে ওটাকে পাঁচ হাত দূরে পাঠিয়ে দিল রনি। আবার এল ওটা–প্রতিহিংসা নিয়ে হামলা চালাল। এবার প্রস্তুত ছিল রনি। সজোরে পা নামিয়ে আনল ছোট্ট, জ্যান্ত প্রাণীটার ওপর, পিষে ভর্তা করে ফেলল। তারপর ছিন্নভিন্ন দেহটা কিক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

'রনি, তুমি ওটাকে–'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে বান্ধবীর দিকে ফিরল রনি। 'শার্লি, ওটা আমার ওপর দু'বার হামলা চালিয়েছে। যাকগে, তোমাকে কোথায় কামড়েছে বল। রক্ত বের হলে ইঁদুরটাকে নিয়ে শহরে যেতে হবে, র‍্যাবিস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কোথায় কামড় দিয়েছে, শার্লি?'

'বা-বাম বুকে, মুখের কাছে আনার সময় কামড় দিয়েছে। তবে রক্ত বের হয়নি। সোয়েটার আর ব্রা ছিল–

'তবু চেক করে দেখতে হবে। তোমার জামা–না থাক এখানে খুলতে হবে না। লোকজন এসে পড়তে পারে, চলো, এগোই। অন্য কোথাও গিয়ে পরীক্ষা করে দেখব।'

শার্লির হাত ধরে পা বাড়াল রনি। এত জোরে হাঁটা দিল, ওর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হলো শার্লিকে।

'দেখ একটা কচ্ছপ,' কয়েক কদম যাবার পর বলে উঠল শার্লি।

হাঁটার গতি কমাল না রনি, 'প্রাণী নিয়ে অনেক খেলা হয়েছে। এবার চলো তো!'

খানিকটা এগোবার পর মোড় ঘুরল ওরা, এখানে প্রচুর ঝোপঝাড়, তারপর টলটলে একটা পুকুর। বেশ নির্জন পরিবেশ। এখানে লোকজন আসে বলে মনে হয় না। ওরা এসেছে পুকুরে মজা করে সাঁতার কাটবে।

রনির বয়স আঠারো, শার্লি সতেরোয় পা দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে দুটিতে বন্ধুত্ব। একই স্কুলে পড়ত ওরা, একই ক্লাসে। বছর দুই আগে হাইস্কুলের পড়া শেষ করেছে ওরা। পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই রনির। বাপের খামারে কাজ করে। বাপবেটা দু'জনের খেয়ে পরে চমৎকার চলে যায়। দু'পরিবারই ওদের সখ্যর কথা জানে। টমির বাবা, মি. বেরেট শার্লিকে পুত্রবধু করে ঘরে নেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছেন। শার্লির বাবা মারও আপত্তি নেই রনির মত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান এবং সৎ পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে। জানেন রনির ঘরে শার্লি সুখেই থাকবে। কারণ রনি খুবই ভালবাসে শার্লিকে।

রনি আর শার্লি মাঝে মাঝে ঘুরতে বেরোয়। রনির কাজই হলো নতুন জায়গা খুঁজে বের করা, যেখানে শার্লিকে নিয়ে মজা করে গল্প করা যাবে। সে সম্প্রতি এই জঙ্গলের মধ্যে চমৎকার এই পুকুরটির খোঁজ পেয়েছে। সাঁতারের কথা বলতেই লাফিয়ে উঠেছে শার্লি, তারপর দুজনে মিলে চলে এসেছে এখানে।

পুকুরে নামার আগে শার্লির ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখল রনি। সোয়েটার ভেদ করে ইঁদুরের দাঁত কামড় বসাতে পারেনি মাংসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রনি। হাসল, 'যাক, বাবা। বাঁচা গেল! চলো, সাঁতার কাটি।'

ওরা জামাকাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকচক্ষু কালো দীঘির পানিতে। ঠাণ্ডা স্পর্শে জুড়িয়ে গেল গা। দু'জন পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়ছে, হাসছে, জানে না ঝোপের আড়াল থেকে কিছু একটা দেখছে ওদেরকে। এমন কিছু একটা যা শীঘ্রি ওদের জীবন নরকের চেয়েও দুঃস্বপ্নময় করে তুলবে।

## দুই

ওটা সাঁতার কাটতে দেখছে রনি এবং শার্লিকে। অস্থির হয়ে আছে কখন ওরা ক্লান্ত হয়ে তীরে উঠবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। ওরা ঘুমুলেই ওদের যে কাউকে নিজের হোস্ট বানাতে পারবে সে। তবে ছেলেটাকেই প্রথম পছন্দ তার। কারণ মেয়েটার চেয়ে ছেলেটা লম্বায় বড়, গায়ে গতরেও শক্তিশালী মনে হচ্ছে এবং সম্ভবত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান, শক্তিশালী প্রাণীই তার দরকার।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর ওরা উঠে পড়ল তীরে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। ছেলেটা কী যেন বলল মেয়েটাকে, মেয়েটা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। ছেলেটা তোয়ালে বিছাল মাটিতে। তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়ল। একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল ছেলেটার। মেয়েটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে, আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল তারও। সাঁতার কেটে বেজায় ক্লান্ত দু'জনেই। ঘুমিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওটা। রনি গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেছে, সে ওর শরীরের ভেতর প্রবেশ করল। তবে ঢুকতে একটু কসরত করতে হলো। রনির অবচেতন মন তাকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না। বুদ্ধিমান প্রাণীদের হোস্ট করতে গিয়ে এমন সমস্যায় আগেও পড়েছে সে। চার পেয়ে প্রাণীটার ভেতরে ঢুকতে তার মাইক্রো সেকেন্ড সময়ও লাগেনি। কিন্তু যে প্রজাতি যত বুদ্ধিমান তার কাছ থেকে প্রতিরোধটা আসে তত বেশি। তবে রনির অবচেতন মনকে অবশ করে ফেলতে তার সময় লাগল না। একবার ঘুমের গভীরে চলে গেলে যে

কাউকে কাবু করে ফেলতে পারে সে। এবারও তাই করল। এখন রনির শরীরটা তার একান্ত নিজের, রনির মনকে সে নিজের ইচ্ছামত চালাতে পারবে, ওকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা এখন সে রাখে। রনি তার কাছে সম্পূর্ণ অসহায় এক বন্দী। তার বন্দীত্বের অবসান ঘটবে একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে।

রনির সমস্ত স্মৃতি বা জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করল সে। এই জ্ঞান কাজে লাগাবে সে নিজের প্রয়োজনে, তবে আস্তে ধীরে, রয়ে-সয়ে।

প্রথমেই যে কাজটা করা দরকার তা হলো নিজেকে বা নিজের শরীরটাকে নিরাপদ কোনও জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে। যাতে কেউ এসে তাকে ধ্বংস করতে না পারে।

রনির জ্ঞান এবং স্মৃতির ভাণ্ডার এ কাজে ব্যয় করল সে। খুঁজতে লাগল লুকোবার ভাল জায়গা। এক সময় পেয়েও গেল। আধা মাইল দূরে, গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে একটা গুহা আছে। ছোট গুহা, তবে এটার কথা কেউ জানে না। নয় বছর বয়সে রনি এটা আবিষ্কার করছে। ধরেই নিয়েছে প্রথম আবিষ্কর্তা হিসেবে এ গুহার মালিকও সে। কাউকে এ গুহার কথা বলেনি সে। গুহার মেঝে খটখটে, পাথুরে নয়—বালুময়।

যেন জেগে না ওঠে, এভাবে আস্তে উঠে পড়ল সে শার্লির পাশ থেকে (ইচ্ছে করলে মেয়েটার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে সে। কিন্তু তাতে জটিলতা খামোকা বাড়বে; আর কম শক্তিসম্পন্ন প্রাণীর প্রতি তার তেমন আকর্ষণও নেই)। হাঁটা শুরু করল। রনির পরনে কিছু নেই। তার জুতো, শর্টস, ট্রাউজার, শার্ট—সব পড়ে রইল যেখানে একটু আগে সে শুয়েছিল, সে জায়গায়। ওটা মনে করেছে জামাকাপড় পরার দরকার নেই। কারণ যে কেউ এখানে যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।

ঝোপ ঠেলে রাস্তার ওপাশে যাবার আগ মুহূর্তে পেছন ফিরে

তাকাল সে। মেয়েটা এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ঘুরল সে। দুলকি চালে ছুটল গুহার দিকে।

রনির মনের ভেতর ঢুকে বসে আছে সে, ওর মনের কথা পড়তে পারছে। জেনে অবাক হয়েছে রনি এবং মেয়েটা তাকে রাস্তায় দেখেও কেন থেমে পড়েনি। তাদের দৃষ্টিতে সে সামান্য একটা কচ্ছপ ছাড়া কিছুই নয়। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা কচ্ছপের খোলসের মধ্যে তার বাস। কচ্ছপ সম্পর্কে সে জানে এটা ধীরগতি একটা প্রাণী, বোকাসোকা, কারও সাতে পাঁচে নেই। কচ্ছপটার ওজন আর তার ওজন প্রায় একই–দুই পাউন্ড। তার জানা আছে কচ্ছপ মানুষের কাছে একটি সুখাদ্য বলে বিবেচিত। তবে সচরাচর ক্ষুধার্ত মানুষ ছাড়া কেউ কচ্ছপ ধরতে যায় না। ভাগ্যিস, ওরা ক্ষুধার্ত ছিল না। মেঠো ইঁদুরটাকে সে তার হোস্ট বানিয়েছিল। পরে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটাকে ত্যাগ করেছে। বলা যায় ইঁদুরটাকে বাধ্য করেছে সে রনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। জানত রনি তাকে মেরে ফেলবে এবং সে ইঁদুরের দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে, ঢুকে যেতে পারবে নিজের খোলসে।

শুরুতে বলেছিলাম তার সুনির্দিষ্ট কোনও আকার নেই। কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তার আকার একটা আছে–অনেকটা কচ্ছপের মত দেখতে সে। তবে পৃথিবীর কচ্ছপের মত নয়। মেয়েটা যখন বলল, 'দেখো, একটা কচ্ছপ!' তার আত্মা উড়ে গিয়েছিল ভয়ে। ভাগ্যিস, ছেলেটা তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তা হলেই সর্বনাশ হত। ওরা টের পেয়ে যেত আদৌ সে কচ্ছপ নয়। কচ্ছপের খোলসের নীচে হাত, পা, মাথা কিছুই নেই। ওরা যদি আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে খোলটা ভেঙে ফেলত বা ফাটিয়ে ফেলত, ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে, তা হলে কোনও হোস্টের ওপর আশ্রয় করেও বাঁচতে পারত না সে, মারা যেত সাথে সাথে। কারণ কাউকে মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ

করার সময় সেই জিনিস বা প্রাণীর নিজস্ব অস্তিত্ব বা সত্তা বলে কিছু থাকে না।

ছুটতে ছুটতে রনির সেই গুহায় চলে এল সে। গুহাটা ছোট, ভেতরে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। চারপাশে ঝোপঝাড় ওটাকে ঢেকে রেখেছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল সে।

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তবে রনির চোখ দিয়ে সে ভালই দেখতে পাচ্ছে। রনির স্মৃতি থেকে চমৎকার একটা ছবি পাচ্ছে সে জায়গাটার। (এখানে একটা কথা বলা দরকার, সে যখন কারও ওপর সিন্দবাদের ভূতের ওপর সওয়ার হয়, তখন হোস্টের উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়েই সে সব কিছু দেখে এবং শোনে। কাজেই হোস্ট যদি ক্ষীণ দৃষ্টির হয় তারও দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।) গুহাটা তেমন বড় নয়, ফুট বিশেক হবে লম্বায়, সবচে' চওড়া জায়গা হচ্ছে মাঝখানটা, ছয় ফুটের মত। এখানে একজন মানুষ মোটামুটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গুহার মাঝখানে এসে ওটা রনিকে দিয়ে মাটি খোঁড়াল। মাটি মানে বালু। নয় ইঞ্চি মত গর্ত করার পর রনি কচ্ছপরূপী ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে ওখানে কবর দিল। গর্তের বালু এমনভাবে বুজিয়ে দিল বোঝার উপায় থাকল না এখানে কিছু একটা আছে। তারপর রনি সাবধানে বেরিয়ে এল গুহা থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছতে মুছতে। সবশেষে, গুহা মুখের বাইরে, ঝোপের আড়ালে বসে রইল চুপচাপ।

তাড়াহুড়ার কিছু নেই। নিজেকে নিরাপদেই লুকিয়ে রেখেছে সে। এখন রনির জ্ঞানভাণ্ডার শুষে নেবে সে। যদিও রনির আই কিউ তেমন প্রখর নয়, ইতিমধ্যে বুঝে গেছে সে, তারপরও রনি আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যতটুকু জানে, ওটুকু জানলেও তার চলে যাবে। কারণ তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় রনির এই জ্ঞানটুকু অল্পসময়ের জন্য হলেও কাজে লাগানোর মত।

# তিন

ঘুম ভেঙে শার্লি রকফিল্ড দেখল রোদের তেজ মরে গেছে, আবছা আঁধার নামছে জঙ্গলে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল ছ'টা বাজে। তার মানে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। এখান থেকে ওর বাড়ি আধ-ঘণ্টার হাঁটা পথ। বাপ-মা হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছে আদরের মেয়ে এখনও আসছে না কেন ভেবে।

পাশ ফিরল সে, রনিকে জাগাবে। কিন্তু রনি নেই পাশে। জামা-কাপড় এলোমেলো পড়ে আছে। হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে কাছে কোথাও, ভাবল শার্লি। ওর ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল সে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেও রনি ফিরল না দেখে উদ্বেগ বোধ করল শার্লি। পায়ে স্যান্ডেল চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাম ধরে ডাকল, 'রনি! কোথায় তুমি?'

কোনও সাড়া নেই। শুধু মাটিতে পাতা পড়ার খসখস শব্দ ছাড়া আশ্চর্য নীরব প্রকৃতি। আচ্ছা, রনি ওকে ভয় দেখাবার জন্যে কোথাও লুকিয়ে নেই তো? হঠাৎ, 'হাউ' করে বেরিয়ে আসবে ঝোপের আড়াল থেকে। নাহ্, রনি অমন করবে না।

কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়? জামা-কাপড় ছাড়া যাবেই বা কতদূর? নাকি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে? কোনও কারণে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ল না তো? রনির স্বাস্থ্য খুব ভাল। মৃগীরোগ নেই ওর। আর যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়–তা হলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে (মারাও যেতে পারে রনি, এ কথা ভাবলেও বুকে কাঁপন ধরে)। ওর যদি গোড়ালি মচকে যায় বা পা ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলেও তো শার্লির ডাকে সাড়া দেয়ার কথা। কিন্তু কোনও

সাড়া নেই কেন?

টেনশনের চোটে মুখ শুকিয়ে গেল শার্লির, বুকের ভেতর পাঁজরের গায়ে দমাদম হাতুড়ির মত পিটছে হৃৎপিণ্ড। সে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে বেরিয়ে এল চারপাশে তাকাতে তাকাতে। হাঁটছে, সেই সাথে উঁচু গলায় ডাকছে রনির নাম ধরে। আধ-ঘণ্টা পরে, আশেপাশের প্রায় একশো গজ জায়গা খুব ভালভাবে খুঁজেও রনির টিকিটিও চোখে না পড়ায়, এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল শার্লি। এতদূরে রনি হয়তো আসেওনি।

ওর সাহায্য দরকার, বুঝতে পারল শার্লি। এবার বাড়ির পথ ধরে প্রায় দৌড় শুরু করল। তিন মাইল রাস্তা একটানা দৌড়াবার পর, পরিশ্রম এবং টেনশনে প্রায় নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা। ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ওর বাবা। ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে, শার্লি?'

কেঁদে ফেলল শার্লি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে উঠে দাঁড়ালেন র‍্যালফ রকফিল্ড। বললেন, 'কাঁদিস না, মা। দেখছি কী করা যায়।'

তিনি তখুনি ফোন করলেন রনির বাবা, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন বেরেটকে। সবকথা শুনে মুখ অন্ধকার করে ফেললেন বেরেট। শুধু বললেন, 'তুমি থাক বাড়িতে, আসছি আমি।'

ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন জন বেরেট। তারপর ওয়ারড্রোব খুলে রনির পুরানো একজোড়া মোজা বের করে পকেটে ঢোকালেন। তাঁর কুকুর টাইগারকে মোজার গন্ধ শুকিয়ে রনির খোঁজে বেরুবেন। তারপর লণ্ঠন, দেশলাই ইত্যাদি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

ডগ হাউসের সামনে ঘুমাচ্ছে টাইগার। আস্তানাটা রনিই ওর জন্যে বানিয়ে দিয়েছিল। টাইগারের বয়স সাত, সাদায় কালোয় মেশানো রং, বিশাল আকারের এক হাউন্ড। সে শিকারের গায়ের

গন্ধ শুঁকে তাকে খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। তার সবই ভাল, শুধু গাড়িঘোড়া ভয় পায়। বলা যায়, যান্ত্রিক বাহনটার প্রতি তার প্রচুর অ্যালার্জি আছে।

'চলরে, টাইগার,' ডাক দিলেন জন। 'কাজ আছে।'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হাউন্ড। তারপর মনিবের পিছু পিছু এগোল রকফিল্ডের খামার বাড়ির দিকে। ততক্ষণে সাঁঝ নেমে গেছে পুরোপুরি।

র‍্যালফ রকফিল্ড লণ্ঠন আর শটগান নিয়ে রেডি ছিলেন, বন্ধুকে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তাঁর সাথে শার্লিও আছে।

কোনও শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না। জন জিজ্ঞেস করলেন শার্লিকে, 'এই রাস্তাটা মোড় ঘুরে ব্রিজের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে না?'

'জ্বী, আংকেল, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। দেখিয়ে দেব রনির জামা কাপড়গুলো কোথায় পড়ে আছে।'

'তোমাকে যেতে হবে না, শার্লি,' শান্ত গলায় বললেন তার বাবা, 'তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। টাইগারই আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।'

বাপের মুখের ওপর কথা বলার সাহস নেই শার্লির। সে বাধ্য মেয়ের মত ঘরে ঢুকল। ওঁরা দুজন কুকুরটাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। দিনের আলোর মত পরিষ্কার চারদিক। লণ্ঠন না আনলেও চলত।

'বন্দুক কেন, র‍্যালফ?' প্রশ্ন করলেন জন। 'শটগান কী কাজে লাগবে?'

'রাতের বেলা জঙ্গলে বন্দুক ছাড়া পথ চলতে আমি ভরসা পাই না,' জবাব দিলেন র‍্যালফ। 'কে বলতে পারে কখন কী ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। এক মুহূর্ত পরে আবার বললেন,

'আমি রনির কথা ভাবছি, ওকে যদি খুঁজে পাই।'

'অবশ্যই খুঁজে পাব।'

'ভাবছি ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। এভাবে লুকোচুরি করে বনে-বাদাড়ে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। তুমি কী বল?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন জন। চুপচাপ হেঁটে চললেন তাঁরা। হঠাৎ দেখলেন দূর থেকে একজোড়া আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে, গাড়ির হেড লাইট। জন চট করে টাইগারের কলার চেপে ধরলেন, রাস্তা থেকে টান মেরে সরিয়ে দিলেন। আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে জানোয়ারটা, কাঁপছে থর থর করে। গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ওকে শক্ত হাতে ধরে রইলেন জন, তারপর আবার হাঁটা ধরলেন।

টাইগারকে আগেই রাস্তা বাতলে দিয়েছিল শার্লি, ওখানে পৌঁছুতে তেমন বেগ পেতে হলো না। শুধু জঙ্গলে ঢোকার পর লণ্ঠন জ্বালাতে হলো। এদিকে গাছপালা এত ঘন যে চাঁদের আলো ডালপালা আর পাতার প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় না। ফলে আঁধার হয়ে থাকে জঙ্গল।

রনির জামাকাপড় আগের জায়গাতেই আছে। ওগুলো দেখে মনে মনে হতাশ হয়ে উঠলেন জন। ভেবেছিলেন এসে দেখবেন রনি ফিরে এসেছে, পোশাক পরে বাড়ি ফিরে গেছে। ওকে আর খুঁজতে হবে না। এবার ভয় লাগল তাঁর। ছেলেটার কিছু হয়নি তো?

টাইগার রনির জামা-কাপড় শুঁকছে, তারপর এগিয়ে গেল রনি যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে। জায়গাটা এক চক্কর দিয়ে ছুটল ঝোপের দিকে। জন দ্রুত রনির জামা-কাপড় নিয়ে ওর পিছু পিছু দৌড় দিলেন। বুঝতে পেরেছেন তিনি, টাইগার রনির ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে, সেদিকেই যাচ্ছে এখন।

## চার

ভিনগ্রহের হন্তারক এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। ইতিমধ্যে রনির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সব শুষে নিয়েছে। সে এখন জানে এ গ্রহের নাম পৃথিবী। পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণাও পেয়ে গেছে সে। জানে এ গ্রহের বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে লবণ পানির সমুদ্র, তবে ডাঙাও কম নেই, সেগুলো সব দেশ আর মহাদেশ।

এ মুহূর্তে যেখানে সে আছে এ জায়গা সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা তার হয়েছে। সে জানে সে একটা গ্রামে চলে এসেছে, সবচে' কাছের শহর চার মাইল উত্তরে। তার জানা আছে জায়গাটির নাম বার্টলসভিল, সাকুল্যে হাজার তিনেক লোকের বাস। এটা উইসকনসিন নামে এক রাজ্যে অবস্থিত, রাজ্যটা আমেরিকা নামের একটি দেশের অংশ। এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বড় একটা শহর আছে, গ্রীনবে। গ্রীনবের একশো মাইল দক্ষিণে মিলওয়াকি, আরেকটি বড় শহর। মিলওয়াকির নব্বুই মাইল দূরে রয়েছে আরও একটি বড় শহর–শিকাগো। এ সব শহরের নাম সে জানে, কারণ রনি ওই শহরগুলোতে গিয়েছিল। তবে বার্টলসভিল এবং তার আশপাশের এলাকা সে ভালই চেনে। এটা তার খুব কাজে লাগবে। তার মনের ছবিতে এ এলাকার বুনো এবং সব ধরনের প্রাণীর ছবি ফুটে আছে। প্রাণীগুলোর ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত নয়। আবার কাউকে হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কার ওপর সওয়ার হতে হবে ভালই জানা আছে তার।

তবে সমস্যা হলো, যার ওপর সে এ মুহূর্তে ভর করে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার ধারণা বা পড়াশোনা নেই বললেই চলে। অথচ তার সবচে' দরকার ইলেকট্রনিক্স ভাল জানে এমন কাউকে। তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কোনও ইলেকট্রনিক্সের ওপর ভর করা। তবে সে লোকের ইলেকট্রনিক্সের পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই চলবে না, জানতে হবে কী ভাবে এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়। কাজটা কঠিন, হয়তো মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে তাকে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, সওয়ার হতে হবে অনেকের ওপর। তবে প্ল্যান মাফিক এগোতে পারলে এ কাজে সফলও একশোভাগ। সে তাই করবে। কারণ তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

পৃথিবীতে তাকে পাঠানো হবে এমন ধারণাও তার ছিল না। আসলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের মর্জি মত ভয়ংকর অপরাধীদের যেখানে খুশি পাঠিয়ে দেন। গ্যালাক্সিতে গ্রহের অভাব নেই। কিন্তু ভিনগ্রহের অপরাধীটির পৃথিবীতে থাকার কোনও ইচ্ছে নেই, সে নিজের বাসভূমে ফিরে যেতে চায়। এখান থেকে ফিরে যেতে পারলে তাকে ক্ষমা তো করা হবেই, বীরের মর্যাদা পাবে সে। কারণ, নির্বাসনে যারা যায়, তাদের একশোভাগের একভাগও বাড়ি ফিরতে পারে কিনা সন্দেহ। সে ফিরতে পারলে নতুন এই গ্রহ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিতে পারবে তার লোকদের। তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সম্ভব হলে সে এখানকার কোনও মানুষ হোস্টকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। তা হলে তার খাতির দেখে কে? অবশ্য নিজের দেশে ফেরা সম্ভব যদি কাজগুলো করা হয় সাবধানে। ধীরে এবং কোনও ভুল না হলে। অবশ্য ইতিমধ্যে সে একটা ভুল করে বসেছে। রনিকে ন্যাংটা অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। রনিকে সাময়িকভাবে সম্মোহন করলেও চলত—লম্বা ঘাসের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রেখে সে চলে যেত ঘুমন্ত মেয়েটার কাছে। তারপর ঘুমের ভান করে শুয়ে

থাকত তার পাশে। তারপর মেয়েটির ঘুম ভাঙলে ওরা চলে যেত যে যার বাড়িতে। পরদিন সকালে রনিকে আবার নিয়ে আসত সে এখানে। রনি তাকে ঘাসের জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে আরও ভাল কোনও জায়গায় রেখে দিত। তারপর সুবোধ ছেলের মত ফিরে যেত বাড়িতে, কারও মনে কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে।

এ কাজটা করলেই ভাল হত। কিন্তু 'ভাল'টা বুঝতে পেরেছে সে অনেক দেরিতে। অবশ্য কাজ একটা এখনও করা যায়। রনির স্মৃতি লোপ করে দিতে পারে সে। কাল সকালে রনিকে পাঠিয়ে দিতে পারে বাড়িতে। তার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী হয়েছিল তার। রনির স্মৃতি সাময়িক ভাবে লোপ করে দেওয়ার কারণে সে কিছুই মনে করতে পারবে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন ওটা অ্যামনেসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ। হয়তো রনিকে নিয়ে দু'একদিন হৈচৈ হবে। তারপর সব থিতু হয়ে গেলে রনিকে সে আবার নিয়ে আসবে নিজের কাছে। নিজের কাজ ফুরোলে রনিকে হত্যা করবে সে। তবে মৃত্যুটা এমনভাবে দেখাতে হবে যেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে রনি। তাতে কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকবে না।

ভিনগ্রহের প্রাণীটার পরিকল্পনায় ছেদ ঘটাল কুকুরের ডাক। রনির চোখ দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে সে তাকিয়ে দেখল দুটো আলো, হেলতে দুলতে আসছে এদিকেই, সেই সাথে শোনা যাচ্ছে ঘেউ ঘেউ। ডাক শুনেই বুঝে ফেলল সে ওটা টাইগার, রনির বাবার কুকুর।

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে দেরি হলো না ভিনগ্রহের প্রাণীর। রনির বাবা ছেলের চিন্তায় কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। নির্ঘাত সেই মেয়েটা বলে দিয়েছে রনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সে ভেবেছিল (বলা যায় রনি ভেবেছে)

কাল সকালের আগে তার খোঁজ পড়বে না। বাবা যে কুকুর নিয়ে রাতের বেলাতেই হারানো ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়বেন কে জানত?

আসছে ওরা, দু'জন পুরুষ, একটা কুকুর। একজন রনির বাবা, অপরজন সম্ভবত শার্লির বাবা। আর কুকুরটা সরাসরি গুহার দিকেই ছুটে আসছে!

ওদের এখান থেকে ভাগাতে হবে, সরিয়ে দিতে হবে। কোনওভাবেই গুহার ভেতর ঢুকতে দেয়া যাবে না। আর একশো গজ দূরে ওরাও নেই, সোজা এগিয়ে আসছে, কুকুরটা অনুসরণ করছে রনির ট্রেইল।

রনি, বা বলা যায় রনির শরীর, উঠে দাঁড়াল লাফ মেরে, ঝোপ ঘুরে ছুট দিল আলোকিত লণ্ঠনের দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দুজনে। টাইগার আনন্দে গরগর করে উঠল, ঝাঁকি খেল শরীর, গলায় বাঁধা চামড়ার বেল্ট ছেড়ে দিতে বলছে মনিবকে। জন বেরেট চেঁচিয়ে উঠলেন—'রনি! কী ব্যাপার?'

নাহ্! গুহার বড্ড কাছে ওরা। ঘুরে দাঁড়াল, রনি আবার দৌড়াতে লাগল, ক্রমে সরে যাচ্ছে গুহার কাছ থেকে, পেছন থেকে জন গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'রনি, রনি, দাঁড়াও।'

রকফিল্ড বললেন, 'কুকুরটাকে ছেড়ে দাও। ওকে ধরে নিয়ে আসুক।'

বেরেটের গলা শুনল রনি, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দিই। আর দু'জনকেই এক সাথে হারাই আর কী!'

ঝড়ের বেগে দৌড়ে ওদের পেছনে ফেলে দিল রনি। আসলে তো আর ও দৌড়াচ্ছে না, ওকে দৌড় করাচ্ছে ভিনগ্রহের প্রাণীটা। নিজের ওপর কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই রনির। ওর শরীরের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা অদৃশ্য জিনিসটা ওকে দিয়ে যা

খুশি করাচ্ছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে রনি সেই আর্টিফ্যাক্ট বা ছুরিটার কাছে চলে এল। ঘন ঘাসের আড়াল থেকে ওটা খুঁজে বেরও করল। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল নিজের কব্জিতে। বাইরেটা জং ধরা হলেও ব্লেডটা যথেষ্ট ধারাল। ডান হাতের পর বাঁ হাতের কব্জিও কেটে ফেলল রনি। দু'হাতের শিরাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, স্রোতের বেগে রক্ত বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়া আঁধার হয়ে এল, দড়াম করে পড়ে গেল ও।

কুকুরটাকে নিয়ে ওরা দু'জন যখন রনির কাছে পৌঁছুলেন ততক্ষণে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে যাত্রা করেছে সে। আর ওদিকে মৃত রনিকে ছেড়ে গুহায়, নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল ভিনগ্রহের হন্তারক।

# পাঁচ

রাতটা দুঃস্বপ্নের মত--কাটল জন বেরেটের। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ-এরচে' করুণ ব্যাপার কী হতে পারে? আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ফোন করে খবরটা দিয়েছেন শার্লিকে। শার্লি যেন মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল এরকম একটা দুঃসংবাদ শুনবে। ওর মন বলছিল রনিকে আর কোনদিন জীবিত দেখতে পাবে না সে। খবরটা শোনার পর থেকে পাথর হয়ে গেছে শার্লি।

এদিকে র‍্যালফ রকফিল্ড খবর দিয়েছেন উইলকক্সের শেরিফকে। বিশ মাইল দূর থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলেন তিনি, সাথে করোনার। ঝোপের আড়াল থেকে শেরিফের লোক রনির

লাশ উদ্ধার করল, স্ট্রেচারে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকাল। শহরে আবার ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স মরদেহ নিয়ে।

বার্টলসভিলের শবাগারে লাশ পরীক্ষা করে করোনার ঘোষণা করল—কাটা কব্জি থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণেই মারা গেছে রনি। এটা স্পষ্ট আত্মহত্যা। কিন্তু প্রশ্ন হলো—রনির মত প্রাণ চঞ্চল, স্বাস্থ্যবান ছেলে আত্মহত্যা করবে কেন? আর অবাক ব্যাপার রনি আত্মহত্যা করেছে ভাঙা, জং ধরা পকেট নাইফ দিয়ে। শেরিফকে জন জানালেন তিনি জীবনেও রনির কাছে ভাঙা ছুরি দেখেননি। তা ছাড়া রনি যখন তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, শপথ করে বললেন র‍্যালফ এবং জন, রনির হাতে কিছুই ছিল না। যেখানে বসে কাজটা করেছে ছুরিটা ওখান থেকেই নিয়েছিল রনি। কিন্তু ও কি আসলেই জানত যে ছুরিটা ওখানেই থাকবে। আর অন্ধকারে ওটার খোঁজই বা পেল কীভাবে সে?

'ঠিক আছে,' বললেন শেরিফ। 'কাল দু'টোর দিকে আমি অনুসন্ধান দল পাঠিয়ে দেব।' র‍্যালফের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ভালকথা র‍্যালফ। আপনার মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে আমার। শুনলাম বিকেলে সে রনির সাথেই ছিল। ওরা একসাথে নাকি সাঁতারও কেটেছে। তার একটা সাক্ষ্য দরকার।'

র‍্যালফ মাথা চুলকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় তার দরকার নেই, শেরিফ। সবার সামনে সেদিনের ঘটনা নিয়ে সাক্ষ্য দিতে বিব্রত বোধ করবে মেয়েটা। সবাই ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে কথা বলছে যেন ঘটনাটার জন্যে শার্লি দায়ী। আমার মেয়েকে আদালতে হাজির করতে পারব না, শেরিফ। সে লজ্জায় মরে যাবে শত শত মানুষের সামনে। ঠিক করেছি এখানে আর নয়। আমার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব সপরিবারে।'

এসব ঝামেলা সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে

গেছে। বাড়িটাকে এত নির্জন আর নিজেকে কখনও এত একাকী, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হয়নি জন বেরেটের। রনিকে নিয়েই ছিল তাঁর সমস্ত স্বপ্ন। ভেবেছিলেন ছেলেটার বিয়ে দেবেন, নাতি-নাতনীর দাদু হবেন, চাঁদের হাট হয়ে উঠবে তাঁর সংসার। হায়, মানুষ যা ভাবে, সবসময়-উল্টোটা ঘটে কেন?

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেরেট। চোখ ছাপিয়ে কান্না আসছে। নাহ্, র‍্যালফের মত তিনিও আর থাকবেন না এখানে। রনি নেই। আপনজন বলতে আর কে রইল তাঁর? এত বড় খামার বাড়ি দিয়ে কী হবে? তিনিও চলে যাবেন সব বিক্রি করে, যেদিকে দু'চোখ যায়।

রাতটা নির্ঘুম কাটল তাঁর চেয়ারে ঠায় বসে। পরদিন সকালে হঠাৎ কী মনে পড়তে মুখ হাত কোনমতে ধুয়েই ছুটলেন র‍্যালফ রকফিল্ডের বাড়িতে।

র‍্যালফ তাঁর বাড়ির পেছনে, ছোট্ট বাগানে মর্নিং ওয়াক করছিলেন, জনকে দেখে ছুটে গেলেন।

'শার্লি কেমন আছে, র‍্যালফ?' ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলেন জন।

'কাল সারারাত ঘুমায়নি। দেখে এলাম ঘুমাচ্ছে। তোমারও দেখছি একই দশা। কিন্তু এত সকালে কী মনে করে?'

'তোমাকে বলতে এসেছি আমি আবার ওখানে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

দিনের আলোতে জায়গাটাতে ভাল করে চোখ বুলাতে চাই। আমার মন বলছে আমরা কিছু একটা মিস করে এসেছি। জিনিসটা কী জানি না, তবে শেরিফ অনুসন্ধান চালাবার আগেই একবার ওখানে ঢুঁ মারতে চাই।'

'চলো, আমিও তোমার সাথে যাব।'

টাইগারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জন। অপেক্ষা করলেন র‍্যালফ পোশাক বদলে আসা পর্যন্ত। তারপর তিনজনে মিলে আবার যাত্রা শুরু হলো।

নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে ভিনগ্রহের হন্তারকের। হোস্টকে তার হত্যা না করলেও চলত। ওকে স্রেফ অজ্ঞান করে রাখলেই হত। জ্ঞান ফিরে আসার পর রনির কিছুই মনে পড়ত না। ওরা হয়তো তখন রনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেত। ডাক্তার রনির আকস্মিক স্মৃতি ভ্রংশের ব্যাপারটা ধরতে না পারলে যেত মনোবিজ্ঞানীর কাছে। এতে ভিনগ্রহের হন্তারকের ভাল হত। সে জানে বার্টলসভিল বা উইলকক্সে কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট নেই। রনিকে নিয়ে যেতে হবে গ্রীনবে বা মিলওয়াকিতে। তাতে ওসব জায়গা সম্পর্কে জানতে পারত ভিনগ্রহের প্রাণীটি। ওখানে নতুন, রনির চেয়ে বুদ্ধিমান হোস্ট পেয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না।

তবে নিজেকে কৃতকর্মের জন্যে বেশি দোষ দেয়াও যায় না। কারণ পৃথিবী নামের এ গ্রহে একেবারেই নতুন সে। সবকিছু বুঝে উঠতেও তো সময়ের প্রয়োজন।

এখন যে জায়গায় আছে সে, এখানকার সবচে' বড় সমস্যা হলো এদিকে মানুষ হোস্ট পাওয়া তার জন্যে খুবই কষ্টের হবে। এসব জঙ্গলে লোকজন কদাচিৎ আসে শিকার করতে। তবে সে যেখানে আস্তানা গেড়েছে, তার রেঞ্জের চল্লিশ গজের মধ্যে তারা যে এসে সুখে নিদ্রা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই নতুন কোনও মানুষ হোস্ট পেতে হলে প্রথমে তাকে জানোয়ার হোস্ট ব্যবহার করতে হবে। সেই জানোয়ারটাকে পাঠাতে হবে ঘুমন্ত মানুষের কাছে। তবে এতে ঝুঁকি আছে। অবশ্য এ ধরনের ঝুঁকি নিতে সে অভ্যস্ত। রনির স্মৃতি ঘেঁটে সে দেখেছে এদিকে হরিণের আনাগোনা প্রচুর। হোস্ট হিসেবে পাখিদেরকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা চিকেন হক বা পেঁচা। তবে

পেঁচা তার ওজন নিয়ে উড়তে পারবে কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই তার।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে হোস্ট হিসেবে পাখিই হবে তার উপযুক্ত। হরিণ-টরিণ পথ চলতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু পাখিদের এসব ঝামেলা কম। পাখি হয়ে উড়ে, সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত মানুষের ওপর সওয়ার হবে সে, তারপর পাখিটাকে মেরে ফেলবে। আর নতুন হোস্টের কাজ হবে তাকে এখান থেকে নিরাপদ কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলা।

তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এবার সে আস্তে-ধীরে ভেবেচিন্তে কাজ করবে। যাতে আর কোনও ভুল করে না বসে। তার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মোটামুটি দশ মাইল দূরত্ব থেকেও সে মানুষ বা যে কোনও প্রাণীর হাঁটা-চলা বা নড়াচড়া টের পায়। যেমন এই মুহূর্তে সে মাটিতে কম্পন টের পাচ্ছে—বুঝতে পারছে বড় ধরনের কিছু একটা এগিয়ে আসছে তার আস্তানার দিকে। একটা নয়, দু'টো। একটু পর সে বুঝতে পারল দুটোও নয়, আসলে তিনটে প্রাণী হেঁটে আসছে। সে তার উপলব্ধি ক্ষমতা প্রয়োগ করল। এরা সেই তিনজন, গত রাতে টমির খোঁজে যারা এসেছিল। রনির বাবা, সেই মেয়েটির বাবা আর কুকুরটা। সোজা এগিয়ে আসছে গুহার দিকে। ওদের কথা শুনে বোঝা গেল রনির ট্রেইল ধরে আসার কারণ। ওরা জানতে চায় রনি কালরাতে দৌড়ে আসার আগে আসলে কোথায় ছিল।

কিন্তু কেন? এটা জেনে ওদের কী লাভ? কিন্তু ওরা যেভাবে গন্ধ শুঁকে আসছে তাতে সে ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ করে যদি গুহার মেঝে খুঁড়ে ফেলে। ভিনগ্রহের প্রাণী রীতিমত অসহায় বোধ করল দেখে কুকুরটা ওদেরকে টেনে নিয়ে এসেছে ঠিক গুহামুখে। সে শুনতে পেল মেয়েটার বাবা অর্থাৎ র‍্যালফ বলছে, 'গুহাটা দেখে মনে হচ্ছে রনি এর মধ্যে ঢুকেছিল।'

রনির বাবা জন বললেন, 'আমারও তাই ধারণা। আমিও

ঢুকে দেখতে চাই ভেতরে কী আছে।'

'এক মিনিট, জন,' বাধা দিলেন র‍্যালফ। 'গুহার ভেতর কী আছে আমরা কেউ জানি না। আগে টাইগারকে পাঠাই। ভিতরে কিছু থাকলে ও আমাদের সাবধান করে দেবে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলেন জন। টাইগারের বাঁধন খুলে দিলেন। কুকুরটা এক লাফে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক মিনিট পর, টাইগারের তরফ থেকে কোনও সাবধান বাণী এল না দেখে দুই বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন গুহায়। গুহার মাঝামাঝি জায়গায় এসে থামলেন। এখানে শুয়ে আছে টাইগার। গুহার এ জায়গাটা বেশ প্রশস্ত এবং উঁচু, দাঁড়ানো যায়। আলো কম হলেও মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা।

'বোঝাই যায় রনি এ গুহায় ঢুকেছিল,' বললেন র‍্যালফ, 'এ পর্যন্ত এসেও ছিল। কারণ টাইগার ওর গায়ের গন্ধেই এখানে এসেছে। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা আর নীরব। এসো, দু'মিনিট জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।'

ওরা বসে পড়লেন গুহার মেঝেতে, ভিনগ্রহের হন্তারক নজর দিল কুকুরটার ওপর। ক্লান্ত টাইগার আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে এবার কাজে লাগাতে হবে। তবে এখন না, একটু পরে।

'ভাবছি, রনি এখানে এসেছিল কেন?' নীরবতা ভেঙে বললেন জন।

'এটা তো সহজ যুক্তি, জন। অবচেতন মনে এখানে চলে এসেছিল ও। হয়তো ছোটবেলায় এ গুহাটা আবিষ্কার করেছিল রনি, হঠাৎ কোনও কারণে লুকোতে এসে পড়েছিল। অবচেতন মনে মানুষ কত কিছুই তো করে।'

'হয়তোবা। কিন্তু ওর লুকোবার দরকার পড়েছিল কেন? নাকি কোনও লুকানো জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল রনি।

কী জিনিস জানতে চেয়ো না, তবে এ গুহার নরম বালি কিন্তু হাত দিয়ে খোঁড়া যায়।'

'কিন্তু লুকোবেটা কী সে? আর খুঁড়তেই বা যাবে কেন?'

'জানি না আমি। তবে তেমন কিছু যদি আমাদের চোখে পড়ত—'

আর সময় নেই। লোকগুলো যেভাবে সন্দিহান হয়ে উঠেছে এখনই হয়তো মেঝে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেবে। তা হলেই সর্বনাশ। ভিনগ্রহের হন্তারক মনোযোগ দিল ঘুমন্ত টাইগারের ওপর। দু'জনকে হয়তো খুন করা সম্ভব হবে না টাইগারের পক্ষে, তবে আকস্মিক হামলায় ওরা নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত হয়ে যাবে, মেঝে খোঁড়ার কথা আর মনে থাকবে না। উল্টো দৌড়াতে হবে ডাক্তারের কাছে টাইগারের কামড়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষতের চিকিৎসা করতে।

টাইগারের ওপর সওয়ার হলো ভিনগ্রহের প্রাণী। ঘুম থেকে জেগে উঠল জানোয়ারটা, মাথা তুলল। সেই মুহূর্তে র‍্যালফ বললেন, 'এখন খোঁড়াখুঁড়িতে কাজ নেই, জন। মেঝে খুঁড়ে কিছু পাব বলেও মনে হয় না। আর পরিষ্কার কিছু দেখাও যাচ্ছে না। আমাদের না আছে ফ্লাশলাইট না কোদাল বা বেলচা। আর এখন মেঝে খুঁড়তে গেলে লাঞ্চের আগে বাড়ি ফিরতে পারব না। তারচে' এখন বাড়ি যাই চলো। খোঁড়াখুঁড়ি যদি করতেই চাও, পরে রেডি হয়ে আসব'খন।'

বন্ধুর কথায় সায় দিলেন জন। টাইগার আবার মাথা নামিয়ে নিল। দু'বন্ধুর পেছন পেছন বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ওদের সাথে বেশ খানিকটা পথ এক সাথে হাঁটল, হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পুবে, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করল সে। জন কত ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু কান দিল না টাইগার। আপন মনে দৌড়াতে লাগল।

মনিবের দৃষ্টির আড়াল হতেই লাফ মেরে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল

টাইগার, তারপর এগোল গুহা অভিমুখে।

গুহায় ঢুকে নরম বালু খুঁড়ল টাইগার, কচ্ছপের খোলস বা ভিনগ্রহের হন্তারককে মুখে তুলে নিল। বেরিয়ে এল গুহা থেকে, খোলসটাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল জমিনে। তারপর আবার গুহায় ঢুকল সে, একটু আগে খোঁড়া গর্তটাকে বুজিয়ে দিল সতর্কতার সঙ্গে। তারপর বোজানো গর্তের ওপর গড়াগড়ি খেল কয়েকবার। বোঝার উপায় রইল না এখানে কোনও গর্ত আছে। তারপর আবার কচ্ছপের খোলসটাকে মুখে তুলে নিল টাইগার। প্যাট্রিজ পাখির চেয়ে ভারি নয় ওটার শরীর, আর এত আলতোভাবে ধরে রেখেছে টাইগার যেন আহত পাখি মুখে করে নিয়ে চলেছে।

জঙ্গলে ঢুকল কুকুর, রাস্তা এমনকী গেম ট্রেইলও এড়িয়ে চলল, অত্যন্ত নির্জন জায়গা খুঁজছে। ঘন, লম্বা ঘাস, চারদিকে ঝোপের বেড়ার আড়ালে ছোট, ফাঁপা একটা কাঠের গুঁড়ি পেয়ে গেল। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে এখানে লুকিয়ে থাকার কাজ চলবে। মুখ থেকে কচ্ছপের খোলটাকে ফাঁপা কাঠের গর্তে রাখল টাইগার, থাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে ওটাকে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কারও বোঝার সাধ্য নেই এখানে গুঁড়ি আছে।

তারপর যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে চলল টাইগার। একশো গজ যাবার পর বসে পড়ল। ভিনগ্রহের হন্তারক তখন ভাবছে কী করা যায়।

ভিনগ্রহের প্রাণী এখন নিরাপদেই আছে। ওই লোকগুলো এখন সমস্ত গুহা খুঁড়ে ফেললেও তার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু কথা হলো, কুকুরটাকে সে কি আরও কিছুক্ষণের জন্যে নিজের হোস্ট করে রাখবে? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল সে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছল—জানোয়ারটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এখনও ওটাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে অন্য কারও ওপর সওয়ার হতে পারবে না। এখন তার দরকার অন্য কোনও হোস্ট। হতে পারে সেটা বাজ,

পেঁচা বা হরিণ। কিন্তু এগুলোকে ভালমত পর্যবেক্ষণ করার সময় সে পাবে না যতক্ষণ টাইগারের ওপর সওয়ার হয়ে থাকবে। কাজেই ওর মরে যাওয়াই ভাল।

টাইগার এবার রাস্তায় উঠে এল। দাঁড়িয়ে থাকল এক কোণে। দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে। ড্রাইভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, গাড়িটা তার সামনে আসতেই, চাকা লক্ষ্য করে লাফ দিল টাইগার। সাথে সাথে পিষে ভর্তা হয়ে গেল কুকুরটা।

টাইগারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভিনগ্রহের হন্তারক, আশ্রয় নিল নিজের খোলের মধ্যে। ভেবে আমোদিত হলো এবার সে আর কোন ভুল করেনি।

হ্যাঁ, ভুল তার হত না, যদি গাড়িটার আরোহী ড. সি. আর. আবরার না হয়ে অন্য কেউ হত। তার আসলে অপেক্ষা করা উচিত ছিল অন্য গাড়ির জন্য। কারণ, ভিনগ্রহের হন্তারকের জানা নেই টাইগারকে ড. সি. আর. আবরারের গাড়ির নীচে ফেলে দিয়ে আসলে সে নিজের নিয়তিকেই ডেকে এনেছে।

## ছয়

ড. সি. আর. আবরার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি'র পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। পিএইচডি করতে আমেরিকায় আসার পরে আর দেশে ফিরে যাননি। ডক্টরেট নেয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে গেছেন। অসম্ভব মেধাবী, পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষটিকে বেঁটেই বলা যায়—টেনেটুনে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি হবেন। তাঁর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল রাতের মত

কালো, মাঝেমধ্যে ঝিলিক দেয় দু'একটি রূপোলি কেশ। চিরকুমার এই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া। কোনও কারণে রেগে গেলে বা অবাক হলে ও দুটো বাদামী হিরের মত ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে।

এ মুহূর্তে তিনি ছুটিতে আছেন। তাঁর পরনে ঢিলেঢালা পোশাক, মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। দেখে বোঝার উপায় নেই এ মানুষটি দেশের সবচে' পণ্ডিত ব্যক্তিদের একজন।

টাইগার যে তাঁর গাড়ির নীচে চাপা পড়ল, এ জন্যে আবরারকে মোটেই দোষ দেয়া যায় না। কুকুরটা যেন শূন্য থেকে উদয় হয়েছিল তাঁর সামনে। তিনি ব্রেকও কষেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেই দফারফা হয়ে গেল টাইগারের।

পশুপ্রেমী প্রফেসরের জানোয়ারটার দশা দেখে বেশ মন খারাপ হলো। কার কুকুর এটা? প্রফেসর ঠিক করলেন শহরে নিয়ে যাবেন লাশ। খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবেন কুকুরের মালিকের। তারপুলিন দিয়ে টাইগারের লাশ ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন আবরার।

বার্টলসভিলে পৌঁছে দু'এক জায়গায় খোঁজ নেয়ার পর জানা গেল এটা জন বেরেটের কুকুর। তবে জন বাড়ি নেই। আদালতে গেছেন ইনকোয়েস্টে। আবরার ওখানেই রনির কথা জানতে পারলেন। শুনলেন জনের একমাত্র ছেলে রনি আত্মহত্যা করেছে।

আদালতে গিয়েও জনকে পাওয়া গেল না। শুনানি শেষে মরচুয়ারিতে গেছেন ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে। আবরার তখন শেরিফের সাথে কথা বললেন। কুকুরটা হঠাৎ আবরারের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন শেরিফ। বললেন, 'যদ্দূর জানি জনের কুকুরটা ছিল কারশাই জাতের। গাড়ি দেখলে এক মাইল দূর থেকে ছুটে

পালাত।'

'তাই নাকি?' অবাক হলেন আবরারও। 'তা হলে কুকুরটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে ওভাবে ছুটে আসবে কেন আমার গাড়ি লক্ষ্য করে। ভাল কথা–আপনাদের এলাকায় র‍্যাবিস রোগের কোনও কেস আছে?'

'বহুদিন হলো আমরা ও রোগটার কবল থেকে মুক্ত, মি. আবরার,' নীরস গলায় জবাব দিলেন শেরিফ। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডক্টর, তারপর বললেন, 'শুনলাম রনি নামে একটা ছেলে মারা গেছে। ওর কি অটোপসি করা হয়েছে?'

'অটোপসি? কেন, কীসের জন্য? ও তো আত্মহত্যা করেছে।' ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন শেরিফ।

'এখানে আর কোনও অদ্ভুত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, শেরিফ?'

কৌতুকের দৃষ্টিতে ডক্টরের দিকে তাকালেন শেরিফ।

'অদ্ভুত বলতে কী বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। এখানে গত কয়েক বছরে কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ওগুলো এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। তবে সেগুলো ছিল স্রেফ ডাকাতির জন্যে খুন। ওসবের মধ্যে অদ্ভুত কোনও ব্যাপার ছিল না। কিছু মনে করবেন না, মি. আবরার, আপনি কি ভার্সিটিতে অপরাধ বিজ্ঞান পড়ান?'

'না,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন আবরার। 'আমি পদার্থ বিজ্ঞান পড়াই। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমি স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের ওপরেও কিছু কাজ করেছি।'

'তার মানে রকেট?' শেরিফের গলার স্বরে সম্ভ্রম ফুটল।

'না, রকেট না। বেশিরভাগই স্যাটেলাইটের ডিটেকটর এবং ট্রান্সমিটিং সেট নিয়ে কাজকারবার। আমি প্যাডলহুইল স্যাটেলাইটের ডিজাইনও করে থাকি। তবে এ মুহূর্তে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত।'

'বেশ, বেশ! কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'এখান থেকে মাইল দশেক দূরে এক খামার বাড়িতে। জায়গাটার নাম ওল্ড বার্টন প্লেস...'

'হেস্টিংস-এর খামার বাড়ি তো? চিনেছি। হেস্টিংস-এর সাথে আগে দু'একবার মোলাকাত হয়েছে। তা একা নাকি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?'

'বিয়ে-থা করিনি এখনও। একা থাকতেই ভাল লাগে। যাকগে, শেরিফ। আজ উঠি। জনের কুকুরের লাশটা নিয়ে গেলাম। ওকে বলবেন আমি লাশ কবর দিয়ে দেব।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন ড. আবরার। মনটা খচখচ করছে। রনি আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আত্মহত্যার ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইছে না তাঁর যুক্তিবাদী মন। মানুষ প্রাথমিক কোনও লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারে না বা আত্মহত্যাও করে না। আর কুকুরটা নিশ্চয়ই র‍্যাবিস আক্রান্ত ছিল। নইলে অমন উন্মাদের মত আচরণ করবে কেন? শেরিফ বললেন ওটা গাড়ি-ঘোড়া ভয় পেত। তা হলে, আবরারের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন? ওটাও আত্মহত্যা? কিন্তু লেমিং ছাড়া অন্য কোনও পশু আত্মহত্যা করে বলে শোনেননি আবরার।

হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন ডক্টর গ্রীনবে-র গবেষণাগারে কুকুরটার লাশ পাঠাবেন পরীক্ষার জন্যে তা হলে জানা যাবে টাইগারের র‍্যাবিস ছিল কি না। গ্রীনবে এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। আর এখন বাজে মাত্র তিনটা। তিনি গ্রীনবের হাসপাতালে টাইগারের লাশ পরীক্ষার জন্যে রেখে আসার প্রচুর সময় পাচ্ছেন হাতে। সন্ধ্যেটা ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে, তারপর ছবি দেখে সকাল সকাল ফিরে আসা যাবে বাড়িতে।

তাই করলেন আবরার। গ্রীনবের হাসপাতালে গেলেন টাইগারের লাশ নিয়ে। ডিনার খেলেন, ব্রিজিত বার্দোর একটি

সিনেমা দেখলেন, তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ, উইলকক্সে, তাঁর বন্ধুর হেস্টিংস-এর খামার বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িটি বেশ বড়, ওপর তলায় তিনটি বেডরুম, যদিও দুটো রুম শুধু ফার্নিশড করা। একটা বাথ। নীচতলায়ও তিনটে ঘর, বড় একটা কিচেন, লিভিং রুমটাও বেশ বড়সড়, আর বাড়তি একটা কামরা আছে, স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ঘরে আবরার তাঁর বন্দুক এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম রেখে দিয়েছেন। বেজমেন্টে ছোট গ্যাসোলিন ইঞ্জিনচালিত জেনারেটর আছে, বিরতিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। একই ইঞ্জিনের সাহায্যে পাম্প করে ছাদের ট্যাঙ্কিতে পানি তোলার ব্যবস্থা আছে। এ বাড়িতে ফোন নেই, তবে প্রফেসরের তাতে কোনও অসুবিধেও নেই। বরং তিনি খুশি ফোন নামের মূর্তিমান যন্ত্রণাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। এ বাড়ির দক্ষিণ দিকে একসময় খামার ছিল, কোনও কারণে ওটা এখন পরিত্যক্ত। বাড়ির চারপাশে উঠোন, মিশেছে ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের সাথে, জায়গাটাকে রহস্যময় এবং বুনো করে তুলেছে। উত্তর দিকে শুধু একটা রাস্তা, শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তবে ওদিকেও ঘন জঙ্গল।

সবমিলে জায়গাটা ডক্টরের এতদিন ভালই লাগছিল, শুধু আজকের রাতটা ছাড়া।

আবরার ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করে একটা রহস্য উপন্যাস নিয়ে বসলেন। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলেন না। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে তাঁর। এখানে আসার পর এই প্রথম খুব একা এবং নিঃসঙ্গ লাগছে। জানালার পর্দা নামিয়ে দেয়ার একটা দুরন্ত ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলেন তিনি। কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি তাঁকে বাইরে থেকে লক্ষ করছে। কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে কে তাঁকে লক্ষ করবে? কোনও জানোয়ার? জানোয়ার হলেই বা কি এসে যায়? কেউ তাঁকে

দেখছে, ভাবনাটা নিজের কাছেই এক সময় হাস্যকর ঠেকল। তিনি জোর করে পড়ায় মন দিলেন। খানিক পর খেয়াল করলেন বইয়ের পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু একটা লাইনও পড়ছেন না। বারবার রনি আর কুকুরটার কথা মনে পড়ছে। শেষে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন আবরার। কাল তো টাইগারের রিপোর্ট পাওয়াই যাবে। যদি দেখেন কুকুরটার সত্যি সত্যি র‍্যাবিস হয়েছিল, তা হলে ব্যাপারটা চুকে গেল। এ নিয়ে আর ভাববেন না। ছুটি কাটাতে এসেছেন। মজা করে ছুটি কাটিয়ে চলে যাবেন...কিন্তু টাইগারের যদি র‍্যাবিস ধরা না পড়ে...

আরও এক ক্যান বিয়ার গলায় ঢাললেন প্রফেসর, একসময় ঝিমুনি ভাব এল। বিছানায় গেলেন তিনি। খানিক পর ঘুমিয়েও পড়লেন।

## সাত

ভিনগ্রহের হন্তারক এখনও সেই ফাঁপা কাঠের গুঁড়ির মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে। টাইগার তাকে এখানে রেখে যাবার পর থেকে সে আস্তানা ছেড়ে একপাও নড়েনি। শুধু একবারের জন্যে একটা কাকের ওপর ভর করেছিল। আশপাশের এলাকা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল তার। রাতের বেলা ঘুমন্ত এক কাকের ওপর সওয়ার হয় সে। কিন্তু কাক রাতে ভাল দেখতে পায় না বলে ওই সময় আর বেরোয়নি সে। বেরিয়েছে সকালে। কাকের চোখ দিয়ে আশপাশের অনেকটা এলাকা মোটামুটি জরিপ করে এসেছে। দেখেছে কোন্ ধরনের লোকজনের বাস এখানে। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় উড়ে গিয়েছিল কাক। ওখানে

একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। বার্টলসভিলের ওপরে চক্কর দিয়েছে বারকয়েক। তাকে সবচে' আকর্ষণ করেছে রেডিও-টিভি মেরামতের একটি দোকান। এ দোকান যে লোক চালায় তার নিশ্চয়ই ইলেক্ট্রনিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। কাজেই এ লোক তার ভাল হোস্ট হতে পারবে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও। কিন্তু রনির স্মৃতি যেটুকু ধারণ করে আছে সে, তাতে রিপেয়ারম্যানের নাম পরিচয় নেই তার। এসব জানতে হলে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বার্টলসভিল পরিক্রমা মোটামুটি শেষ হলে সে কাকটাকে পেভমেন্টের ওপর ডাইভ দিতে বাধ্য করে তাকে হত্যা করেছে। কাকের কাজ শেষ। কাজেই ওটাকে আর জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। কাকের মৃত্যুর সাথে সাথে ভিনগ্রহের হন্তারক ফিরে গেছে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ওই আশ্রয়স্থলটি আগেরটার চেয়ে ভাল। জঙ্গলের একেবারে গভীরে বলে নানা পশুপাখি চেনার সুযোগ তার হয়েছে। প্রাণীগুলো প্রায়ই তার আস্তানার সামনে দিয়ে হাঁটা চলা করছে। হরিণ, ভালুক, ভোঁদর আরও কত কী। কত রকম পাখিও দেখেছে সে। এর মধ্যে দুটো পাখি পছন্দ হয়েছে তার হোস্ট হিসেবে–পেঁচা এবং চিকেন হক। এসব প্রাণীর যে কোনওটার ওপর যে কোনও সময় সে ভর করতে পারে। দশ মাইলের মধ্যে এগুলোর একটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো।

ছোট ছোট প্রাণীও পরীক্ষা করে দেখেছে সে। যেমন সাপ। তবে হোস্ট হিসেবে সাপ পছন্দ হয়নি তার। এগুলোর গতি ধীর–আর মরতেও সময় নেয় বেশি। দেখা গেল রাস্তায় উঠেছে মরতে, গাড়ির জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটাতে চাপা পড়ে গেলেও সাপ যে সত্যি সত্যি মারা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? পিঠ ভেঙে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে সাপ।

কাজেই সে চুপচাপ বসে আছে। কাকে হোস্ট বানানো যায় তাই ভাবছে। এমন সময় তার খিদে পেল। ভিনগ্রহের এই প্রাণীটির খিদেও পায়। তারও পুষ্টির প্রয়োজন। সে যে গ্রহ থেকে এসেছে, ওখানকার অধিবাসীদের জন্ম মূলত পানি থেকে। পানি থেকে সরাসরি মাইক্রোঅর্গানিজম শুষে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। প্রটেকশন বা নিরাপত্তার জন্যে তারা শরীরের ওপর কচ্ছপের খোলের মত খোলস পেয়েছে। অন্যদের হোস্ট বানানো বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তারা পেয়েছে অনেক পরে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সমৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে। তারপর তারা পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে। ডাঙায় যে সব প্রাণী ঘুমাচ্ছিল, তাদের ওপর তারা সওয়ার হয়েছে। ডাঙার প্রাণীদের মেরে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার শুরু করে কয়েকশো কোটি বছর আগে, তাদের গ্রহে। মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী হলেও এদের পুষ্টি প্রয়োজন হয় মানুষের মতই। তবে মোটামুটি একবার খাওয়ার পর কয়েকমাস না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে তারা। পানির বাসিন্দা বলে তরল খাদ্যই এদের প্রিয়। আর খিদে পেলে, খাবার না জুটলে এরা দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, ভিনগ্রহের হন্তারকের এখন খুব খিদে পেয়েছে। কীভাবে খাবার জোগাড় করা যায় তাই ভাবছে। সুপ বা দুধ পেলেই তার চলে যাবে। কিন্তু খাবারটা জোগাড় করে দেবে কে? এ ক্ষেত্রে মানুষ হোস্টকেই তার পছন্দ হলো। আর তার আশপাশে এরকম হোস্ট আছে এক বৃদ্ধ জার্মান দম্পতি হেলমুট এবং নিকোল কোহ্‌ল। ওরা কাছের এক ফার্ম হাউজে থাকে। ওদের কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো। খাবার সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু আগে তো খামার বাড়িতে তাকে পৌঁছতে হবে।

ভিনগ্রহের প্রাণী খামার বাড়িতে যাবার জন্য বেছে নিল এক ঘুমন্ত পেঁচাকে। ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে এল কোহ্‌লদের খামার বাড়ির ওপর।

পেঁচাটা ভিনগ্রহের হন্তারক অর্থাৎ কচ্ছপের খোলাটাকে নখে বাধিয়ে নিয়ে এসেছে। সে বাড়ি ঘিরে একবার চক্কর দিল। ফার্ম হাউজটা অন্ধকার, নীরব। সম্ভবত কুকুর-টুকুর নেই। ভিনগ্রহের অপরাধীর ইচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকবে। লুকোবার চমৎকার জায়গাও পাওয়া গেল—কাঠের সিঁড়ির নীচে, যেটা মিশেছে ব্যাকডোরের সাথে। পাশেই খড়ের গাদা। এখানে আসার কারণ একটাই—এখন থেকে মানুষকে হোস্ট বানানো সহজ হবে তার জন্যে। তা ছাড়া খড়ের গাদার আশপাশে কী ধরনের প্রাণীর বাস তাও দেখা যাবে। প্রয়োজনে গৃহপালিত কোনও প্রাণীর ওপর সওয়ার হবে সে।

পেঁচাটা সিঁড়ির নীচে ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে লুকিয়ে ফেলল। এখন আর ওকে প্রয়োজন নেই। পেঁচাটাকে ডাইভ দেওয়াল সে বাড়ির শক্ত দেয়াল লক্ষ্য করে। তবে ভুল হয়ে গেল। পেঁচাটা ডাইভ দেয়ার সময় চোখ বুজে ছিল। তাই দেয়ালে না লেগে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর। ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। ঝনঝন শব্দে জেগে উঠল কোহ্‌ল দম্পতি। তাড়াতাড়ি নেমে এল বাইরে। একটা পেঁচা মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। বুড়ো হেলমুট বন্দুকের এক গুলিতে পেঁচাটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে রেহাই দিয়ে দিল। বলল, 'বেচারা বোধ হয় অন্ধ। দেখতে পায়নি। তাই ওড়ার সময় জানালায় ধাক্কা খেয়েছে।'

'এটাকে নিয়ে কী করবে এখন?' জানতে চাইল বুড়ি। 'এভাবে ফেলে রাখবে?'

'কাল সকালে কবর দেব,' গরগর করল হেলমুট। 'ব্যাটার জন্য কাল আবার আমাকে শহরে যেতে হবে গ্লাস কিনতে।'

'কাল যেতে হবে না,' বলল তার স্ত্রী। 'শনিবার গেলেই চলবে। আমি ফাঁকা জায়গায় কাপড় টাঙিয়ে দেব। এখন চলো শোবে।'

বুড়ো-বুড়ি ঢুকে পড়ল নিজেদের বেডরুমে। খানিকপর আগের মত আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল গোটা বাড়ি। ভিনগ্রহের প্রাণী দেখল বুড়ো-বুড়ি এখনও ঘুমায়নি। সে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়বে। এই ফাঁকে সে খামার বাড়ির গৃহপালিত প্রাণীগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগল। জানতে চায় হোস্ট হিসেবে কোনটাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে।

এই বাড়িতে শুয়োর আছে একটা, একটা ঘোড়া, তিনটে গরু, কতগুলো ইঁদুর আর একটা বেড়াল। শুয়োর আর ইঁদুরগুলোকে প্রথমেই বাতিল করে দিল সে ওরা কোনও কাজে লাগবে না ভেবে। গরু বরং ওদের চেয়ে ভাল। গায়ে শক্তিও আছে বেশ। ধারাল শিং নিয়ে গরুগুলো যখন তখন কিলিং-মেশিনে পরিণত হতে পারে। ঘোড়াও তাই। গরুর চেয়েও এরা কাজের। দ্রুত দৌড়াতে পারে, সহজে টপকে যেতে পারে ছোটখাট বেড়া। আর ওদের খুরের লাথি শিং-এর গুঁতোর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সবশেষে রইল বেড়াল। এ প্রাণীটাকেই ভিনগ্রহের খুনের পছন্দ হয়ে গেল সবচে' বেশি। রনির ধার করা স্মৃতি থেকে সে জানে চার পেয়ে এই প্রাণীটা বেশ বুদ্ধিমান, রাতের আঁধারে এদের চোখ জ্বলে। এরা গুপ্তচর বৃত্তিতে খুবই পটু, তা ছাড়া বেশিরভাগ সময় ওরা ঘুমিয়ে কাটায় বলে এদের হোস্ট বানানো ভারী সোজা। স্রেফ পরীক্ষা করার জন্য সে একটা ঘুমন্ত বেড়ালের ওপর সওয়ার হলো। জেগে উঠল বেড়াল। সম্মোহিত অবস্থায় হাঁটা দিল। নাহ্, আঁধারে সত্যি চোখ জ্বলে এই প্রাণীটার। সব কিছু দিনের মত দেখতে পাচ্ছে। সে বেড়ালটাকে বাড়ির চারপাশে কয়েকবার চক্কর দেওয়াল। নিঃশব্দে, সামান্য শব্দও না করে বেড়ালটার এই পরিভ্রমণ চমৎকৃত করে তুলল ভিনগ্রহের হন্তারককে। বেড়াল কেমন গাছ বাইতে পারে দেখার জন্য খড়ের গাদার পেছনে একটা গাছে ওটাকে তুলল সে।

সরসর করে গাছের মাথায় উঠে গেল বেড়াল। মগডাল থেকে উঁকি দিল। আরেকটা খামার বাড়ি চোখে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে আছে শহরের দিকে। এখন দেখা যাক বেড়াল কেমন গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। গাছ থেকে বেড়ালটাকে নামাল সে, মাঠ ধরে ছোটাল পাশের খামার বাড়ির দিকে। রাতের আঁধারে ছায়ার মত ছুটে চলল বেড়াল।

ফার্ম হাউজে পৌঁছে দেখল দোতলার দুটো কাঁচের জানালায় আলো জ্বলছে। জানালার পাশে একটা গাছ। বেড়ালটা গাছে উঠল। তারপর উঁকি দিল জানালায়।

ঘরে, খাটের উপর একটা বাচ্চা শুয়ে আছে, কাশছে বেদম। বাথরোব পরা, স্লিপার পায়ে এক মহিলা করুণ মুখ করে ঝুঁকে আছে বাচ্চাটার ওপর। আর পাজামা পরা মোটা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। জানালা বন্ধ থাকলেও বেড়াল ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল। লোকটা মহিলার কাছে জানতে চাইছে ডাক্তারকে ফোন করবে কিনা।

দৃশ্যটা ভিনগ্রহের প্রাণীর মনে কোনও কৌতূহলের সৃষ্টি করল না। তবে সে সন্তুষ্ট হয়েছে বেড়ালের গুপ্তচর বৃত্তিতে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে সে বেড়ালকেই হোস্ট বানাবে। আপাতত এটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাক।

রেহাই মিলল সহজেই। এ খামার বাড়িতে ভয়ানক হিংস্র স্বভাবের একটা কুকুর বাঁধা ছিল শিকল দিয়ে। সে সম্মোহিত বেড়ালটাকে গাছ থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গোলাবাড়ির কোণার দিকে, ওখানেই বাঁধা কুকুরটা, বেড়ালটাকে দেখেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জন ছাড়তে লাগল কুকুরটা। গোলাবাড়ির জানালায় এসে দাঁড়াল বেড়াল, ঘন অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল। তারপর লাফ দিল কুকুরটার হাঁ করা ধারাল চোয়াল লক্ষ্য করে।

## আট

ভিনগ্রহের হন্তারক কোহ্‌লদের গোলাবাড়ির সিঁড়ির নীচে, নিজের শরীরের মধ্যে আবার ফিরে এল। সতর্ক হয়ে লক্ষ করল বাড়িতে কোহ্‌ল আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ আছে কিনা। কুকুর থাকলে ঘেউ ঘেউ করে উঠে ওদের জাগিয়ে দিতে পারে। নাহ্‌ কুকুর নেই, শুধু নীচের ঘরে, সম্ভবত লিভিংরুমে খাঁচায় পোরা একটা ক্যানারি পাখি আছে। ওই ঘরে তার হোস্টের যাবার প্রয়োজন হবে না।

দোতলার বেডরুমে হেলমুট এবং নিকল কোহল ইতোমধ্যে নাক ডাকার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।

হেলমুটের মনের ভেতর ঢুকে গেল ভিনগ্রহের প্রাণী। এক লহমায় জেনে ফেলল অনেক কিছুই।

হেলমুট ক্লাস সিক্স পাস, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই কম। তবে দুটো জিনিস জেনে উপকার হলো ওটার। জানল, হেলমুটের স্ত্রী'র ঘুম অত্যন্ত গাঢ়, কানের পাশে বোমা ফাটলেও সে ঘুম থেকে জাগবে না। আর আসল ব্যাপার হলো–ভিনগ্রহের প্রাণী এতক্ষণ যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। ওদের বাড়ির ফ্রিজে অনেক খাবার আছে। বিশেষ করে সুপ আর গরুর ঝোলের কথা জেনে খিদেটা চাগিয়ে উঠল। ওর পুষ্টির অভাব ঘোচাতে পারবে দুটো জিনিসই। এই দম্পতি ওখানে না থাকলে হয়তো তাকে ফ্রিজ খুলে মাংস রেঁধে ঝোল খেতে হত। তবে সেটা কতটুকু পুষ্টিকর হত সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে ভিনগ্রহের খুনীর।

তার নির্দেশে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল হেলমুট। পা

টিপে টিপে এগিয়ে চলল বেডরুমের দরজার দিকে। সাবধানে খুলল, তারপর সতর্কতার সাথে ভিজিয়ে দিল। এরপর এগোল কিচেনের দিকে।

ফ্রিজ খুলে সুপের জার আর মাংসের বাটি বের করল হেলমুট, দুটো একসাথে ঢালল একটা প্যানে, ভিনগ্রহের প্রাণীটা পেটপুরে যতটুকু খেতে পারে ততটুকু। দুটো তরল পদার্থ এক সাথে মিশিয়ে সে গ্যাসের স্টোভ জ্বালল। অল্প আঁচে গরম করল সুপ আর ঝোলের মিশ্রণটা। তারপর প্যান নিয়ে চলে এল বাইরে, গোলাবাড়ির সিঁড়ির সামনে। ঘন ঝোলের প্যান সিঁড়ির নীচে রেখে কচ্ছপের খোলটাকে বের করে আনল, ছেড়ে দিল তরলটার মধ্যে। তারপর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ঝোল খেতে খেতে ভিনগ্রহের প্রাণী হেলমুটের মনের আরও গভীরে ঢুকে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বের করে আনতে লাগল।

হেলমুটের বয়স পঁয়ষট্টি। সে একাচোরা স্বভাবের মানুষ। তার কোনও বন্ধু নেই। সে কাউকে পছন্দ করে না। অন্যরাও তাকে পছন্দ করে না। এমনকী তার স্ত্রীও নয়। একে অন্যের প্রতি কারও বিন্দুমাত্র টান নেই। তারপরও দু'জনে একই ছাদের নীচে আছে স্রেফ ভিন্ন কারণে। নিকোল কোহ্‌লের যাবার কোন জায়গা নেই, নিজের রোজগার করার সামর্থ্যও নেই। আর হেলমুটের তাকে দরকার সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়ার জন্যে।

তাদের দুই ছেলেমেয়ে। তবে কেউই তাদের সাথে থাকে না, হেলমুটের অত্যাচারে তারা বাড়ি ছেড়েছে অনেক আগেই। তারা শহরে থাকে। মাঝে মাঝে মাকে চিঠি লিখত। কিন্তু হেলমুট স্ত্রীকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে চিঠির জবাব দিতে। তারপর থেকে দু'পক্ষের কারও সঙ্গেই কোনও যোগাযোগ নেই। নিকল কোহ্‌ল জানেও না তার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায়

# নয়

ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন ড. আবরার, চিৎ হলেন, চোখের সামনে হাত এনে ঘড়ি দেখলেন।

সাড়ে দশটা বাজে। বাজতেই পারে। কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন তিনি। যাক, এবার গ্রীনবে-তে ফোন করে জানা যাবে কুকুরটার সুরতহাল রিপোর্ট।

মুখ হাত ধুয়ে বার্টলসভিলের স্থানীয় একটা ড্রাগস্টোরে ঢুকে গ্রীনবে-র হাসপাতালে ফোন করলেন আবরার। জানা গেল, কুকুরটার র‍্যাবিস হয়নি। আর তার শরীরে কোনও রোগও ধরা পড়েনি যার কারণে সে মাথা খারাপ হয়ে গাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। ঘটনাটা শেরিফকে জানানো দরকার। তিনি হয়তো ব্যাপারটাতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। কফি খেয়ে, ড্রাগস্টোর থেকে ফোন করলেন উইলকক্সে, শেরিফকে। অফিসেই পাওয়া গেল তাঁকে।

'ড. আবরার বলছি, শেরিফ,' বললেন প্রফেসর। 'জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে। এখানে আসতে পারবেন নাকি আমি যাব আপনার অফিসে?'

'আমি এক্ষুণি বার্টলসভিলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।' জবাব দিলেন শেরিফ, 'কোত্থেকে বলছেন আপনি।'

'ড্রাগস্টোর থেকে। পাশের পাবে ঢুকছি আমি। আসুন, ড্রিঙ্ক খেতে খেতে কথা বলি।'

শেরিফ জানালেন আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছেন তিনি।

এখানে প্রায়ই লাঞ্চ বা ডিনার করতে আসেন ডক্টর। হ্যানস উইস নামের এক মুদি দোকানদারের কাছ থেকে নিয়মিত গ্রোসারি কেনেন। পাবে মাঝে মাঝে পোকারও খেলেন। ফলে স্থানীয় লোকজনের সাথে দোস্তী হয়ে গেছে তাঁর। ড্রাগস্টোরের মালিকের সাথে গতরাতেও পোকার খেলেছেন তিনি। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'শেরিফকে ফোন করলেন শুনলাম, ডক। কোনও সমস্যা নয় তো?'

'আরে না! ওখানে কিছু খবর দেয়ার জন্যে ফোন করা।'

'ভাল কথা, ডক। আপনি তো বাসকোম্ব রোডে থাকেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার। 'হ্যাঁ। রাস্তার শেষ বাড়িটাতে। 'কেন?'

'আপনাদের ওদিকে কালরাতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। শুনেছেন?'

ডক্টরের ঘাড়ের পেছনে কী যেন একটা কিলবিল করে উঠল। 'না, শুনিনি। এই মাত্র শহরে ঢুকেছি। কে মারা গেল?'

'এক বুড়ো। হেলমুট। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকত লোকটা। আপনার বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। বুড়োর মৃত্যুতে কেউ তেমন মন খারাপ করেনি। কারণ কারও সাথেই সদ্ভাব ছিল না লোকটার।'

ওষুধের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে শুধু এটুকুই জানা গেল, বুড়ো শটগান মুখে পুরে আত্মহত্যা করেছে। আর মরার আগে একটা চিরকুট লিখে গেছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাবে ফিরে এলেন ডক্টর আবরার। বিয়ারের অর্ডার দিলেন। খানিক পর শেরিফ এসে ঢুকলেন পাবে। আবরারকে বিয়ার খেতে দেখে বললেন, 'টেনশনে আছি। শুধু বিয়ারে চলবে না। ডাবল বুরবনের অর্ডার দিন।'

বারটেন্ডারকে ডাবল বুরবনের অর্ডার দিয়ে শেরিফের দিকে

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন প্রফেসর।

'হেলমুটের কথা বোধহয় শুনেছেন,' বললেন শেরিফ। 'কাল অনেক রাতে ওখান থেকে বাসায় ফিরেছি। ঘুমাতেই পারিনি। গড, ভয়ানক ক্লান্ত আমি। এখন আবার কোহ্‌লের বাড়ি ছুটতে হবে।'

'আমি যদি আপনার সাথে যাই অসুবিধা আছে?' জানতে চাইলেন আবরার।

'না, অসুবিধা নেই। ফোন করেছিলেন কেন? কোহ্‌ল সম্পর্কে কথা বলতে?'

'না, ফোন করার আগেও আমি ব্যাপারটা জানতাম না। জনের কুকুরটাকে নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি। ওটার র‍্যাবিস হয়নি।'

শেরিফ ঝোপের মত ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি চেক করেছেন নাকি? কুকুরটা কাউকে কামড়েছে?'

'না। কাউকে কামড়ায়নি। তবে কুকুরটা কার-শাই ছিল জানার পর ওটার প্রতি আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। জানতে চাই জানোয়ারটা অন্ধের মত কেন আমার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। র‍্যাবিস থাকলে না হয় এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।'

'আঁরে, একটা সামান্য কুকুর নিয়ে এত ভাবছেন কেন আপনি? এ ধরনের কুকুর প্রায়ই গাড়ি চাপা পড়ছে। হয়তো খরগোশ ধরতে গিয়ে ওটা আপনার গাড়ির নীচে পড়েছে। এ নিয়ে নিশ্চয়ই রাতের ঘুম হারাম করছেন না আপনি?'

'না, তা নয়। তবে–আচ্ছা, শেরিফ, কোহ্‌লের আত্মহত্যার ঘটনায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনার?'

'তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। তবে দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠেছে। গড, রক্ত আর মগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা-তা অবস্থা।'

'কোনও মামলা বা ইনকোয়েস্ট হবে না?'

'কীসের ভিত্তিতে? কোহ্ল নিজের হাতে লিখে গেছে সে আত্মহত্যা করেছে।'

ড্রিংক খেতে খেতে টুকটাক আরও কথা হলো। শেরিফ পেঁচা এবং বেড়ালের কথাও জানালেন। পেঁচা এবং বেড়ালের মৃত্যুর কথা শুনে ডক্টর কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠলেন, লক্ষ করলেন না শেরিফ।

# দশ

হেলমুট কোহ্ল আত্মহত্যা করার পর যে ঘটনাগুলো ঘটল, তা খুবই অবাক করে তুলল ভিনগ্রহের হন্তারককে। তার ধারণাতেও ছিল না একটা মানুষ, যে চিরকুট পর্যন্ত লিখে গেছে স্বইচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে, তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ হবে।

হেলমুট মুখে বন্দুক পুরে ট্রিগার টেপার পরের দৃশ্যগুলো ভিনগ্রহের প্রাণীর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। হেলমুটের স্ত্রী গুলির শব্দে জেগে যায়, নীচে নেমে স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার সে কী চিৎকার। তখুনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যায় সে প্রতিবেশী লুরসাটদের (যাদের বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা আছে) খবর দিতে। লুরসাট পরিবার সাথে সাথে শেরিফকে ফোন করে। ঘণ্টাখানেক পরে শেরিফ এসেছে। হেলমুটের স্ত্রীকে নানা জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। নিকোল কোহ্ল কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলেছে স্বামী চিরকুটে আত্মহত্যার কথা লিখলেও তার মনে পড়ে না বাতরোগটা হেলমুটকে অত বেশি কি কাবু করেছিল যে নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে?

ভিনগ্রহের প্রাণী মানুষগুলোর আচরণ যত দেখেছে ততই অবাক হয়েছে। যে লোক আত্মহত্যা করেছে, আত্মহত্যার

কারণও ব্যাখ্যা করে গেছে, তার মৃত্যুকে ঘিরে এত প্রশ্ন কেন সবার?

পরদিন দুপুরে শেরিফ আবার এলেন হেলমুটের বাড়িতে। এবার তাঁর সাথে আরও একজন আছেন। লোকটির সাথে বিধবা কোহ্লের পরিচয় করিয়ে দিলেন শেরিফ। লোকটির নাম আবরার, পেশায় বিজ্ঞানী, বার্টলসভিলে এসেছেন ছুটি কাটাতে। রনির রহস্যময় আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তিনি এ মৃত্যুর একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজছেন। আর হেলমুটের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর কৌতূহল আরও বেশি বাড়িয়ে দেয়। কারণ এত অল্প সময়ে দু'টো আত্মহত্যার ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। আবরার এ ব্যাপারে বিধবা নিকোল কোহলের সাথে দু'একটা কথা বলতে চান। অবশ্য তিনি যদি অনুমতি দেন তা হলে।

নিকোল কোহ্ল কথা বলতে আপত্তি করল না। শুধু তাই নয় সে ওদের জন্যে কফিও বানিয়ে আনল।

ছোটখাটো আবরারের কৌতূহল অপরিসীম। কমপক্ষে একশো প্রশ্ন করলেন তিনি নিকোল কোহলকে। নিকোল কোহ্ল সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল। লুরসাটদের বাড়িতে বেড়ালের মৃত্যু বা ফ্রিজ থেকে সুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হবার ব্যাপারগুলো আবরারকে কৌতূহলী করে তুলল।

আবরার এবং কোহ্লের কথোপকথন সবই শুনতে পাচ্ছে ভিনগ্রহের প্রাণীটি। লোকটার ব্যাপারে সে আগ্রহ বোধ করছে। কী ধরনের বিজ্ঞানী এই লোক? একে হোস্ট বানালে কেমন হয়? এ নিশ্চয়ই বার্টলসভিলের টেলিভিশন মেকানিকের চেয়ে চৌকস হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল এ লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কোথায় থাকে জানা দরকার। তাকে হোস্ট বানালে কতটুকু উপকারে সে আসবে তাও জানা দরকার। তবে আবরার নামের লোকটিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তার আর হলো না।

কারণ সে প্রশ্নপর্ব শেষ করে উঠে পড়েছে, চলে যাচ্ছে শেরিফের সাথে নিজের গাড়িতে, ক্রমশ সরে যাচ্ছে রেঞ্জের বাইরে।

যাক, ক্ষতি নেই। সে এরকম হোস্ট বহু পাবে। শেরিফ এবং আবরার মিসেস কোহলের সাথে অনেক কথাই বলেছেন। ভিনগ্রহের হন্তারক জানতে পেরেছে মিসেস কোহ্ল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খামার বাড়ি বিক্রি করে তার ছেলে বা মেয়ের কাছে চলে যাবে। তার মেয়ে মার্থা শেষ চিঠিটি মাকে লিখেছিল সিনসিনাটি থেকে, ছেলে ম্যাক্স থাকত মিলওয়াকিতে। শেরিফ মহিলাকে কথা দিয়েছেন তার ছেলে-মেয়েদের ঠিকানা খুঁজে বের করবেন। কাজটা তাঁর পক্ষে সহজ। কারণ ওই দুটি রাজ্যের পুলিশ শেরিফের বন্ধু মানুষ।

মিসেস কোহ্ল খামার বাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছে তার প্রতিবেশী লুরসাটদের কাছে। তা করুক। তাতে ভিনগ্রহের প্রাণীর কোনও অসুবিধে নেই। একবার ভেবেছিল মিসেস কোহ্লকে তার হোস্ট বানাবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। কারণ মিসেস কোহ্লকে হোস্ট করা মানে তাকে হত্যা করা। মিসেস কোহলের মৃত্যুও অ্যাক্সিডেন্টের আদলে ঘটানো যায়। কিন্তু তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি। কারণ খামার বাড়িতে পরপর দুটি মৃত্যু লোকজনের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সে সবসময় অপেক্ষাকৃত ভাল হোস্ট খুঁজছে। শেরিফ নিকোল কোহ্লের চেয়ে হোস্ট হিসেবে অনেক ভাল। কিন্তু সে এখানে থাকে না, তাকে উইলকক্সে, অনেক দূরে, তার রেঞ্জের বাইরে। আপাতত এ শহরে তার রেঞ্জের মধ্যে আছে রেডিও টেলিভিশন রিপেয়ারম্যানটা। তবে ওর কাছে যেতে হবে অন্য হোস্টের ওপর নির্ভর করে, এমন একজন হোস্ট যে গুপ্তচরের কাজ করতে পারে চমৎকার। আর এ কাজে বেড়ালের তুলনা নেই।

কাজেই সে খামার বাড়ির ঘুমন্ত এক বেড়ালকে টার্গেট করল আবার।

## এগারো

দুপুরের ঠিক আগে আগে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো বার্টলসভিল শহরে। রেডিও এবং টেলিভিশন রিপেয়ারম্যান বিলি র‍্যামন তার দোকানের জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল। ভাগ্য ভাল খাবার নিয়ে এসেছে। লাঞ্চ করতে আর বৃষ্টিতে ভিজে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে।

বিলি র‍্যামনের ব্যবসার অবস্থা ভাল না। আকণ্ঠ ডুবে আছে দেনার বোঝায়। তিন বছর আগে ভুল একটা সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন তাকে। ভেবেছিল বার্টলসভিলে রেডিও টিভি সারানোর দোকান দিলে খদ্দেরের অভাব হবে না। এ শহরের সবার বাড়িতেই রেডিও আছে, কিছু লোকের টিভি রেডিও দুটোই আছে। তবে সমস্যা হলো এ শহরের লোকের রেডিও নষ্ট হয় না বললেই চলে, আর যাদের টিভি আছে তারা সেটের সামনে বসে খুব কমই।

বিলি র‍্যামনের বয়স বত্রিশ, লম্বা, রোগাটে গড়নের এই যুবক সব সময় চোখে চশমা পরে। সর্বদা হাসি মুখ করে থাকার জন্যে শহরের লোক তাকে পছন্দ করে। কালে-ভদ্রে রেডিও বা টিভি নষ্ট হলে বিলি র‍্যামনকে দিয়েই সেটা মেরামত করায়। তবে ঘটনাগুলো যেহেতু সচরাচর ঘটে না তাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ মা এবং নিজের পেট চালাতে হিমশিম খেতে হয় বিলি র‍্যামনকে। হোলসেলারের কাছ থেকে টিউব আর নানা পার্টস বাকিতে নিতে নিতে এখন আর কেউ তাকে বাকি দিতে চায় না।

অন্য কোথাও গিয়ে যে চাকরি করবে, সে রকম কাজও তো নেই। তা ছাড়া অসুস্থ মা বিলি র‍্যামনের সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না। তাকে রেখে দূর দেশ যেতেও মন চায় না বিলি র‍্যামনের। সব মিলে খুব সমস্যায় আছে বেচারা।

জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল আর নিজের পোড়া কপাল নিয়ে ভাবছিল বিলি র‍্যামন, ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। বেঞ্চির ওপর বসে টেনে নিল র‍্যাপারে মোড়া গরম কফির থার্মোফ্লাস্ক আর এক জোড়া স্যান্ডউইচ। একটা পিনাট বাটার, অন্যটা জেলি মাখানো। পয়সা খরচের ভয়ে সে মাংসের পুর দেয়া স্যান্ডউইচ খায় না বহুদিন হলো। তিন মাস আগে, ওয়াল্টার শ্রোয়েডারের টিভি ঠিক করে দেয়ার পর লোকটা ওকে স্মোকড হ্যাম খাইয়েছিল। সে স্বাদ জিভে লেগে আছে এখনও।

পিনাট বাটার শেষ করে জেলি স্যান্ডউইচে কামড় বসাল বিলি র‍্যামন, একই সাথে কাপে ঢেলে নিল গরম কফি। ঠিক তখন জানালায় কিছু একটা আঁচড় কাটার শব্দ শুনে ওদিকে তাকাল সে। একটা বেড়াল। সাইড জানালার পাশে বসে একটা থাবা দিয়ে খচর-মচর আঁচড় কাটছে কাচে। বেড়ালটা আকারে বিশাল। কুচকুচে কালো। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, যেন সাঁতার কেটে এসেছে। জানালার কাছে গেল বিলি র‍্যামন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বেড়ালটার দিকে। এ বেড়ালটাকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। 'কীরে কী চাস?' জিজ্ঞেস করল বিলি র‍্যামন। বেড়াল তার পছন্দের প্রাণী।

বেড়ালটাকে মনে হলো অভুক্ত। বৃষ্টিতে ভিজে লোম সেঁটে গেছে গায়ে। বিলি র‍্যামনের প্রশ্নের জবাবে মুখ হাঁ করল ওটা, সম্ভবত ম্যাও বলল, বন্ধ জানালা দিয়ে শোনা গেল না আওয়াজ। আবার থাবা আঁচড়াল সে জানালায়।

'ভেতরে আসবি?' বলে জানালা খুলে দিল বিলি র‍্যামন। এক লাফে ভেতরে চলে এল কালো বেড়াল। দরজা বন্ধ করে বিলি

র‍্যামন আবার তাকাল বেড়ালটার দিকে। 'খিদে পিয়েছে?' আপন মনে প্রশ্ন করল সে। 'নে এটা খা।' আধ খাওয়া, জেলি মাখানো স্যান্ডউইচটা ছুঁড়ে দিল সে বেড়ালকে। এক কামড়ে স্যান্ডউইচ গিলে ফেলল বেড়াল।

'তেষ্টাও পেয়েছে বুঝি?' বলে সিঙ্ক থেকে এক বাটি পানি এনে দিল ওকে বিলি র‍্যামন। বেড়ালটা চুকচুক করে পানি খেল। সিঙ্কে দুটো তোয়ালে ঝুলছে। একটাতে কালিঝুলি মাখা। ওটা দিয়ে বেড়ালটার গা মুছতে লাগল। আরামে চোখ বুজে এল বেড়ালের। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে বিলি র‍্যামন, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। জবাব দিল বিলি র‍্যামন, 'বিলি র‍্যামন বলছি, রেডিও এন্ড টিভি রিপেয়ারম্যান।'

'ক্যাপ হেডেন বলছি, বিলি র‍্যামন,' ক্যাপ হেডেন জেনারেল স্টোর চালায়, পাশাপাশি পোস্ট মাস্টারের দায়িত্বও পালন করছে। 'শিকাগো থেকে একটা প্যাকেজ এলে ফোন করতে বলেছিলে। এসেছে ওটা।'

'দারুণ, ক্যাপ। আসছি আমি এক্ষুণি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছু টাকাও নিয়ে এসো। ওটা ছাড়াতে আমার সাত ডলার লেগেছে।'

'এইরে, সেরেছে। শোনো ভাই, ডলফ মার্শের টিভি'র জন্যে একটা টিউবের দরকার ছিল। সেটাই তোমার ঠিকানায় এসেছে। টিভি'র কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। শুধু টিউবটা লাগানো বাকি। ডলফ আমাকে নগদ পেমেন্ট করবে বলেছে। সমস্যা হলো আমার কাছে এ মুহূর্তে তিন ডলারের বেশি নেই। তুমি যদি বাকি টাকাটা ধার হিসেবে রাখো তা হলে বড় উপকার হয়, ভাই। কথা দিচ্ছি, ডলফ পেমেন্ট করা মাত্র তোমার টাকা দিয়ে দেব।'

'কথাটা মনে থাকে যেন। নগদ চাই আমি।'

'মনে থাকবে। ধন্যবাদ, ক্যাপ। আসছি আমি।'

দেয়ালের হুক থেকে কোট আর হ্যাটটা নিতে নিতে বিলি বেড়ালকে বলল, 'শোন, আমি একটু বেরুচ্ছি। চলে আসব এক্ষুণি। তুই ততক্ষণ থাকতে পারিস। বৃষ্টি কমলে চলে যাস। বলতে লজ্জা নেই তোকে রাখার মত সামর্থ্য আমার নেই। যখন রাখার ক্ষমতা হবে তোর মত বেড়াল আমি পুষব। এখন গেলাম রে।'

বিলি র‍্যামনের বকরবকানিতে কোনও ভাবান্তর ঘটল না বেড়ালের চেহারায়। বিলি র‍্যামন দরজা বন্ধ করে চলে যাবার পর সে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। ঘরে খানদুয়েক টেলিভিশন, চেসিস, নানা বাজে পার্টস ছাড়া কিছু নেই। রদ্দি মাল দেখে যেন হতাশই হলো বেড়াল। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই মাল নিয়ে চলে এল বিলি র‍্যামন। এসে দেখে বেড়ালটা একটা খোলাপাতার দিকে মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওটা ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বিষয়ক বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

'কীরে, ইলেক্ট্রনিক্সের ওপর খুব আগ্রহ দেখছি তোর।' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে হাসল বিলি র‍্যামন, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডলফ মার্শের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

কাজ করতে করতে বেড়ালটার সাথে আপন মনে কথা বলতে লাগল বিলি র‍্যামন। সবই তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে গল্প।

বেড়ালটা ভাল শ্রোতা। মনোযোগ দিয়ে বিলি র‍্যামনের দুঃখের পাঁচালি শুনে গেল। এদিকে বিলি র‍্যামনের কাজ শেষ। সে সেট রেখে উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। বেড়ালটা একবার 'মিউ' করে ডেকে ছুট দিল দরজার দিকে। বেড়ালটাকে ভালই লেগেছে বিলি র‍্যামনের। ওটাকে বিদায় দিতে খারাপ লাগছে এখন। সে দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'যখন মন চায় চলে আসবি। দরজা বন্ধ

থাকলেও জানালা খোলা থাকবে। খিদে পেলেই চলে আসবি। একসাথে লাঞ্চ করব, কেমন?'

বেড়াল কিছু না বলে বেরিয়ে গেল, এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার ওপারে।

হয়তো কারও পোষা বেড়াল, ভাবল বিলি র‍্যামন। বাড়িতেই গেছে। ক্ষমতায় কুলোলে সে-ও একদিন অমন একটা নাদুস-নুদুস বেড়াল পুষবে।

কিন্তু বিলি র‍্যামন কোনদিনই জানবে না অল্পের জন্য অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। বেড়ালরূপী যমের তাকে হোস্ট হিসেবে পছন্দ হয়নি বলে ওটা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

## বারো

বার্টলসভিলে পরপর দুটো আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে রীতিমত রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন ড. আবরার। সারাটা সকাল তাঁর গেছে এ ঘটনা দুটোর ওপর নোট তৈরি করতে। কিন্তু তিনি চান গল্পের আকারে স্টেটমেন্ট লিখতে। তিনি ডিকটেশন দেবেন, অন্য কেউ লিখে দেবে। সমস্যা হলো এ শহরে তাঁর পরিচিত এমন কোনও টাইপিস্ট নেই যে নির্ভুল ইংরেজিতে তাঁর ডিকটেশন লিখে নিতে পারে।

হঠাৎ এড হোলিসের কথা মনে পড়ে গেল প্রফেসরের। বার্টলসভিলের একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্ল্যারিয়ন'-এর সম্পাদক। আবরারের পুরানো বন্ধু। সাথে সাথে এড হোলিসের অফিসে চলে গেলেন আবরার। শর্টহ্যান্ড জানা একজন দক্ষ টাইপিস্টের কথা তাঁকে বলতে এড মিস শিলা রহমানের কথা বললেন। জানালেন মিস শিলা এখানকার হাইস্কুলে ইংরেজি

পড়ায়, টাইপ তার পার্ট টাইম জব। সে শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং-এ খুবই দক্ষ। আর ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী বলে তার ভাষাও চমৎকার। শিলার বাবা আমেরিকান, মা বাঙালি। রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন দুজনেই। সে একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্টে একা থাকে। তার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই। গড়গড় করে তথ্যগুলো দিলেন এড। ছোট্ট এ শহরে একটি বাঙালি মেয়ে একা জীবন-যুদ্ধে টিকে আছে শুনে আবেগে আপ্লুত হলেন আবরার।

'ঠিক এরকম একজনকে দরকার আমার।' বললেন প্রফেসর। 'কোথায় পাব তাকে?'

এড বললেন, 'আচ্ছা, দেখছি।'

টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে একটা নাম্বার বের করলেন তিনি। তারপর ওই নাম্বারে ফোন করলেন। 'মিস রহমান? আমি এড হোরিস। শুনুন, আমার এক বন্ধুর কয়েকদিনের জন্যে আপনাকে দরকার। টাইপ আর শর্টহ্যান্ডের কাজ। পারবেন?... বেশ। এক সেকেন্ড ধরুন।'

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে এড ফিরলেন বন্ধুর দিকে। 'মিস রহমান বলছেন, যখন খুশি তুমি তাঁকে পেতে পার। ইচ্ছে করলে আজই কথা বলতে পার। একটার দিকে যেতে পারবে? ঠিকানা আমি বলে দেব।'

'তা হলে তো ভালই।'

এড হোরিস আবার ফোনে কথা বলতে লাগলেন, 'ঠিক আছে, মিস রহমান। আমার বন্ধু একটার দিকে আপনার সাথে দেখা করবে।...ওকে, বাই।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন এড। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ভদ্রমহিলা তাঁর রেট তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছেন। দিনে দশ ডলার। অথবা ঘণ্টা প্রতি দেড় ডলার।'

'অসুবিধে নেই। এখন ঠিকানাটা বলো। আমি একটার মধ্যে

পৌঁছে যাব তোমার মিস রহমানের কাছে।'

কাঁটায় কাঁটায় একটায় মিস শিলা রহমানের বাসায় এলেন আবরার। শিলা অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। দরজা খুলেই বলল, 'ড. আবরার?'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার।

'ভেতরে আসুন, প্লীজ,' আহ্বান জানাল শিলা। মিস শিলা রহমানের বয়স ত্রিশের কোঠায়। আবরারের চেয়ে লম্বা সে, পাঁচ ফুট ছয়, হালকা-পাতলা গড়ন, চোখে স্টিলরিমের চশমা, পরনে পরিচ্ছন্ন ধূসর রঙের পোশাক। চুলের রঙ বাদামী, এক বেণীতে বাঁধা। ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে।

এখন মাথায় একটা হ্যাট আর হাতে একটা ছাতা ধরিয়ে দিলেই স্টুয়ার্ট পামারের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র হয়ে উঠত শিলা রহমান।

'বসুন, ডক্টর,' বলল শিলা, 'আমার নোটবুক নিয়ে আসি-'

'ইয়ে, মিস শিলা। এখানে ডিকটেট করতে পারলে ভালই হত। তবে মনে হয় আমার বাসায় বসে কাজটা আরও ভালভাবে করতে পারব। এখান থেকে মাইল আটেক দূরে আমার বাসা, শহরের শেষ মাথায়, বাসকোম্ব রোডে। আপনি ওখানে বসে ডিকটেশন নিয়ে এখানে এসে টাইপ করবেন। সমস্যা হবে কোনও? আমি অবশ্য একা থাকি-' শেষ দিকে আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি।

মুচকি হাসল শিলা। 'এ পৃথিবীতে আমরা সবাই একা, ডক্টর, ওতে কোনও সমস্যা হবে না। চলুন, যাওয়া যাক।'

শিলা নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে ডক্টর আবরারের সাথে তাঁর স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসল।

হোস্ট হিসেবে বেড়ালের তুলনা নেই, ভাবছে ভিনগ্রহের খুনী। ওরা নিঃশব্দে চলে, দ্রুত গতিসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিও প্রখর,

যেকোনও সময় যে কোনও জায়গায় যাবার ক্ষমতাও রাখে। তাই মার্জার শ্রেণীটাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার।

বিলি র‍্যামনের দোকানে কালো বেড়ালটাকে সে-ই পাঠিয়েছিল চর হিসেবে। শেরিফ আর সেই ছোটখাট লোকটা, আবরার–ওরা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তার মনে। একটা চড়ুইকে পাঠিয়েছিল সে আবরারের গাড়ির পিছু পিছু। কিন্তু চড়ুইটা গাড়িটাকে এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেলে। তারপর সে একটা কালো বেড়ালকে হোস্ট করে। বেড়ালটাকে দিয়ে সারা শহর চক্কর দিয়েছে সে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে বেড়ালটা। তারপর সে একটা ধূসর রঙের ক্ষুদে বেড়ালকে হোস্ট বানিয়েছে। বেড়াল পেতে তার কষ্ট নেই। কারণ এদিকে খামার বাড়ির ছড়াছড়ি। আর ওসব খামার বাড়ি থেকে একটা দুটো বেড়াল নিয়ে আসা কোনও ব্যাপার নয়।

ধূসর বেড়ালটাকে সে কাজে লাগিয়েছে শহরের বাইরের খামার বাড়িগুলোতে অনুসন্ধানের জন্যে। তার ধারণা, আবরার নামের সেই লোকটি কোনও খামার বাড়িতে থাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ধূসর বেড়াল যখন হাল ছেড়ে দিয়ে দুটো ফার্ম হাউজের মাঝখানের একটা মাঠ দিয়ে আসছে সকাল এগারোটার পরে, হঠাৎ পুবদিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে সে তাকিয়ে দেখে, একটা পুরানো স্টেশন ওয়াগন শহরের দিকে যাচ্ছে। আর ড্রাইভিং সিটে বসে আছে আবরার স্বয়ং।

ভিনগ্রহের প্রাণী ততক্ষণে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে আবরার নামের লোকটি শহরের শেষ মাথার খামার বাড়িতে বাস করে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ধূসর বেড়ালকে সে পাঠিয়েছে বাড়ির হাল-হকিকত জানতে।

বেড়াল বেশ কয়েকবার চক্কর দিল গোটা বাড়ি। জেনারেটর চলছে দেখে বোঝা গেল আবরার আবার ফিরে আসবে এ বাড়িতে। সম্ভবত একাই থাকে সে এখানে; নাকি কাউকে রেখে

গেছে সে তার অবর্তমানে?

বাড়িতে ঢোকার রাস্তা খুঁজল বেড়াল। নেই। নীচতলায় জানালা অনেক, তবে দু'এক ইঞ্চি মাত্র ফাঁক করা। ঢোকা যাবে না। শুধু ওপরের তলার একটা জানালা খোলা।

বেড়াল বাড়িটার গন্ধ শুঁকল, কান পাতল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তার মানে এখানে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি থাকে না।

ভিনগ্রহের হন্তারক এবার বেড়ালটাকে বিশ্রাম দিল। উঠোনের এক প্রান্তে, ঝোপে ঘুমিয়ে পড়ল বেড়াল। কোনও শব্দ কানে গেলেই জেগে উঠবে সাথে সাথে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। আবরার এসেছে তার স্টেশন ওয়াগন নিয়ে। তবে একা নয়, সাথে এক মহিলাও আছে।

মহিলাকে চিনতে পারল ভিনগ্রহের প্রাণী। রনির স্মৃতিতে এ মহিলার কথা ছিল। এর নাম শিলা রহমান, রনির হাইস্কুলের ইংরেজির টিচার। মহিলা আবরারের বান্ধবী নাকি? হাতে আবার শর্টহ্যান্ড নোটবুকও দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল মিস শিলা অবসরে টাইপিং বা বুক কিপিং-এর কাজ করে বাড়তি দু'পয়সা কামায়। তার মানে ওকে এখানে নিয়ে আসার কোনও উদ্দেশ্য আছে আবরারের। বেশ তো, আবরার যদি মহিলাকে চিঠি লেখার ডিকটেশন দেয় তাহলে চিঠির বিষয় শুনে আবরারের সম্পর্কে সে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

ওরা ঘরে ঢোকামাত্র বেড়ালটা বাড়ির চারপাশ চক্কর দিতে শুরু করল। প্রতিটি জানালায় গিয়ে কান পাতল ওদের কথা শোনার আশায়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।

ভেতরে ঢোকারও উপায় নেই। জানালা বন্ধ। দোতলার জানালা খোলা থাকলেও অত উঁচুতে লাফ দিয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দৌড়ে পেছনের দরজায় গেল। ওটা রান্নাঘরের দরজা। কান পাতল। কিন্তু দরজার পাল্লা এত ভারী যে ভেতরের

লোকজনের কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বাড়িটা চক্কর দিল বেড়ালটা। রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে আবরার মিস রহমানকে কী ডিকটেশন দেয় জানার জন্যে। হঠাৎ গাছটা চোখে পড়ল তার। আগে দেখেনি। এলম বৃক্ষ। গাছটার মগডাল গিয়ে ঠেকেছে দোতলার খোলা জানালার কাছে। বেড়াল চট করে উঠে পড়ল গাছে। ডাল বেয়ে সাবধানে এগোল জানালার দিকে। তারপর লাফ দিল।

এটা বেডরুম। তবে আবরার ব্যবহার করে বলে মনে হলো না। সে জানালার দিকে তাকাল। জানালার কাছে নুয়ে পড়া ডালটার চারফুট ওপরে উঠে গেছে সে লাফ দিয়ে নামবার সময় ঝাঁকি খেয়ে। এখন আর ও রাস্তা দিয়ে বেরুনোর উপায় নেই। বেরুতে হলে নীচে যেতে হবে। আবরার নিশ্চয়ই নীচতলার জানালা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখে না।

বেড়াল একছুটে হলঘর পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। তারপর নিঃশব্দ পায়ে হলওয়ে ধরে এগোল। এটা সদর দরজা হয়ে মিশেছে রান্নাঘরে। প্যাসেজে মোড় ঘোরার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চুরি করে শোনার উপযুক্ত জায়গা এটা।

ফ্রিজের দরজা খোলার শব্দ পেল সে, তারপর পরিষ্কার শুনতে পেল ওদের গলা।

## তেরো

'আপনি বিয়ার খান না, মিস রহমান?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর। 'ডিকটেটিং একটা নীরস কাজ। আর ডিকটেশন নেয়া তো আরও নীরস।'

মৃদু হাসল শিলা। 'খাই। তবে বিয়ার খাওয়ার কথা কাউকে বলতে পারবেন না কিন্তু। এত ছোট শহরে শিক্ষকরা বিয়ার খায় না বা ধূমপান করে না।'

'কথা দিলাম কাউকে বলব না,' ফ্রিজ থেকে আরেকটা বিয়ারের ক্যান বের করতে করতে বললেন আবরার। ইতস্তত সুরে যোগ করলেন। 'ইয়ে–ডিকটেটিং করার সময় ধূমপান করলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'মোটেই অসুবিধে হবে না।

দু'গ্লাস বিয়ার নিয়ে শিলার সামনে বসলেন ডক্টর, একটা গ্লাস ঠেলে দিলেন মেয়েটার দিকে।

'কাগজ-কলম আপাতত রাখুন, মিস শিলা। এক্ষুণি ডিকটেটিং শুরু করতে ইচ্ছে করছে না। ডিকটেটিং-এর চেয়ে আমার কথা শুনতেই বোধহয় আপনার ভাল লাগবে। মাঝে মাঝে ভাবি আমার ছাত্ররাও বোধহয় আমার ডিকটেশনের চেয়ে দ্রুত লিখতে পারে।'

'আপনার ছাত্ররা? আপনি শিক্ষকতাও করেন নাকি, ডক্টর?'

'হ্যাঁ, মিস শিলা, এম আই টি-তে ফিজিক্স পড়াই। ইলেক্ট্রনিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সেও তাই।'

শিলা কাগজ-কলম নামিয়ে রাখল টেবিলে, অবাক দৃষ্টিতে তাকাল ডক্টরের দিকে। 'আবরার! ড. সি. আর. আবরার? বড় বড় স্যাটেলাইট প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করেছেন, তাই না?'

হাসলেন ডক্টর। 'তেমন কিছু না। তবে আপনি আমার নামটা জানেন জেনে গর্ববোধ করছি। বিজ্ঞানের প্রতিও আগ্রহ আছে নাকি?'

'অবশ্যই। বিশেষ করে গ্রহ-তারা ইত্যাদি বিষয়ে আমার আগ্রহ প্রবল। সায়েন্স ফিকশনের একনিষ্ঠ পাঠক বলতে পারেন

আমাকে।'

'আমি আবার রহস্য সাহিত্যে বেশি মজা পাই। রিলাক্সের প্রয়োজন হলে সায়েন্স থেকে যত দূরে সরে যেতে পারি ততই ভাল লাগে।'

'তা বুঝতে পারছি,' বলল শিলা রহমান। 'আপনি কি সায়েন্টিফিক কোনও বিষয়ে আমাকে ডিকটেশন দিতে চান?'

'না ঠিক তা নয়। আসলে যে ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি ওটার ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল। এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, শিলা। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু তদন্তও চালিয়েছি। ভুলে যাবার আগে ওগুলো স্টেটমেন্টের মত করে লিখতে চাইছি।'

তারপর রনি, জন এবং হেলমুটের আত্মহত্যার বিষয়ে নিজের সন্দেহের কথা খুলে বললেন ড. আবরার। প্রসঙ্গত এল কুকুর, কাক, বেড়াল, পেঁচা ইত্যাদি সবার কথা। ডক্টরের ধারণা এরাও আত্মহত্যা করেছে।

'কিন্তু কেন, মিস শিলা,' পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন ডক্টর। 'এই ছয়টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে কি কোনও কানেকশন বা সম্পর্ক রয়েছে? মিসেস কোহ্লের ফ্রিজ থেকেই বা সুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হয়ে গেল কেন? এসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যে কি আপনি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না?'

আবরারের কথা শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল শিলার, চেহারা বিবর্ণ। আবরার ধারণা করলেন ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

শিলা শান্ত গলায় বলল, 'এবার আপনি ডিকটেশন শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে ডিকটেশন শুরু করলেন আবরার। তবে ধারাবাহিকভাবে নয়; মাঝে মাঝে দু'এক মিনিটের জন্য চুপ করে থাকলেন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন বাছাই করে, কারণ ডক্টর চাইছেন পরিষ্কার, বিশদ একটি গল্প।

মোটামুটি ঘণ্টা দেড়েক ডিকটেশন চলল। প্রথম তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা এবং টাইগারের র‍্যাবিস বিষয়ক নেতিবাচক রিপোর্ট পর্যন্ত এসে থামলেন ডক্টর। বললেন, 'কোহ্লের ব্যাপারে পরে কথা বলব। আপনিও নিশ্চয়ই লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু রেস্ট নেয়া দরকার।'

'আমার রেস্টের প্রয়োজন নেই,' বলল শিলা। 'নতুন আরেকটা অংশে ঢুকতে যাচ্ছি। রনির ব্যাপারটা সবই জানি আমি। তবে মি. কোহলের ব্যাপারে কিছুই জানি না। কাজেই আপনি শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

'দশ মিনিট সময় দিন আমাকে, শিলা, আরেক গ্লাস বিয়ার চলবে তো?'

শিলা ক্ষীণ আপত্তি জানালেও আমল দিলেন না ডক্টর। তার জন্যে বিয়ার নিয়ে এলেন।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে শিলা জানতে চাইল, 'ক' কপি দরকার আপনার?'

'তিন কপি,' বললেন ডক্টর। 'একটা আমার জন্য আর দুটো পাঠাব আমার বন্ধুদেরকে তাদের মতামত জানতে। এদের একজন খুব বড় ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞেস করব র‍্যাবিসের মত আর কোনও দুর্লভ রোগ আছে কিনা যে রোগ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই পাগল হয়ে যায়। আরেকজন অংকবিদ। সে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে। তার কাছে জানতে চাইব যে সব ঘটনা ঘটছে এখানে তার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে নাকি স্রেফ কাকতালীয় বলে মনে করে সে এগুলোকে।'

'আমি যদি নিজের জন্যে একটা কপি তৈরি করি, আপনার কোনও আপত্তি আছে, ডক্টর?'

'কোনও আপত্তি নেই, শিলা।'

হাসল শিলা রহমান। 'বেশ। আমি অবশ্য নিজের জন্যে

একটা কপি তৈরি করতাম। তবে আপনার অনুমতি পেয়ে ভাল হলো।'

আবরারও হাসলেন। খোলামেলা স্বভাবের শিলাকে তাঁর ভাল লেগেছে। কোনও জটিলতা নেই তার ভেতরে। এ ধরনের সহজ সরল মানুষ পছন্দ করেন ডক্টর। ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন নিজের সেক্রেটারী হবার প্রস্তাব শিলাকে দেবেন কিনা। তাঁর ডিপার্টমেন্টের বাজেট আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে। তিনি এই প্রথম একজন ফুলটাইম সেক্রেটারী এবং রেকর্ড ক্লার্ক পাবেন। শিলা তার প্রস্তাবে রাজি হলে ভালই হবে। তিনি একজন দক্ষ সেক্রেটারী পাবেন আর শিলা এখানকার চেয়ে অনেক বেশি বেতন পাবে এম আই টি-তে। তবে প্রস্তাবটা পরে দিলেও চলবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

বিয়ার শেষ করে শিলা রহমান বলল, 'আজ যে পর্যন্ত ডিকটেশন দিলেন তা টাইপ করতে আমার দু'দিন লাগবে। আজ মঙ্গলবার। বিষ্যুদবার দুপুরের মধ্যে আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন, অবশ্য সন্ধ্যা বেলাতেও যদি কাজটা করি।'

'আপনি সন্ধ্যাবেলাও কাজ করেন নাকি?'

'সাধারণত করি না। তবে আপনারটা করব। কারণ এত মজার কাজ জীবনে পাইনি আমি। আর এ জন্যে কোনও পেমেন্ট নেব না। আপনি যদি টাকা নেয়ার জন্যে জোরাজুরি করেন তা হলে বলব আজকের বিকেলটা খামোকাই নষ্ট হলো আপনার।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনি বুঝতে পেরেছেন মেয়েটার মনে যা, মুখেও তাই। কাজেই ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি বড়জোর একটা কাজই করতে পারবেন–বোস্টন ফেরার পর শিলার জন্য একটা উপহার কিনে পাঠিয়ে দেবেন। ওটা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতে পারবে না শিলা রহমান।

'বেশ, শিলা। আপনার কথাই রইল। তা হলে আজ থেকে আপনাকে আমার পার্টনার হিসেবে কাজ করতে হবে। আমি কি

আপনাকে এখন কিছু কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। বলুন না।'

'আপনাকে এখন থেকে চোখ, কান খোলা রেখে চলতে হবে। আপনি শহরে থাকেন। কাজটা সহজ হবে আপনার জন্য। আমি শহরে যাই হপ্তায় একদিন। ফলে কোনও ঘটনা ঘটলে তা জানতে পারি দেরিতে। কাজেই এখন থেকে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা যদি ঘটে, যা আমার মানে আমাদের তদন্তের সাথে মিলে যায়, আপনি সেসব সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখবেন।'

'তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হবে কী করে? আপনার বাসায় বোধহয় ফোন নেই নাকি আছে?'

'না, নেই। এ জন্যে এখন বরং আফসোস হচ্ছে। তবে প্রায়ই আমি এ শহরের পোস্ট অফিসে যাই চিঠিপত্র এসেছে কিনা দেখতে। আপনি পোস্ট মাস্টারের কাছে কোনও মেসেজ রেখে গেলে আপনাকে ফোন করব। তা হলে কথা ওটাই রইল–বিষ্যুদবার আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। চলুন, ওঠা যাক।'

হ্যান্ডব্যাগে নোটবই আর পেন্সিল ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল শিলা রহমান। সদর দরজা দিয়ে বেরুল ওরা, উঠল স্টেশন ওয়াগনে। ডক্টর স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন, গিয়ার ছাড়লেন; ক্লাচ রিলিজ করতে যাচ্ছেন এমন সময় শিলা বলল, 'এই রে, আপনার বেড়ালটার সাথে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না। বলব ভাবছিলাম, ভুলে গেছি। অবশ্য অসুবিধা নেই।'

আবরার ক্লাচ পেডালে পা রেখে ঘুরে তাকালেন শিলার দিকে। 'বেড়াল? আমি বেড়াল পুষি না, শিলা। আপনি আমার বাড়িতে বেড়াল দেখেছেন?'

'আ–হ্যাঁ। দেখলাম বলেই তো মনে হলো। ওই সময়–'

আবরার লিভার নিউট্রালে এনে ইগনিশন সুইচ অফ

করলেন। 'বোধহয় রাস্তার কোনও বেড়াল ঢুকে পড়েছে। একটু বসুন। আমি চেক করে আসছি। বেড়াল ঢুকলে ওটাকে বের করে দেয়াই ভাল। কার না কার বেড়াল।'

গাড়ি থেকে নেমে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন ডক্টর দরজা বন্ধ করে। দ্রুত নীচতলা ঘুরে দেখলেন। প্রায় সবগুলো জানালাই বন্ধ। দু'একটা দু'এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। কিন্তু ওই ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ওপরে গেলেন তিনি। বেড়ালের টিকিটিও চোখে পড়ল না। বেডরুমে ঢুকলেন। এ রুমের একটা জানালা খোলা। গাছের ডাল ঝুলে আছে জানালা থেকে কয়েক ফুট ওপরে। ওখান থেকে লাফ দিয়ে নামা যায় বেডরুমে, কিন্তু বেরুনো সম্ভব নয়। কারণ নীচে নরম ঘাস নেই, আছে শক্ত পাথুরে মেঝে। ওখানে লাফ দিয়ে নামতে গেলে হয় বেড়াল মারা যাবে নয়তো মারাত্মক আহত হবে।

হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল তাঁর। এ বাড়িতে যদি সত্যি কোনও বেড়াল ঢুকে থাকে, আর ওটার যদি মরার খায়েশ হয়, যেমন কোহ্‌লের বেড়ালটা মারা গেল, বা অন্যান্য প্রাণীগুলো−

আবরার বেডরুমের জানালা বন্ধ করে নেমে এলেন নীচে, দরজা খুলে বেরুলেন। বেড়াল থাকলে থাকুক, উনি এসে আবার খুঁজবেন। তখন এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন আবরার। বললেন, 'কোনও বেড়াল চোখে পড়েনি আমার, শিলা। আপনি সত্যি দেখেছিলেন তো? কোথায়, কখন?'

'তখন তো দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে দেখার ভুল হতে পারে। আপনি যখন ডিকটেশন দিয়ে এক মিনিটের জন্য থেমে কী যেন ভাবতে শুরু করলেন তখন বেড়ালটাকে দেখি আমি। হলওয়ে প্যাসেজের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, রান্নাঘর লাগোয়া সিঁড়ির ধারে। আপনার মনোযোগ নষ্ট হবে ভেবে ওটাকে ডাকিনি আমি। আপনি আবার ডিকটেশন শুরু

করলেন, তাকিয়ে দেখি চলে গেছে ওটা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল শিলা। তারপর বলল, 'এখন মনে হচ্ছে ভুলই দেখেছি। অবশ্য ওই সময় ভুল কিছু দেখা অস্বাভাবিক ছিল না।'

'আমারও তাই ধারণা,' তরল গলায় বললেন ডক্টর। 'যাহোক, আমার বাড়িতে বেড়ালের খোঁজ পেলে আপনাকে জানাব আমি।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হলো না দু'জনে। আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছেন আবরার, নীরবতা ভেঙে শিলা বলল, 'ডক্টর, আপনার কি মনে হয় এমন কোনও রোগ সত্যি আছে যা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা যোগায়?'

'এমন কোনও রোগের কথা শুনিনি কখনও। এটা খুব বিরল কোনও রোগ হবে।'

'খুবই বিরল। এমন কোনও রোগের অস্তিত্ব থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

'ঠিকই বলেছেন। তবে, শিলা, ওই রোগের কথা বাদ দিয়ে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা মনে হয় না আপনার? অদ্ভুত কোনও কাকতালীয় ঘটনা—অন্য কোনও ব্যাখ্যা?'

'হ্যাঁ, ব্যাখা আমি একটা দিতে পারি। আপনি গাডারডিন সোয়াইনের কথা শুনেছেন, ডক্টর?'

## চোদ্দ

'গাডারডিন সোয়াইন...' আনমনা গলায় বললেন ডক্টর। 'কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'বাইবেলে আছে,' বলল শিলা। 'বুক অভ লিউকে। একবার যীশুখৃষ্ট ভূতে পাওয়া এক লোককে দর্শন দিতে এলেন। কাছেই ছিল একদল রাজহাঁস। দাঁড়ান, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতিটা তুলে ধরছি আমি 'তারপর শয়তান বা ভূতগুলো লোকটিকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং প্রবেশ করিল রাজহাঁসদের মধ্যে এবং রাজহাঁসের দল দ্রুত হ্রদের গভীরে নামিয়ে পড়িল এবং দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।'

ডক্টর আঁতকে উঠলেন। 'শিলা, আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে আপনি ভূত বা জিনে ধরা কোনও কিছুতে বিশ্বাস করেন।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি না। তবে কারও ওপর ভর করা–'

'কে বা কী ভর করবে? আমি বাস্তববাদী মানুষ, শিলা। আমি টেলিপ্যাথি বা টেলিকাইনিসিসের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে চাই না। এমনকী সম্মোহন বা পোস্ট হিপনোটিক সাজেশনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মেনে নিতে রাজি। কিন্তু প্যারাসাইকোলজি যদি ব্যাখ্যাও দিতে চায় যে কেউ কারও ওপর ভর করতে পারে এবং তাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, আমি তা বিশ্বাস করব না কিছুতেই।'

'কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করেন, এ-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি গ্রহ? এ সব গ্রহে যে অন্য কোনও প্রাণীর বাস নেই তা কী করে–কী করে জানব, ও সব গ্রহের কোনও প্রাণীর অন্যের ওপর ভর করে তাকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা রাখে? আপনি কী করে নিশ্চিত হন এসব ঘটনার পেছনে ভিনগ্রহবাসীর হাত নেই?'

'হুম্‌ম' বললেন আবরার। 'আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলছি না। আর জানিও না সত্যি এরকম কিছু এখানে আছে কিনা। কিন্তু শুধু একজন ভিনগ্রহবাসী কেন, ভিনগ্রহবাসীরা নয় কেন?

'কারণ আমার ধারণা একজনই এসব ঘটাচ্ছে। ভেবে

দেখুন, মেঠো ইঁদুরটা মারা যাবার পর রনি মরে গেল। তারপর মরল রনিকে খুঁজতে যাওয়া কুকুরটা, তারপর পেঁচাটা, তারপর বেড়ালটা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি। দুটো মৃত্যুর ঘটনা কখনোই একসাথে ঘটছে না। যে এ ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সে একজনকে মেরে তারপর আরেকজনকে তার হোস্ট বানাচ্ছে। অর্থাৎ হোস্টের মৃত্যু ঘটার পর সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

শোল্ডার ব্লেডে কী যেন সুড়সুড় করে উঠল ডক্টরের। কণ্ঠে জোর এনে বললেন, 'এ সবই আসলে আপনার কল্পনা, আমারও মনে হয় রহস্য সাহিত্য ছেড়ে এখন থেকে সায়েন্স ফিকশন পড়তে হবে।'

'তাই পড়ুন। তবে যা ঘটছে, একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন তা নিছক কল্পনা হয়তো নয়। আপনার বাড়িতে যে বেড়ালটাকে আমি দেখেছি, ওটা যদি সত্যি ওখানে থেকে থাকে, আমার ধারণা ওটা সেই ভিনগ্রহবাসীর হোস্ট। বেড়ালটাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য।'

হেসে উঠলেন আবরার। 'তা হলে ওটাকে হত্যা করার পর ভিনগ্রহবাসী নিশ্চয়ই আমার ওপর ভর করবে? যদি এমন কিছু ঘটে, আপনাকে আমি জানাব, শিলা।'

ঠাট্টা করে কথাটা বললেও শিলাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় ব্যাপারটা আর ঠাট্টা মনে হলো না ডক্টর আবরারের কাছে। শিলা যা বলেছে তার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়?

দরজা সাবধানে বন্ধ করলেন ডক্টর। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছুই চোখে পড়ল না, কিছু শুনতেও পেলেন না।

পাইপ ধরিয়ে লিভিংরুমে চলে এলেন তিনি, বসলেন গদি মোড়া চেয়ারে। একটা পেপার ব্যাক টেনে নিলেন। কিন্তু বইটা খুলতে ইচ্ছে করল না।

বাড়িটা সার্চ করে দেখবেন নাকি একবার? কিন্তু বেড়াল খোঁজার কাজ বড় ক্লান্তিকর। আর এখানে বুদ্ধিমান কোনও বেড়াল লুকিয়ে থাকবে বলেও মনে হয় না। কারণ এখানে লুকোনোর জায়গাও নেই। আর কোথায় খুঁজবেন তিনি? হয়তো ওটা এখন কিচেনে বসে আছে। তাঁর আওয়াজ পেয়ে হলঘরে ঢুকে পড়বে। আর বেড়াল নিঃশব্দে চলাফেরায় ওস্তাদ। তিনি টেরও পাবেন না কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে ওটা।

অবশ্য ওটা যদি সত্যি বেড়াল হয়ে থাকে। ওটা কি সত্যি বেড়াল? সাধারণ বেড়াল হলে তো লুকোচুরি খেলার কথা নয়। এতক্ষণ লুকিয়েও বা থাকবে কেন?

বেড়ালটাকে আবার খোঁজা শুরু করলেন ডক্টর কিন্তু বৃথাই খোঁজ চলল। ওটার টিকিটিও দেখা গেল না কোথাও। খুঁজতে খুঁজতে খিদে লেগে গেল আবরারের। তিনি দরজা ভাল করে বন্ধ করে খেতে গেলেন পাবে। ওখানে ডিনার সেরে, পোকার খেলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পর আবার বেড়ালের চিন্তায় পেয়ে বসল তাঁকে। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে সারা বাড়ি। ইঁদুর দৌড়ে গেলেও চোখে পড়বে আবরারের। তিনি কিচেনে ঢুকে আলো জ্বাললেন। যাবার আগে ময়দা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মেঝেতে। যদি সত্যি বাড়িতে বেড়াল থাকে, ময়দা খাওয়ার লোভে ওটা আসতে পারে ওখানে।

ময়দার ওপর বেড়ালের পায়ের ছাপ! উঁচু স্বরে ডাকলেন ডক্টর। 'ঠিক আছে, বেড়াল, তোমার চেহারাটা এবার দয়া করে দেখাও বাপু। কোনও কিছু খেতে চাইলে বলো। আমি তোমাকে মারব না। তবে তোমার চেহারা না দেখা পর্যন্ত তোমাকে আমি এখান থেকে যেতেও দেব না।'

ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করলেন আবরার, বসলেন টেবিলে। এই প্রথম তাঁর ভয় ভয় লাগছে। ভয়টা কী নিয়ে

বুঝতে পারছেন না, তবে জানেন কিচেনের আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দোতলার বেডরুমে যাওয়া সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

বিয়ার শেষ করে কাপ বোর্ডের ড্রয়ার খুলে একটা ফ্লাশলাইট বের করলেন আবরার, তারপর কিচেনের বাতি নিভিয়ে দিলেন।

ফ্লাশলাইট জ্বেলে সিঁড়ি বাইতে শুরু করলেন ডক্টর। কাজটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্লাশলাইট নেভাতে সাহস হলো না তাঁর।

হলঘরে বা সিঁড়িতে কেউ নেই। বেডরুম তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকী খাটের নীচেও লুকিয়ে নেই বেড়ালটা। তা হলে কই গেল? বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে নিশ্চয়। ঘুমের মধ্যে ওটা যাতে তাঁর রুমে ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্যে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন ডক্টর। বিছানায় শুয়ে মনে হলো ওপরে ওঠার সময় বন্দুক নিয়ে এলে বোধহয় ভাল হত।

# পনেরো

ডক্টর আবরার যখন বলছেন 'ঠিক আছে, বেড়াল,' কথাটা শুনে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছিল ভিনগ্রহের হন্তারক। ভয় পাবার কারণ আবরার কিছু একটা সন্দেহ করে বসেছেন যা তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। তবে আবরারকে তার যথার্থ হোস্ট মনে হয়েছে—একজন টপ ইলেকট্রনিক্স, পয়সাঅলা, সর্বত্র অবাধ বিচরণ, বিয়ে থা করেননি। আবরারের সঙ্গে শিলা ডিকটেশন পর্বের কোনও কিছুই তার কান এড়িয়ে যায়নি। আবরারকে তার হোস্ট হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এই লোকের ওপর ভর করলে অল্প কদিনের মধ্যে সে নিজের গ্রহে

ফিরে যেতে পারবে।

তবে সে একটা ভুল করে বসেছে। তার উচিত ছিল সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। সে যদি ওদের সামনে ঘুরঘুর করত তা হলে ওরা বরং তাকে আদরই করত। হয়তো দুধ খেতে দিত। তারপর বাড়ির বাইরেও যেতে দিত। তা হলে অনেক আগেই সে মুক্ত হয়ে যেতে পারত। ফিরতে পারত কোহ্‌লদের খামার বাড়িতে, নিজের নিরাপদ খোলের মধ্যে। তারপর সুযোগ বুঝে, কাউকে হোস্ট বানিয়ে আররারের বাড়িতে আসত সে, ঘুমন্ত আবরারের ওপর নিয়ন্ত্রণ-আরোপ করা সহজ হত তখন।

তবে ভুল যখন হয়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। পালাবার রাস্তা নেই। আবরারটা যা চালাক! সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে। আর ময়দার ওপর তার পায়ের ছাপ দেখার পর আবরার তো এখন জানেই সে এখানে আছে।

প্রশ্ন হলো আবরার তার সম্পর্কে কতটুকু কী ধারণা করতে পেরেছে? কিছু একটা সন্দেহ সে করে বসেছে তা তো বোঝাই যায়। আবরারের ময়দার ফাঁদে পা দেয়াটাও ভুল হয়েছে। তবে নিজের পায়ের ছাপ মোছার উপায় ছিল না তার ক্ষুদ্র শরীর নিয়ে।

তার আতংক হচ্ছে আবরারের সাম্প্রতিক আচার-আচরণ দেখে। বুদ্ধিমান আবরার কি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে? বুঝে ফেলেছে তার বাড়িতে যে বেড়ালটা আটকা পড়েছে আদৌ সেটা বেড়াল নয়? হয়তো বা। নইলে সে ওভাবে বেড়ালটাকে সম্বোধন করবে কেন? বোঝাই যাচ্ছে আবরার ঘটে অঢেল বুদ্ধি রাখে। কিন্তু কতটা বুদ্ধি রাখে জানতে হলে লোকটার ওপর তাকে ভর করতে হবে। আর সেটা করতে হলে এই বেড়ালের শরীর থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে কি আবার আত্মহত্যার রাস্তা ধরবে? কিন্তু এই বেড়ালটাকে দিয়েও

আত্মহত্যা করালে আবরারের কাছে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। সে ঠিক বুঝে নেবে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণীই শুরু থেকে একের পর একজনকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে।

এখন তার এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আপাতত উপায় একটাই–কাল সকালে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে নিজের চেহারা দেখানো এবং সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্পও নেই। তবে বিপদ ওটা নয় যে আবরার তাকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে। তা হলে তো সে বেঁচেই যায়। আর আবরার যদি তার হোস্টদের সম্পর্কে জেনে থাকে, খুনখারাবীর দিকে সে যাবে সব শেষে। কারণ সে বুঝতে পারবে হোস্টকে হত্যা করা মানে যে ওটার ওপর ভর করে আছে তাকে মুক্ত করে দেয়া। সমস্যা হলো, আবরার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে তাকে ধরে হয়তো খাঁচায় পুরে রাখবে। এরচে' বাজে ব্যাপার আর কী হতে পারে? বেড়ালটার স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে মুক্ত হতেও পারবে না। আর আবরার বিজ্ঞানী। তাকে নিয়ে হয়তো অনেক অসহ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা সে চালাবে। তারচেয়েও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো সে হয়তো পুষ্টির অভাবে বেড়ালের শরীরের মধ্যেই একসময় মরে যাবে। কোহলদের বাড়িতে পুষ্টিকর যে সলিউশন সে খেয়েছে তাতে এক মাস টিকে থাকা যাবে, একবছর নয়। আর বন্দী অবস্থায় সে যদি যথার্থ পুষ্টি না পায় তা হলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

সারারাত সে এসব নিয়ে ভাবল। একবার ভাবল জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ে নীচে। কিন্তু সেটা সেই আত্মহত্যাই হবে, লাভ হবে না কিছু।

সে এখন এটুকুই আশা করতে পারে, আবরার যা সন্দেহ করেছে তা স্রেফ সন্দেহই মনে হবে তার কাছে এবং কাল সকালে আবরার তাকে বেরুতে দেবে। তাকে এখন প্রমাণ

করতে হবে সাধারণ একটা বেড়াল ছাড়া অন্য কিছু নয় সে।

আগের রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে রাত একটা বেজে গিয়েছিল, সকালে ঘুম ভেঙে ড. আবরার দেখেন ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন বিছানায়। হঠাৎ বেড়ালটার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

বেড়াল বিষয়ক ভীতি এ মুহূর্তে তেমন কাজ করছে না তাঁর মধ্যে, দিনের আলোয় অনেকটাই দূর হয়ে গেছে ভয়। মনে হচ্ছে গত দশদিনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলোর একটার সাথে আরেকটাকে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন তিনি।

...হয়তো বা। তারপরও কিছু জিনিস অব্যাখ্যাত থেকে যাচ্ছে। তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বেড়ালটার গতিবিধি এত রহস্যময় কেন? ওটা কেন শুধু লুকিয়ে থাকছে? তবে কি ওই বেড়ালটা মানুষজন ভয় পায়? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ওটা, রাস্তার ছেলেরা ঢিল মেরে মানুষ সম্বন্ধে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটার মধ্যে?

সে যাহোক, আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন আজ বেড়ালটাকে খুঁজে বের করবেনই।

তবে আজ আর ওটাকে খুঁজতে হলো না। নীচে নামতেই আবরার দেখতে পেলেন সামনের দরজায় নিতান্ত নিরীহ চেহারা নিয়ে বসে আছে বেড়ালটা।

বেড়ালটাকে তাঁর মোটেই বিপজ্জনক মনে হলো না। ছোট, ধূসর রঙের বেড়াল। দেখে মনে হচ্ছে না ক্ষুধার্ত বা আবরারকে দেখে ভয় পেয়েছে। বরং চাউনিতে যেন বন্ধুত্বের আভাস। মিউ করে ডেকে উঠল বেড়াল, দরজায় থাবা দিয়ে আঁচড়াল। বেরুতে চায়। ওটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন আবরার। 'এখন নয়,

বেড়াল। পরে। আগে তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। এসো, নাস্তা খেয়ে নিই।'

রান্নাঘরে ঢুকলেন ডক্টর, পিছু পিছু বেড়ালও। তবে এত কাছে নয় যে আবরার ওটার গায়ে লাথি মারতে পারবেন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মেঝের ওপর বসল ওটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডক্টরের দিকে। যেন বলতে চাইছে, 'আমাকে বেরুতে দাও, প্লীজ।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন ডক্টর, কঠিন গলায় বললেন, 'না বেড়াল। এখন কোথাও যেতে দেয়া যাবে না তোমাকে। আগে আমাকে ভাবতে দাও।'

ফ্রিজ খুলে দুধ বের করলেন তিনি, একটা বাটিতে ঢেলে এগিয়ে দিলেন বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটা ফিরেও তাকাল না ওদিকে। আবরার নিজের জন্যে নাস্তা তৈরি করছেন, সে আগের জায়গায় ঠায় বসে রইল। ডিমভাজা আর কফি নিয়ে টেবিলে বসলেন ডক্টর, নড়ে উঠল বেড়াল, ঝাঁপিয়ে পড়ল দুধের বাটিতে, চুকচুক করে খেতে লাগল।

'সুন্দর বিল্লি,' ডিম ভাজায় কামড় দিয়ে বললেন ডক্টর। 'আমি এখন একটু বেরুব। তুমি বাড়িতেই থেকো কেমন?'

বেড়াল কোনও জবাব দিল না, শুধু একবার মুখ তুলে তাকাল আবরারের দিকে।

আবরার বেরুবেন বেড়ালটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে। যদি এটা কারও হারানো বেড়াল হয়, তাঁকে তিনি ফেরত দিয়ে দেবেন। আর সেই লোক যদি তাঁকে বেড়ালটা বিক্রি করতে চায়, সানন্দে কিনে নেবেন তিনি। কারণ বেড়ালটাকে ভারী পছন্দ হয়েছে তাঁর। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন গোটা বাড়িতে নেট লাগাবেন। এখানে মাছির বড় উৎপাত। বেড়ালটাকে জ্বালিয়ে মারবে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে আবরার বেড়ালটাকে বললেন

'সিরিয়াসলি বলছি এখানে কটা দিন থাকতে কেমন লাগবে তোমার? আর ভাল কথা, কী নাম-তোমার?'

বেড়াল দুধ খাচ্ছিল, খেতেই লাগল।

'বুঝলাম। বলবে না। ঠিক আছে, তোমাকে আজ থেকে বিল্লি বলে ডাকব, কি রাজি?'

দুধের বাটি প্রায় শেষ, বেড়াল দরজার ধারে গিয়ে বসে বলল, 'ম্যাও।'

'বুঝলাম রাজি,' বললেন আবরার। 'তবে তোমার আচরণ দেখে বুঝতে পারছি তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। ঠিক আছে, আমি দেখছি কার বাড়ির পোষা মিনি তুমি।'

হারানো বেড়ালের খোঁজে শহরে এলেন ড. আবরার। ক্লারিয়ন পত্রিকার সম্পাদককে বললেন তাঁর বাড়ির ধূসর বেড়ালের কথা। জানতে চাইলেন কোথায় খোঁজ নিলে জানা যাবে কারও ধূসর রঙের বেড়াল হারানো গেছে কিনা। ক্রামারদের বাড়িতে খোঁজ নিতে বললেন এড হোলিস। ওদের বাড়িতে অনেক বেড়াল আছে। কোহ্‌লদের প্রতিবেশী ওরা।

ক্রামারদের বাড়ি যাবার আগে শিলাকে ফোন করলেন আবরার। শিলা জানাল বিষ্যুদবারের মধ্যে সে কাজ শেষ করতে পারবে। এরপর জানতে চাইল আবরার বেড়ালের খোঁজ পেয়েছেন কিনা। আবরার বেড়াল বিষয়ক সমস্ত ঘটনা তাকে বললেন। তারপর রওনা হয়ে গেলেন ক্রামারদের বাড়ির উদ্দেশে।

মিসেস ক্রামারের সাথে দেখা হলো আবরারের। কথা শুনে বোঝা গেল আবরারকে চেনেন তিনি, এঁর আগেও দেখেছেন। 'ভেতরে আসুন,' আমন্ত্রণ জানাল মিসেস ক্রামার।

'আজ থাক, মিসেস ক্রামার,' বিনয়ের বললেন ডক্টর। 'ছুটকো একটা কাজে আপনাকে বিরক্ত করছি। শুনলাম আপনার একটা ধূসর বেড়াল আছে। আমার বাড়িতেও ধূসর রঙের একটা

বেড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম–'

'জ্বী, আমার ধূসর রঙের একটা বেড়াল ছিল। দু'দিন ধরে ওটা লাপাত্তা।'

'তা হলে ও বেড়ালটাই আপনার হবে। আমি ওটাকে পুষব ভাবছি। অবশ্য আপনি যদি বিক্রি করতে রাজি হন–'

হেসে উঠলেন মহিলা। 'বিক্রি করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনি পুষতে চাইলে রেখে দিতে পারেন। আমার বাড়িতে বেড়ালের অভাব নেই।'

'ধন্যবাদ। মিসেস ক্রামার। আপনার ধূসর বেড়ালটার নাম কী?'

'জেরী।'

'আমি ওর নাম দিয়েছি বিল্লি। কেমন হয়েছে বলুন তো।'

জবাবে হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ক্রামার।

বেড়ালটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ডক্টর আবরার আসছেন, সে তাড়াতাড়ি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আবরার দরজা খুলতেই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, চট করে ওটাকে ধরে ফেললেন আবরার। 'উঁহু, তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না, বিল্লি। আমার সাথে কয়েকদিন তোমাকে থাকতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে বিল্লি হয়ে আমার কাছে থাকবে নাকি জেরী হয়ে ফিরে যাবে ক্রামারদের কাছে।'

# ষোলো

মশা-মাছি প্রতিরোধের জন্যে বাড়িতে নেট টাঙানো দরকার। তাই ডক্টর আবরার পরদিন শহরে গেলেন ছুতোর মিস্ত্রি হ্যাঙ্ক

পার্ডির সাথে কথা বলতে। পার্ডি বলল এখন সে খুব ব্যস্ত, আগামী হপ্তার আগে সময় দিতে পারবে না। 'ঠিক আছে' বলে ওখান থেকে সোজা শিলা রহমানের বাসায় গেলেন আবরার।

আজ বিষ্যুদবার। শিলা অপেক্ষা করছিল ডক্টরের জন্যে। তাঁর গাড়ির আওয়াজ শুনেই দরজা খুলে দিল।

'আসুন, ডক্টর। সব রেডিই আছে। বসুন, আমি নোটবই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ, মিস শিলা। তবে আমার বন্ধুদের যে চিঠি লেখার কথা বলেছিলাম আজ আর আপনাকে দিয়ে তা লেখাব না। চিঠি এবং স্টেটমেন্ট পাঠাবার আগে আরও দু'একটা দিন একটু ভেবে নিই। এর মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে ওর মধ্যে যোগ করতে পারব।'

'ঠিক আছে। আপনার যেমন ইচ্ছা,' একটা বড়, বাদামী খাম এগিয়ে দিল শিলা আবরারকে। 'পড়ে শোনাব এখন?'

মাথা নাড়লেন আবরার। 'বাসায় বসে পড়ব। আপনার সময় থাকলে বরং দু'চারটে কথা বলি।'

শিলা রহমানের সময় আছে। ডক্টর বেড়ালটার কথা বললেন ওকে। 'ওটাকে নিয়ে যে ভয় কাজ করছিল মনে তা অনেকটাই কেটে গেছে,' হাসলেন তিনি। 'আসলে আপনার ভূতে ধরা বা ওই ধরনের কথা শুনে আমার মনেও ভয় ধরে গিয়েছিল'। এখন মনে হচ্ছে বেড়ালটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। নিতান্তই সাধারণ একটা বেড়াল ওটা, মিস শিলা।'

'আর টাইগারও সাধারণ একটা কুকুর ছিল, অন্তত আপনার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত। তবে আপনি যা-ই বলুন, ডক্টর, আমি কিন্তু পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছি না। ব্যাপারটা যদিও হাস্যকর শোনাচ্ছে–কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি চিন্তায় আছি।'

'আমার কিছু হবে না, মিস শিলা। আসলে আমরা দু'জনেই

ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছি।'

'হয়তো ডক্টর...আপনি চিঠি আর রিপোর্টগুলো আপনার বন্ধুদের পাঠাবেন তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবরার। 'আচ্ছা, পাঠাব। তবে ক'টা দিন সময় দিন।'

'আচ্ছা, সময় নিন। আমি এ হপ্তাটা বাড়িতেই আছি। কাজেই যে কোনও সময় এলেই আমাকে পাবেন।'

সে রাতে, খাওয়া-দাওয়া শেষে, লিভিংরুমের সোফায় এসে বসেছেন আবরার, বেড়ালটা তাঁর পাশে বসল। তিনি ওর নরম, রেশমি লোমে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আরামে গরগর করল বেড়াল।

'তারপর, খবর কী তোমার, বিল্লি?' বললেন তিনি। 'ভাল লাগছে এখানে থাকতে? পছন্দ হচ্ছে আমাকে? বন্দী বন্দী লাগছে না তো? ঠিক আছে তোমাকে আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার বাইরে যেতে দেব। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি।'

উঠে দাঁড়ালেন আবরার, একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন বেড়ালটার। আবার শুরু করলেন, 'বিল্লি, তুমি লুকিয়েছিলে কেন? দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছ কেন? জান না, বেড়ালরা অমন কাজ করে না, এখনকার মত স্বাভাবিক আচরণ কেন করনি তুমি আগে?'

থাবা দুটো টানটান করল বেড়াল, তারপর আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে বন্ধ করল চোখ।

'বিল্লি,' কঠিন গলায় তাকালেন আবরার। চোখ খুলে গেল ওটার, তাকাল ডক্টরের দিকে।

'বিল্লি, আমি কথা বলার সময় ঘুমানো চলবে না, তুমি তো কোহলদের প্রতিবেশীদের বাড়িতে থাকতে। জানো, হেলমুট যেদিন আত্মহত্যা করেছে, সে রাতে তাদের একটা বেড়ালও

একই কাজ করেছে? সোজা একটা হিংস্র কুকুরের মুখে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন আত্মহত্যা করবে?'

বেড়ালটা আবার চোখ বুজল, তবে আবরারের মনে হলো ঘুমায়নি ওটা।

'একই রাতে একটা পেঁচাও আত্মহত্যা করেছে, সে কথা জানো? তার আগে রনি মারা গেল, মারা গেল ওদের কুকুরটাও, আমারই গাড়ির নীচে চাপা পড়ে। কুকুরটা লুকিয়ে ছিল রাস্তার পাশে, আমার গাড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। ইচ্ছে করে।

'দুটো মানুষ। চারটে প্রাণী–এরা সবাই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? নাকি ওদের আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে কারও স্বার্থ হাসিল হবার পর? কেউ কি ওদের ব্যবহার করেছে?'

বাইরে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জানালা দিয়ে তাকালেন আবরার। নিকষ অন্ধকার। তার মনে পড়ছে লেমিংদের কথা। এরা দল বেঁধে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওরা কি সবাই পাগল? নাকি লেমিংরা এমন কিছু জানে যার কথা আমরা জানি না। তিনি আবার ঘুরলেন বেড়ালের দিকে।

'বিল্লি, ওই প্রাণীগুলো কেন আত্মহত্যা করেছে, বলো তো? তুমি যদি ওদের একজন হও তা হলে তুমি কেন কাজটা করছ না? নাকি এখানে বদ্ধ অবস্থায় থেকে আত্মহত্যার সুযোগ পাচ্ছ না? ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি এখুনি পরীক্ষা করে দেখছি।'

লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে নীচতলার স্টোররুমে ঢুকলেন ডক্টর, এখানে তিনি মাছ ধরার সরঞ্জামের সাথে কিছু আর্মসও রেখেছেন। গরমের সময় উইসকনসিনে শিকার তেমন কিছু মেলে না জেনেও আবরার একটা পিস্তল আর রাইফেল নিয়ে এসেছেন টার্গেট প্রাকটিসের জন্যে। সেই সাথে ব্রান্ড নিউ শটগানও রয়েছে। নতুন অস্ত্রটা যদি কোনও কাজ লাগানো যায়, এই ভেবে আনা।

পিস্তলটা নিলেন তিনি, একটা .৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশালের সাথে একটা কার্ডবোর্ড রাইফেল টার্গেটও বের করলেন। তারপর বন্দুক নিয়ে চৌকোনা কার্ডবোর্ডটা লিভিংরুম এবং হলঘরের মাঝামাঝি মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে ফিরে গেলেন নিজের আসনে। বন্দুক কক করার শব্দে মাথা তুলল বেড়াল।

'শোনো, বিল্লি,' বললেন তিনি, 'এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। তুমি যদি বাইরে যেতে চাও আত্মহত্যা করতে তা হলে কাজটা সহজ করে দিচ্ছি তোমার জন্যে। ওই দরজার কাছে যাও, টার্গেটের ওপর বসো, আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলি।'

বেড়ালটা ঘুমঘুম চোখে একবার পিটপিট করে তাকাল আবরারের দিকে, তারপর মাথা নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল—নাকি ঘুমের ভান করল?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনিও ধরে নিয়েছিলেন বেড়ালটা টার্গেটে গিয়ে বসবে না। তিনি পিস্তল আর টার্গেট আগের জায়গায় রেখে কিচেনে ঢুকলেন। ঘুমাবার আগে এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া দরকার।

পরদিন শুক্রবার। শহরে গেলেন আবরার আড্ডা দিতে। বেরুবার আগে বেড়ালটার আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ না করে খুশিই হয়েছেন তিনি। ওকে নাস্তা দিয়েছেন তিনি। বেড়ালটা চেটেপুটে সব খেয়েছে। যেন এ বাড়ির পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে। নাকি এটা আবরারকে পটানোর জন্য করছে? জানে, আবরার তাকে সোমবার বাইরে যেতে দেবেন। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি আবরার। শহরে এসে তার সম্পাদক বন্ধুর সাথে আড্ডা দিলেন। তারপর লেকে গেলেন মাছ ধরতে। তিনটে মাছ ধরা পড়ল বড়শিতে। দুটো তিনি রান্না করে খেলেন, বাকিটা

বেড়ালকে দিলেন। বেড়াল গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করল ওটা। আবরার বললেন, 'যদি আমার সাথে থাকো তা হলে তিনদিন অন্তর মাছ খেতে দেব তোমাকে।'

বেড়াল কিছু বলল না। চোখ বুজে পরম আয়েশে কাঁটা চিবোচ্ছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। আজ বেড়ালটাকে বাইরে যেতে দেয়ার দিন। আবরার পরীক্ষা করে দেখতে চান বেড়ালটা তার আগের আস্তানায় ফিরে যায় নাকি তাঁর কাছেই ফিরে আসে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় দরজা খুলে দিলেন আবরার। বেড়ালটা লাফঝাঁপ দিল না, হালকা পায়ে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

বিনকিউলার রেডিই ছিল, আবরার দ্রুত উঠে এলেন দোতলায়। বেড়ালটা কোন দিকে যায় দেখবেন। বেড়ালটা হেলেদুলে হাঁটছে রাস্তা দিয়ে, কোনও তাড়া নেই। আস্তে হেঁটে ওটা পৌঁছল রাস্তার শেষ মাথায়, দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আবরারের বাড়ির দিকে। চট করে জানালার পাশ দিয়ে সরে গেলেন আবরার। ওটা কি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যাবে কি যাবে না? নাকি দেখছে কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা।

রাস্তার শেষ মাথায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বেড়াল। তারপর আবার হাঁটা দিল। এবার আগের চেয়ে দ্রুত। তবে যে রাস্তাটা ক্রামারদের বাড়ির দিকে গেছে সেদিকে নয়, জঙ্গলের দিকে। খানিক পরে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে চাঁদি চুলকালেন ডক্টর আবরার। ওটার আচরণ তো এ পর্যন্ত স্বাভাবিকই মনে হলো। তবে–

আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন বেড়ালটার খোঁজে জঙ্গলে যাবেন। বৃষ্টি থেমেছে আধা ঘণ্টা আগে। ভেজা মাটিতে বেড়ালের পায়ের

ছাপ ফুটে থাকবে। তিনি দেখতে চান বেড়ালটা কোথায় গেল। এই ফাঁকে একটু বেরিয়ে আসাও হবে।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে, বগলে রেইনকোট নিয়ে (হঠাৎ যদি আবার বৃষ্টি নামে) বেরিয়ে পড়লেন আবরার। মাটিতে বেড়ালটার পায়ের ছাপ ফুটে আছে স্পষ্ট। তবে জঙ্গলের মধ্যে ছাপ খুঁজে পেতে কষ্ট হলো। কারণ এদিকের বেশির ভাগ রাস্তায় ঘাস জন্মেছে। তবে বাঁচোয়া এটাই যে, বেড়ালটা দিক বদল না করে সোজা রাস্তায় এগিয়েছে।

প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর ট্রেইল শেষ হয়ে গেল। সামনে হাত চারেক প্রশস্ত ছোট প্রস্রবণ। বেড়াল কি লাফ মেরে এটার ওপর দিয়ে চলে গেছে? তিনি লাফ দিয়ে অপর পাড়ে চলে এলেন। প্রস্রবণটার দুই তীরের মাটিই ভেজা। কিন্তু এ পাড়ে বেড়ালের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যায় বেড়ালটা এ পাড়ে আসেনি। তা হলে কোথায় গেল? তিনি ঢাল লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন। বিশ গজ যাবার পর যে দৃশ্যটা দেখলেন, ঘাড়ের পেছনের সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

পানিতে ভাসছে ধূসর রঙের বেড়ালটা।

এবার আর মনে সন্দেহ রইল না ডক্টর আবরারের আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা আসলে ঘটানো হয়েছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে সবাইকে। বুঝে গেছেন ডক্টর বেড়ালের ওপর যে জিনিসটা এতদিন ভর করেছিল তাঁর বাড়িতে, এতদিন শুধু সুযোগ খুঁজছিল বেরিয়ে আসার। স্বাভাবিক আচরণ করেছে সে আবরারের সাথে যাতে ডক্টরের মনে কোনও সন্দেহ জাগতে না পারে। সে এতদূর এসে আত্মহত্যা করেছে যাতে তার লাশ খুঁজে না পাওয়া যায়, যাতে ভেসে যায় স্রোতের সাথে। কিন্তু আত্মহত্যাই এটার শেষ উদ্দেশ্য নয়। গভীর কোনও উদ্দেশ্য আছে এর। কী সেটা?

ওটা যে-ই হোক বা যা-ই হোক তার ভিক্টিমদের যে নিয়ন্ত্রণ

করে চলেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। একের পর এক খুন করে চলেছে। কিন্তু কেন? ভয়ঙ্কর কোনও উদ্দেশ্য আছে অদৃশ্য আততায়ীর?

গা শিরশির করে উঠল ডক্টর আবরারের। তিনি একটা ডাল দিয়ে বেড়ালটার লাশ তুলে নিলেন পানি থেকে। একটা কাপড়ে মুড়ে গাড়ির পেছনে রাখলেন। লাশটাকে কি তিনি গ্রীনবে-তে পাঠাবেন অটোপসি'র জন্যে? কিন্তু কী পরীক্ষা করতে বলবেন তিনি ডাক্তারদের? তিনি ভাল করেই জানেন ওটার র‍্যাবিস নেই। এক ঘণ্টা আগেও বেড়ালটাকে একদম সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখেছেন আবরার।

বাড়ি ফিরে পাইপ ধরিয়ে সোফায় বসলেন আবরার। ভাবছেন। অনেকক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর প্রথম কাজ হবে স্টেটমেন্টের কপি বন্ধুদের পাঠিয়ে দেয়া। তবে বেড়ালের ঘটনাটাও এর সাথে যোগ করতে হবে। তিনি শিলার সাথে দেখা করতে চললেন শহরে।

শিলা বাসায় নেই। দরজায় চিরকুট রেখে গেছে।

'তিনটার সময় ফিরব।' এদিকে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আবরার ডাউন টাউনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ করলেন, গল্প করার লোক ছিল অনেক। কিন্তু গল্প করতে মন চাইল না। বিয়ার খেয়ে সময় পার করতে লাগলেন। তিনটার খানিক আগে উঠে পড়লেন তিনি।

শিলাকে এবার বাসায় পাওয়া গেল।

'আরে, ডক্টর,' উদ্বেগ ফুটে উঠল শিলার কণ্ঠে আবরারের চেহারা দেখে। 'আসুন, ভেতরে আসুন। কী হয়েছে?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে পুরো ঘটনা শিলাকে খুলে বললেন ডক্টর। তাকে কিছু ডিকটেশনও দিলেন। ঘণ্টাখানেক লাগল কাজটা শেষ করতে।

শিলা মুখ তুলে চাইল। 'ডক্টর! এ স্টেটমেন্ট দুটো আপনার

বন্ধুদের পাঠানোর পাশাপাশি শেরিফকেও ঘটনাটা জানানো উচিত নয় কি? আর শেরিফ ঘটনাটা সিরিয়াসভাবে না নিতে চাইলে এফ বি আইকে-ও বলতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকালেন আবরার। 'তাই করব ভাবছি। নিন, এবার চিঠি দুটো লিখে ফেলুন।'

আবার ডিকটেশন শুরু হলো। শেষ হতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। আবরার জানতে চাইলেন। 'টাইপ করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

'ঘণ্টা চারেক। তবে এখুনি শুরু করব। আপনি এই ফাঁকে শেরিফের সাথে দেখা করে আসুন না–'

'না, আমি তাঁকে ফুল স্টেটমেন্ট পড়ে শোনাতে চাই। আর আপনাকে না খেয়ে কাজ করতে হবে না। আমার সাথে চলুন। ডিনার করে আসবেন। আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাব। রাতের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারলেই হলো। কাল সকালে আমি শেরিফের সাথে কথা বলব। আর চিঠি দুটো স্পেশাল এয়ারমেইল ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আপনি আজ রাতে আবার ওই বাড়িতে যাবেন? আমার কেমন ভয় লাগছে।'

হাসলেন আবরার। 'ভয় পেতে হবে না। আজ রাতে আমার কিছু হবে না, শিলা।'

ঠিকই বলেছেন ডক্টর। কারণ ভিনগ্রহের হন্তারক তখন অন্য কাজে ব্যস্ত।



## সতেরো

বিরক্তিকর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ভিনগ্রহের প্রাণী অবশেষে

কোহ্লদের খামার বাড়িতে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেছে। এবার নিজের ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে। বেড়াল হোস্টকে সে এতদূরে নিয়ে এসে ডুবিয়ে দিয়েছে যে কেউ হয়তো কোনদিন তার খোঁজ পাবে না। আবরার যদি শোনে বেড়াল তার আগের আস্তানায় ফিরে যায়নি, সামান্য অবাক হতে পারে। তবে সে কোনদিনই জানতে পারবে না আজ রাতে, যখন আবরার ঘুমিয়ে থাকবে তার ওপর ভর করতে চলেছে ভিনগ্রহের হন্তারক।

তার পরিকল্পনাটি সরল। বেড়াল হয়ে ঘুরঘুর করা ছাড়া তার আর কোনও কাজ ছিল না আবরারের বাড়িতে। তবে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল যখন আবরার তাকে গুলি করবে বলেছিল। ফাঁদটা অবশ্য ঠিকই টের পেয়েছে সে। তাই ধরা দেয়নি ফাঁদে। সে টার্গেটে গিয়ে বসলে আবরারের মনে সন্দেহ জাগত। আবরার তাকে গুলি না করে যদি খাঁচায় পুরে রাখত তা হলে সর্বনাশের পোয়াবারো হত। না খাইয়েই হয়তো তাকে মেরে ফেলত আবরার।

যাক, সব ভালয় ভালয় গেছে। আজ রাতের পর সে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পারবে। সে এমন একজনকে তার হোস্ট বানাবে যে ছিল তার শত্রু কিন্তু হোস্ট হিসেবে অসাধারণ। এখন সবার আগে দরকার আবরারের বাড়িতে পৌঁছানো। তার তো আর নিজের চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। কাজেই একজনকে হোস্ট বানাতে হবে। সে-ই আবরারের বাড়িতে তাকে পৌঁছে দেবে।

হোস্টের খোঁজ করতে হলো না ভিনগ্রহের খুনীকে। জিম ব্রামার নিজেই হাজির হয়ে গেল হোস্ট হিসেবে। ছেলেটা রনির বয়সী, আগামী বছর কলেজে ঢুকবে। ইচ্ছে আছে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। আপাতত ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তার বাবা, মি. ব্রামার ছেলেকে বলেছেন তাদের প্রতিবেশী মিসেস

কোহ্লের বাড়িতে ফুট ফরমাশ খাটতে। মিসেস কোহলের ব্রামারদের কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

জিম মিসেস কোহলের বাড়িতে এসেছে তাকে কী করতে হবে জানাতে। মিসেস কোহল ওকে ক্ষেত থেকে কিছু ভুট্টা আর শসা নিয়ে আসতে বললেন। লাঞ্চে রান্না করবেন।

ক্ষেত থেকে জিনিসগুলো এনে জিম মিসেস কোহলের হাতে দিল। বেরিয়ে যাচ্ছে, মিসেস কোহল ডাক দিলেন। 'দাঁড়াও, জিম। লাঞ্চের সময় তো হয়েই গেল। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর আমার সাথে খাবে।'

আপত্তি করল না জিম। গোলাঘরে বিশ্রাম নেয়ার কথা বলে সে একটা খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। মাঠে অনেক কাজ করেছে সে। একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল। আর ওই সুযোগটাই কাজে লাগাল ভিনগ্রহের হন্তারক। ভর করল সে জিম ব্রামারের ওপর।

সেই রাতের ঘটনা। জিম ব্রামারদের নিজেদের বাড়ি। ডিনার শেষে নিজের ঘরে বসে খানিকক্ষণ 'পপুলার মেকানিক্স'-এর পাতা উল্টাল জিম, রেডিও শুনল। রাত দশটার দিকে ওর বাবা-মা যখন ঘুমাতে যাচ্ছে, চট করে রেডিও বন্ধ করে ফেলল জিম। বাবা-মাকে জানতে দিতে চায় না সে জেগে আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে জামা-কাপড় পরল জিম, পায়ে জুতো গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

ঝলমলে চাঁদনী রাত। জিম দ্রুত হাঁটা দিল মিসেস কোহ্লের বাড়ির দিকে। সরাসরি চলে এল কিচেনে, সিঁড়ির তলা থেকে বের করল কচ্ছপের খোলটাকে। শার্টের ভেতর পুরে সাবধানে বুজিয়ে দিল গর্ত। তারপর হনহন করে এগোল আবরারের

বাড়ির দিকে।

আবরারের বাড়ি অন্ধকার। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে সে। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে জুতো খুলে ফেলল জিম। পা টিপে টিপে চলে এল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের সিঁড়ির নীচে কচ্ছপের খোলটাকে লুকোবার চমৎকার জায়গা আছে। জিম খুবই সাবধানে সিঁড়ির নীচে গর্ত খুঁড়ে কচ্ছপ আকারের জিনিসটাকে কবর দিল। তারপর সতর্কতার সাথে বুজিয়ে দিল কবর। বোঝার উপায় থাকল না এখানে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে চলল জিম।

জিমকে ইচ্ছে করলে আজ রাতেই মেরে ফেলতে পারত হন্তারক। কিন্তু লোকের মনে আর সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে চায় না সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিমকে কাল সকালে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মেরে ফেলবে। ঘটনাটা এমনভাবে ঘটাবে, কারও মনে সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকবে না। সে জানে কাল সকালে জিম পাঁচ বুশেল শস্যসহ ট্রাক নিয়ে গ্রীনবে-তে যাবে। ট্রাক চালাবে জিম নিজে। ওর বাবার সাথে সেই কথাই হয়েছে। জিমের স্মৃতি ঘেঁটে সে দেখেছে গ্রীনবে-তে যাবার রাস্তায় একটা কংক্রিটের ব্রিজ পড়বে। ব্রিজে ওঠার পর জিমকে দিয়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেড়ে গাড়ি ছোটাবে ভিনগ্রহের প্রাণীটি। ধাক্কা খাওয়াবে পিলারের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িসুদ্ধ ছাতু হয়ে যাবে জিম। লোকে ভাববে ব্রেক ফেল করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে জিম। ব্যস, তারপর শুরু হবে আসল খেলা।



# আঠারো

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ডক্টর আবরারের। সকালে উঠে নাস্তা

বানালেন। তারপর ভাবতে বসলেন আজ কী কী কাজ আছে। শহরে যাবার কথা তাঁর। শিলা হয়তো কালরাতেই চিঠি আর স্টেটমেন্ট টাইপ করে রেখেছে। সকাল ন'টায় তাকে ফোন করবেন বলেছেন। এখন বাজে সাড়ে আটটা। তিনি স্টেশন ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই শেরিফকে ফোন করলেন আবরার। শেরিফ বললেন, 'ডক্টর, আবার পরে করুন। এইমাত্র স্টেট পুলিশ রেডিও কার থেকে একটা খবর পেয়েছি; বার্টলসভিল আর গ্রীনবে-র মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। ওখানে যেতে হবে এখুনি, সরি।' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন আবরার। ভাবছেন আবার কে অ্যাক্সিডেন্ট করল। তাঁর পরিচিত কেউ নয়তো? হলে শেরিফ হয়তো বলতেন।

একটু পরে আবার শেরিফের অফিসে ফোন করলেন ডক্টর। এবার ফোন ধরল তাঁর ডেপুটি। ডক্টর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন একটু আগে শেরিফের কাছে তিনি ফোন করেছিলেন। শেরিফ একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে ফোন রেখে দিয়েছেন তাড়া ছিল বলে। ডেপুটি কি বলতে পারবেন কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে?

ডেপুটি সজ্জন মানুষ। বলল জেমস ব্রামার নামে হাইস্কুলের এক ছাত্র মারা গেছে। বার্টলসভিলে তার বাড়ি। সে ট্রাক চালিয়ে গ্রীনবে-তে যাচ্ছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোজা ব্রিজের পিলারের সাথে ধাক্কা খেয়েছে ট্রাক। সাথে সাথে মারা গেছে ব্রামার।

জেমস ব্রামারকে চিনতে পেরেছেন আবরার। ছেলেটার কথা আগেও শুনেছেন মিসেস কোহ্লের মুখে। তার বাড়িতে কাজ করছিল ব্রামার। আর এই ব্রামারদের বাড়ির ধূসর বেড়ালই গতকাল পর্যন্ত আবরারের সাথে ছিল।

এখন ব্রামার বেচারা মারা গেছে। সন্দেহ নেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিন; প্রাণীদের আত্মহত্যার সাথে ব্রামারের মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টরের।

এবার আর ভয় লাগছে না আবরারের। বরং আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছেন, কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেলেছেন তিনি এইমাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর নষ্ট করার মানে হয় না।

ওই জিনিস্টা, ওটা যাই হোক, একজন কাউন্টি শেরিফের একে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে এফবিআই এবং পদস্থ বিজ্ঞানীদের। তবে শেরিফের সাথে যে তিনি কথাটা বলবেন না তা নয়, বলবেন। এফবিআই, সেই সাথে আর্মিকেও ব্যাপার জানানো দরকার।

সৌভাগ্যক্রমে দু'টি বিভাগেই হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় আছে ড. আবরারের। শিলার কাছ থেকে স্টেটমেন্টের কপি আসার পরপরই তিনি এদের সাথে কথা বলা শুরু করবেন। তবে সবার আগে যা করা দরকার তা হলো বিপজ্জনক ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসা। আবরার ঠিক করলেন তিনি আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়বেন ওখান থেকে। শিলার কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নিয়ে সোজা চলে যাবেন গ্রীনবে-তে, ওখানকার কোনও হোটেলে উঠবেন এবং ফোনে সবার সাথে যোগাযোগ শুরু করবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে তাঁর এফবিআই এবং আর্মির লোকজনদের ব্যাপারটা বোঝাতে সমর্থ হবেন। তারা বার্টলসভিলে আসবে তদন্ত করতে।

ভিনগ্রহের হন্তারক তার 'পারসেপ্টর সেন্স' প্রয়োগ করে দেখল ড. আবরার বাড়িতে নেই। আবরার তো প্রায়ই সকালে শহরে যায়। তবে সে মাছ ধরতে যায়নি বা হাঁটতে বেরোয়নি। কারণ

গাড়িটা নেই।

ড. আবরারের জিনিসপত্র চেক করল সে। ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসই যথাস্থানে আছে। শুধু কাপড়-চোপড় বাদে। সিঙ্কে ধোয়া ডিশ দেখে বোঝা যায় নাস্তা খেয়েই সে বেরিয়েছে। এত সকালে তার শহরে যাবার কথা নয়। কোনও কারণে তড়িঘড়ি করে বেরিয়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই; ফিরে আসবে সে। তারপর রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়বে–

বেড়াল হয়ে সে যে কটা দিন এ বাড়িতে ছিল, তার পারসেপটর সেন্স তেমনভাবে কাজ করেনি। তার পক্ষে বন্ধ ঘর বা ক্লজিটের ভেতরে উঁকি মারা সম্ভব হয়নি। পারেনি বন্ধ বই বা ভাঁজ করা চিঠি পড়তে। এখন, অবসরে, সে তার হারানো শক্তি আবার ফিরে পেতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মাটিতে কম্পন অনুভব করল সে, গাড়ি আসছে। আবরারের স্টেশন ওয়াগন। একাই আসছে সে। ঘড়িতে দশটা বাজে।

আবরার সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, হন্তারক তার 'পারসেপশন সেন্স' প্রয়োগ করল গাড়ির ওপর এবং এই প্রথম বুঝতে পারল কিছু একটা ভজকট হয়ে গেছে। গাড়িতে পুরানো তারপুলিন দিয়ে সযত্নে মুড়ে রাখা হয়েছে ধূসর বেড়ালটার লাশ। ভিনগ্রহের খুনীর দ্বিতীয় শেষ হোস্ট। একে আবরার কোথায় পেল, এটাকে গাড়িতেই বা রেখেছে কেন? আবরার কি তা হলে জঙ্গলে সেই প্রস্রবণের কাছে গিয়েছিল? সে এই সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেনি। সে শুধু পেছনে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কেউ পিছু নেয়নি বলে সন্তুষ্টবোধ করছিল সে। কিন্তু ওই ঝিরঝিরে বৃষ্টি–সন্দেহ নেই, মাটিতে তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করেছে আবরার। ইস, আবার সে ধরা খেল।

অসুবিধে নেই, আবরার বাড়ি ফিরেছে। এখন হোক আর

পরে হোক, নিশ্চয়ই সে ঘুমাবে। তারপর সে কী সন্দেহ করেছে তাতে কিছু আসবে যাবে না।

কিন্তু আবরার এটা কী করছে? সে স্টোররুম থেকে সুটকেস বের করে দোতলায় যাচ্ছে কেন? সুটকেসে জামা-কাপড়সহ নিত্য-ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসপত্র ঢোকাচ্ছে। তার মানে এখান থেকেও চিরতরে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছে।

উঁহু, এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। তাকে যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে।

ড. আবরার সুটকেস দুটো এনে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে রাখলেন। তারপর আবার বাড়িতে ঢুকলেন। দ্রুত একবার চক্কর দিলেন সারা বাড়ি, দরজা-জানালা বন্ধ করলেন। রান্নাঘরে ঢুকে ইতস্তত করলেন সুইচ অফ করবেন কিনা। তা হলে বেযমেন্টের গ্যাসোলিন ইঞ্জিন এবং জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাবে। যাক, বন্ধ করার দরকার নেই। ফ্রিজে খাবার আছে। নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আবার আসবেন। তবে একা অবশ্যই নয়।

ফিশিং ইকুইপমেন্ট, পিস্তল বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসলেন আবরার। স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন। ঠিক তখন ওটাকে চোখে পড়ল তাঁর।

একটা হরিণ। বিশালদেহী। গাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে, জঙ্গলের কিনারে, যেখান থেকে তার বাড়ির সীমানা শেষ এবং রাস্তার শুরু, ঠিক সেখানটায়। কটমট করে তাকিয়ে আছে হরিণটা আবরারের দিকে। তারপর নিচু করল মাথা, খুর দিয়ে ধুলো ওড়াল, হামলার জন্য প্রস্তুত।

ওটা কী করতে যাচ্ছে বুঝে ফেললেন ডক্টর। দ্রুত গিয়ার দিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে হরিণটাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দিল না হরিণ। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ওটাও শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। গাড়ি পিছিয়ে আনার সুযোগও

পেলেন না আবরার। দুশো পাউন্ড ওজনের শরীর নিয়ে চলন্ত মিসাইলের মত হরিণটা গোত্তা খেল রেডিয়েটরের কেন্দ্রে, দুই হেডলাইটের মাঝখানে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে খুলি ফেটে চুরচুর হয়ে গেল হরিণের, ঘাড় ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল লাশ হয়ে। ভয়ানক ঝাঁকি খেলেন আবরার, ড্যাশবোর্ডের সাথে ভীষণভাবে ঠুকে গেল মাথা, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল হরেক রঙের তারা।

থেমে গেছে ইঞ্জিন। আবরার ইগনিশন অফ করলেন, আবার স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলেন। জানেন এ গাড়ি গ্যারেজে না নিয়ে গেলে আর চলবে না।

তাঁর কাছে অস্ত্র আছে .২২ বোরের রাইফেল, পিস্তল আর শটগান। এ নিয়ে পায়ে হেঁটে শহরে যাবার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। এক পাল জানোয়ার যদি তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়, কী করতে পারবেন তিনি? মাঠ বা আল ধরে যাবার উপায় নেই। ওখানে ষাঁড় আর গরুর দল ঘাস খাচ্ছে। আর জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাবার প্রশ্ন নেই। ওখানে প্রচুর হরিণ আছে। একটা দু'টো ভালুক বা ওয়াইল্ড ক্যাট থাকাও বিচিত্র নয়। এগুলোর চেয়েও ভয়াবহ বিপদ আসতে পারে তাঁর শত্রু যদি ভাত-ঘুম দেয়া কোনও লোকের ওঁপর ভর করে বসে। যদি মিসেস কোহ্‌ল বা মিসেস ব্রামার শটগান বা রাইফেল নিয়ে হাজির হয়ে যায়, তাঁকে গুলি করতে শুরু করে তখন? উল্টো তিনিও কি গুলি করবেন? মহিলাদের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না, ভাল করেই জানেন আবরার, আর রাস্তায় হেঁটে গেলে জানোয়ার বা মানুষ যে-ই আসুক, কতজনকে হত্যা করবেন তিনি? কেউ না কেউ তাঁকে ঠিকই পেড়ে ফেলবে। তাঁর অজানা শত্রু একের পর এক হামলাকারীকে পাঠাবে। সবাইকে সামাল দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে—ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। তাঁর শত্রু—ওটা যাই হোক—আর ভান করার

প্রয়োজন বোধ করছে না। ওটা ড. আবরারকে এখানে আটকে রাখতে চাইছে, হয়তো সফলও হবে। পেছনের সিটে হাত বাড়িয়ে শটগান আর পিস্তল তুলে নিলেন ডক্টর। লোড করে রাখলেন।

অদ্ভুতই বলতে হবে, তাঁর একটুও ভয় করছে না, আগের চেয়ে অনেক শান্ত লাগছে নিজেকে। এ যুদ্ধে জিততে হলে উত্তেজিত হওয়া বা মাথা গরম করা চলবে না। এ যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে হবে মনের শক্তি। ফায়ার আর্মস দিয়ে লড়াই জেতা যায়, যুদ্ধ নয়।

প্রথম প্রশ্ন হলো—সারভাইভাল। তিনি এখানে বেশি নিরাপদ থাকবেন নাকি বাড়িতে? হয়তো বাড়িতে। শত্রু চায় না তাঁর কাছে কোনও সাহায্য আসুক। আচ্ছা, তিনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন এবং পালাবার চেষ্টা না করেন তা হলেও কি তাঁর শত্রু তাঁকে খুন করবে? মনে হয় না। শত্রু চাইলে অনেক আগেই তিনি মরে ভূত হয়ে যেতেন। গাড়িতে ওঠার আগেই হরিণটা তাঁকে গুঁতিয়ে দফারফা করে দিতে পারত। তিনি তো ওটাকে আগে লক্ষই করেননি।

ডক্টর আবরার সিদ্ধান্ত নিলেন বাড়িতে ঢুকবেন তিনি। পিস্তল পকেটে রেখে, শটগান রেডি করে সাবধানে গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। চারপাশে সতর্ক নজর বোলালেন। জ্যান্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তবে—

মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইলেন আবরার। একশ' ফুট উঁচুতে বাতাসে ধীর গতিতে বৃত্ত রচনা করে উড়ছে একটা ওয়াইল্ড ডাক। বুনো হাঁস ওভাবে ওড়ে না। তার মানে কি পরবর্তী হামলা আসছে আকাশ থেকে? এটা তো আরও বিপজ্জনক। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় শূন্য থেকে মিসাইলের মত কোনও শক্তিশালী, ওজনদার পাখি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের

ওপর তা হলে আর দেখতে হবে না।

আবরার বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন, ডাইভ দিল ওয়াইল্ড ডাক। ঝট করে বন্দুক তুললেন ডক্টর, দ্রুত সরে গেলেন এক পাশে। না, পাখিটা তাঁর ওপর হামলা করার জন্য ডাইভ দেয়নি। তাঁর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে, মাটিতে আছড়ে পড়ল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকলেন ডক্টর, বন্ধ করে দিলেন দরজা। না, শত্রু তাকে হত্যা করতে চায় না, এখানে বন্দী করে রাখতে চায়। ওয়াইল্ড ডাকটা তাঁকে ইচ্ছে করে মিস করেছে। শত্রু বুঝিয়ে দিল বাইরে গেলে কী দশা হবে তার।

শটগানের ওপরের ব্যারেল রিলোড করে অস্ত্রটা সদর দরজার পাশের জানালার সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন আবরার। পকেট খালি করে অতিরিক্ত শেল আর কার্তুজগুলো সোফায়, হাতের নাগালে রেখে দিলেন। তারপর সোফার হাতলে বসে তাকিয়ে রইলেন জানালা দিয়ে।

জীবনের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বাইরে। তা হলে কি সবই তাঁর কল্পনা? তিনি কি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হবেন শহরের উদ্দেশে? নাহ্, তা উচিত হবে না। হরিণ আর ওয়াইল্ড ডাকের চেহারা ভেসে উঠল চোখে।

আচ্ছা, তার শত্রুর প্রকৃতি কী? ওটা কি মানুষ, দানব নাকি ভিনগ্রহবাসী? হয়তো শেষেরটাই ঠিক।

শিলা বলেছিল না পৃথিবী ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করতে পারে।

কিন্তু ভিনগ্রহবাসীর তাঁর ওপর এত আক্রোশ কেন? এর কারণ কি এই–তিনি তার শত্রুর যে সব তথ্য জেনে গেছেন বা সন্দেহ করেছেন সেটা ভিনগ্রহবাসীর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে? হ্যাঁ, তাই হবে।

তাঁর ধূসর বেড়ালটার কথা মনে পড়ল। বেড়ালটা বন্দী

অবস্থায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছে। শিলার সাথে তাঁর আলাপচারিতা, স্টেটমেন্টের বিষয় কোনকিছুই হয়তো তার অজানা নেই। শত্রু তাঁকে বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। তবে তাঁকে মারার সুযোগ পেয়েও সে মারেনি, বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কোথাও যেতেও দিচ্ছে না। এখানেই আটকে রাখতে চায় সে। কিন্তু কেন?

তা হলে কি সে আবরারকে হোস্ট বানাতে চায়? হতে পারে। কিন্তু আগে কেন হোস্ট বানায়নি, এখন চাইছে কেন?

বাইরের পরিবেশ একেবারে শান্ত। আবরার রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভে পানি বসালেন। কফি বানাবেন। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে–তাকে হোস্ট বানাবার জন্য শত্রুর কি বিশেষ কোনও প্রস্তুতি দরকার?

হঠাৎ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন তিনি। ব্যাপারটা নিয়ে যত মাথা খেলালেন ততই পরিষ্কার হয়ে এল বিষয়টা, রনিকে হোস্ট বানানো হয়েছে ঘুমের মধ্যে। একই কাণ্ড ঘটেছে হেলমুট কোহলের ক্ষেত্রেও। জিম ব্রামারও নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে অজানা শত্রুর শিকার হয়েছে। আর জানোয়ার হোস্টগুলো বিশেষ করে কুকুর এবং বেড়ালরা–এরা তো দিনে-রাতে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু শত্রু যদি তাকে হোস্ট বানাতে চায় তা হলে কাল রাতে ভর করল না কেন? হতে পারে, কাল রাতে আবরারের ভাল ঘুম হয়নি, একটু ঘুমিয়েছেন; আবার জেগে উঠেছেন। আবার এমনও হতে পারে জেমস ব্রামারকে হোস্ট বানাবার কাজে তাঁর শত্রু ব্যস্ত ছিল বলে এদিকে নজর দিতে পারেনি। তবে এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসে। আর তা হলো–শত্রু দু'জন নয়, একজন এবং সে একবারে একজনকেই হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে। তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যেত–

ডক্টর হঠাৎ শটগান নিয়ে দরজা খুললেন, সতর্ক ভঙ্গিতে

কয়েক পা বাড়ালেন সামনে, তাকালেন ওপরের দিকে।

পাখি, বড় বড় পাখি, ছ'সাতটা হবে, আকাশে পাক খাচ্ছে। তা হলে কি ডক্টরের ধারণা ভুল?

পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে। ওগুলো অদৃশ্য শত্রুর হোস্ট নয়, কতগুলো শকুন, মৃত হরিণের লোভে এসেছে। একেবারে সাধারণ পাখি। শকুন দেখে এত আনন্দ কখনও হয়নি আবরারের, এখন যেমন আনন্দ হচ্ছে।

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে আরেকটা পাখি উড়ে আসতে দেখলেন তিনি, মনে হলো বুনো হাঁস। পাখিটা অনেক উঁচুতে উঠে গেল, তারপর ডাইভ দিল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তিনি গুলি করতে পারতেন, কিন্তু বেশি ঝুঁকি হয়ে যায় উপলব্ধি করে চট করে পিছিয়ে এলেন, বন্ধ করে দিলেন দরজা। এক সেকেন্ড পর বিকট শব্দে পাখিটা আছড়ে পড়ল বারান্দায়। চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল আবরারের। বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছেন। তবে তাঁর শত্রুর একটি সীমাবদ্ধতার কথাও জেনে ফেলেছেন। শত্রু শুধু ঘুমন্ত প্রাণীদেরকেই কব্জা করতে পারে, জেগে থাকা কাউকে নয়। আর ওটাকে ঘুমন্ত প্রাণী খুঁজে বের করতে হয়। এতেও নিশ্চয়ই সময় নষ্ট হয়।

ভয়ঙ্কর এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা নয়। আশার কথা, শিলা জানে তিনি তার সাথে দেখা করবেন। যথাসময়ে তাঁর দেখা না পেলে সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে ফোন করবে শেরিফকে। শেরিফ হয়তো খবর পেয়ে আসবেন। তাঁকে যদি অদৃশ্য শত্রুটা মেরেও ফেলে, তাঁর লোকবল আছে অনেক। সশস্ত্র লোকগুলোর বিরুদ্ধে ক'টা প্রতিরোধ পাঠাবে শত্রু? শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হবে।

হ্যাঁ, সাহায্য আসবে। তবে ডক্টর আবরারের কাজ এখন একটাই–কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

## উনিশ

এ যেন অনন্ত সময়, সীমাহীন, স্থির, কাটতে চায় না কিছুতেই। তবু প্রাকৃতিক নিয়মে দিন গড়িয়ে রাত এল, এল ঘুমাবার সময়। ডক্টর আবরার সারা বাড়ি ঘুরছেন, ওপরে যাচ্ছেন, নীচে যাচ্ছেন, আলো জ্বালছেন, নিভাচ্ছেন, অস্থির লাগছে তাঁকে।

হঠাৎ সবগুলো আলো নিভে গেল একসাথে। জেনারেটর? হ্যাঁ, জেনারেটরের কারণেই বাতি নিভে গেছে। কিন্তু গ্যাসোলিন মটরে যে পরিমাণ ফুয়েল আছে তা দিয়ে আরও কয়েকদিন হেসে খেলে চলার কথা। হয় জেনারেটর নতুবা মোটর, দুটোর যে কোনও একটা নষ্ট হয়ে গেছে।

শত্রু আবার আরেক হোস্টকে ব্যবহার করেছে। সম্ভবত ইঁদুর-সেলারে ইঁদুরের অভাব নেই। ইঞ্জিন বা মোটরের তার কেটে ফেলেছে ইঁদুরকে দিয়ে। জেনারেটর চালিয়ে লাভ হবে না। শত্রু আবার ওটা নষ্ট করে দেবে।

অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

নিকষ আঁধারে ঘুম পেতে লাগল আবরারের। আর ঘুমালেই সব শেষ।

একটু পরে আকাশে চাঁদ উঠল। মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ। তবে আলোটা ঝকঝকে, আকাশ ঝলমল করছে অগুনতি তারায়। বাইরেটা দিনের আলোর মত ফকফকা, সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ঘরের আঁধারও অনেকখানি দূর হয়ে গেছে। লিভিং রুমটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখের সামনে। হাঁটার সময় অন্তত হোঁচট খেতে হবে না আবরারকে। তাঁর একটা ফ্ল্যাশলাইট আছে, কিন্তু অতিরিক্ত

ব্যাটারি থাকলেও সারারাত জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অল্প অল্প জ্বালাতে হবে।

কতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন তিনি? কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ক্লান্তও লাগছে, তারপরও আরও চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন আবরার।

খিদে পেয়েছে। কিন্তু ডক্টর ঠিক করেছেন কিছু খাবেন না। খাবার পেটে গেলে ঘুম পেয়ে বসবে তাঁকে। ক্ষুধার্ত মানুষ খিদে নিয়ে জেগে থাকতে পারে, কারণ খিদের চোটে ঘুম পালাতে বাধ্য।

পায়চারি শুরু করলেন আবরার। পাল্টা হামলা করার কথা ভাবছেন। কিন্তু কীভাবে?

যে শত্রুর চেহারাই তিনি এখন পর্যন্ত দেখেননি তাকে আঘাত করবেন কীভাবে? ওটা কি অদৃশ্য নাকি ওকে দেখা যায়? শরীর আছে? তাঁর মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে শত্রু। কাল সকাল বেলা শত্রু নিধন অভিযানে নেমে পড়বেন তিনি, জীবিত কিছু চোখে পড়া মাত্র গুলি করবেন।

লম্বা, দীর্ঘতম রাতটার এক সময় অবসান ঘটল। ফুটল ভোরের আলো। আবরার নেমে পড়লেন শত্রুর খোঁজে। প্রতিটি ঘর, বেযমেন্ট কিছুই বাদ দিলেন না। তিনি জানেন না আসলে কী খুঁজছেন, ওটা ছোট না বড় কিছুই জানা নেই তাঁর। বেযমেন্টে গিয়ে দেখলেন জেনারেটরের তার কাটা। শত্রু ইঁদুর টিদুর দিয়ে কাজটা করিয়েছে। ঠিক করে লাভ হবে কোনও? তিনি ওপরে যাওয়া মাত্র কাউকে দিয়ে আবার তার কেটে দেয়া হবে।

হঠাৎ ছাদের দিকে তাকাতে বুক ধক্ করে উঠল। একটা মথ উড়ছে ওখানে। শত্রু মথের ছদ্মবেশে তার ওপর নজরদারী করছে না তো?

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন আবরার, স্টোর রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। দ্রুত নেমে পড়লেন কাজে। কোট

হ্যাণ্ডার বাঁকিয়ে, স্লিপিংব্যাগ ছিঁড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রজাপতি ধরার জাল বানিয়ে ফেললেন। খুবই বাজে এবং হাস্যকর দেখতে হলো জিনিসটা। তবে কাজ চলে যাবে।

মথটা এখনও ছাদের নীচে উড়ে বেড়াচ্ছে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর ফাঁদে আটকানো গেল ওটাকে। তারপর সাবধানে পতঙ্গটাকে একটা খালি দেশলাই বক্সের মধ্যে ঢোকালেন আবরার। মথটা খুব সহজে মরবে না, এর মধ্যে এখান থেকে তিনি পালাতে পারবেন। অবশ্য মথটা যদি সত্যি—

শটগান নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন ডক্টর। চারপাশে নজর বুলালেন। ভীতিকর কিছু চোখে পড়ল না। আকাশেও কোনও পাখি উড়তে দেখা যাচ্ছে না।

গভীর দম নিলেন আবরার, হাঁটা শুরু করলেন। মাত্র দশ কদম এগিয়েছেন, হঠাৎ মাথার ওপর পতপত শব্দ হতে মুখ তুলে চাইলেন। বুক হিম হয়ে গেল বিশাল আকারের একটা চিকেন হককে তাঁকে ঘিরে বৃত্তাকারে উড়তে দেখে। ওটা আবরারকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, হত্যার উদ্দেশে নয়, ভয় দেখিয়ে ঘরে ফেরাতে।

ভয়ঙ্কর মিসাইলের মত ছুটে আসছে চিকেন হক, আবরারের কাছ থেকে যখন আট/দশ হাত দূরে, ডক্টরের হাতের শটগান গর্জে উঠল বিকট শব্দে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল পাখিটা শক্তিশালী বুলেটের আঘাতে। রক্ত আর পালক লাগল আবরারের মুখে। তাঁর কাছ থেকে দু'হাত দূরে এসে ছিটকে পড়ল ওটা।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন ডক্টর। মুখ ধুলেন, পোশাক ঠিকঠাক করে কিচেনে ঢুকলেন। দেশলাইয়ের বাক্স খুলে মথটাকে বের করলেন আবরার, ছেড়ে দিলেন। ভুল ভেবেছেন তিনি। ওটা স্রেফ সাধারণ একটা মথ, তার শত্রুর হোস্ট নয়। তাঁর পরিকল্পনাটা ভালই ছিল, কিন্তু শত্রু তাঁকে কোনও সুযোগ দিতে রাজি নয়।

# বিশ

কিছুই ঘটল না।

মিনিটগুলো যেন ঘণ্টা। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ড. আবরার অল্পক্ষণ মাত্র ঘুমাতে পেরেছেন। বেশিরভাগ সময় পায়চারি করে কাটিয়ে দিচ্ছেন এই জানালা থেকে ওই জানালায়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন বাইরে। পা দুটো ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে, আরাম করে বসার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছেন না। যদি ঘুমিয়ে পড়েন! প্রায়ই কফি পান করছেন, তবে এখন ঠাণ্ডা খাচ্ছেন, ঠাণ্ডা কফিতে ঘুম কম আসে।

সকাল হয়েছে। তবে বড় ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। আবরার আশায় আছেন শেরিফ অথবা স্টেট পুলিশ এসে পড়বে, না হলে শিলা তো আসবেই। সে হয়তো বুঝতে পারবে আবরার বিপদে পড়েছেন। না হলে মিস শিলার সাথে তিনি দেখা করতেন।

আর বেশিক্ষণ হয়তো জেগে থাকা সম্ভব হবে না। আগে সোফার হাতলে একটু বসতেন, এখন তাও সাহস হচ্ছে না। বার বার বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে চোখ, জোর করে মেলে রাখতে হচ্ছে। পাইপ টানতে টানতে তেতো হয়ে গেছে মুখ। এ মুহূর্তে ঘুম তাড়ানোর মহৌষধ বেনজেড্রিন ট্যাবলেট বড় দরকার ছিল। কিন্তু সাথে আনেননি তিনি। ছুটি কাটাতে এসে কি কেউ ঘুম তাড়াবার ওষুধ খায়? সকাল গড়িয়ে দুপুর আসছে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর, তবে কাঁচের গায়ে মাথা ঠেকাতেও সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন।

চট করে শটগানটা নিয়ে সদর দরজা খুললেন আবরার।

তবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভেতরে, শেরিফ বা যে-ই হোক, বাইরে থেকে হামলা এলে তাকে কাভার দিতে প্রস্তুত।

উঠোনে চলে এল গাড়ি। ছোট গাড়ি, ভক্সওয়াগন, ভেতরের যাত্রী মাত্র একজন–শিলা রহমান।

দ্রুত হাত নাড়তে শুরু করলেন আবরার, চলে যেতে বলছেন শিলাকে। কিন্তু শিলা ডক্টরকে দেখতে পেল না, সে তাকিয়ে আছে স্টেশন ওয়াগন আর মরা হরিণের দিকে। গাড়ি দেখে শকুনের দল অলস ভঙ্গিতে উঠে গেল লাশ ফেলে। ইঞ্জিন বন্ধ করার আগে শিলা মুখ তুলে চাইল দরজার দিকে, দেখতে পেল ডক্টরকে।

'শিলা!' গলা ছেড়ে চেঁচালেন তিনি। 'শিগগির শহরে চলে যান। পুলিশকে খবর দিন আর–'

চেঁচিয়ে লাভ হলো না। খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছেন আবরার–একটা ষাঁড় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে, মাত্র একশ হাত দূরে। আবরার কাছ থেকে ভক্সওয়াগনের দূরত্ব ১২ ফুট, হঠাৎ জিতে যাবার একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন তিনি। যদিও কাজটা বিপজ্জনক। ষাঁড়টাকে গুলি করে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিলে ওটা মরবে না, আর শত্রু অন্য হোস্ট নেয়ার সুযোগও পাবে না।

শিলাকে গাড়িতে থাকতে বলে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তাক করলেন শটগান; দূরত্বটা মাপছেন, সামনের পা জোড়ায় যদি গুলি করা যায়–

আবরারের লক্ষ্য মন্দ নয়, তবে উত্তেজনার চোটে একটু তাড়াতাড়ি গুলি করে ফেললেন। ষাঁড়ের গায়ে গুলি লাগল, তবে থামল না ওটা। প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল আহত জানোয়ার, দিক বদল করে এবার সোজা ছুটে আসতে লাগল আবরারকে লক্ষ্য করে। মাত্র দশ হাত দূরে থাকতে দ্বিতীয় ব্যারেল বিস্ফোরিত হলো, একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে গুলি, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে ষাঁড়ের, দড়াম করে মাটিতে আছড়ে

পড়ল ওটা। আর নড়ল না।

ভক্সওয়াগনের দরজা মেলে ধরলেন ড. আবরার, 'তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকুন, শিলা। ওটা আবার যে কোনও সময় হামলা চালিয়ে বসতে পারে। সময় নষ্ট করবেন না।'

শিল্লাকে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন। শটগানে গুলি নেই, আর অতিরিক্ত কার্তুজগুলো রয়ে গেছে ভেতরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। বড় একটা পাখি, শকুন নয়, উড়ে আসছে। তবে ওটা হামলা চালাতে চাইলেও দেরি হয়ে গেছে। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, বন্ধ করে দিলেন দরজা।

দ্রুত শটগানে গুলি ভরতে ভরতে গতকাল আর আজকের ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বললেন ডক্টর শিলাকে। 'ইস ডক্টর,' বলল শিলা। 'শেরিফকে যে কেন নিয়ে এলাম না আমার সঙ্গে! কাল বিকেলে ওঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনার কথা উনি বিশ্বাস করেননি। তবে বলেছেন আসবেন। আজ সকালে আবার কথা বলেছি। বললেন কাল সকালের আগে আসতে পারবেন না। শেরিফের কথা শুনে মনে হলো উনি ভেবেছেন পুরোটাই আমাদের কল্পনা। তাই গা ছাড়া ভাব দেখেছি তাঁর মধ্যে।'

'কাল সকালে...' চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল আবরারের। এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। 'উঁহুঁ, অতক্ষণ জেগে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি...নাহ্, শিলা আপনার আসলে উচিত হয়নি এখানে আসা। এখন আপনিও খামোকা বিপদে জড়িয়ে পড়লেন।'

'আমার গাড়িতে চড়ে শহরে যাবার কোন চান্স নেই? ধরুন, আমি গাড়ি চালালাম আর আপনি বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকলেন।'

'সে চান্স একশ'ভাগের এক ভাগ, শিলা, জঙ্গলে শুধু ষাঁড় নয় প্রচুর গরুও আছে। আর শিংঅলা প্রকাণ্ড হরিণগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। আর বিরাট আকারের কোনও পাখি শূন্য

থেকে আপনার হালকা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়লে ওটার দফারফা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ফিরতে দেরি দেখলে আপনার প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেবে না?'

'মনে হয় না। কারণ প্রায়ই গ্রীনবেতে আমি সিনেমা বা নাটক দেখতে যাই, তখন এক কাজিনের বাসায় থাকি। কাজেই আজ রাতে বাসায় না ফিরলে আমার প্রতিবেশীরা ভাববে আমি গ্রীনবেতে গেছি। ইস, আমি না এসে যদি পুলিশে খবর দিতাম! বুদ্ধিটা মাথাতেই আসেনি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত তুলে ওকে থামালেন আবরার। 'নিজের ওপর দোষ চাপাতে হবে না। ভুলটা আমারই। দুটো ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। ধূসর বেড়ালটা মারা যাবার পর আমার এখানে রাত কাটানোই উচিত হয়নি। আর গতকাল সকালে জিম ব্রামারের মৃত্যুর ঘটনা শোনার পর জিনিসপত্র নিতে বাড়ি ফেরা মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আর ধরাটা তখনই খেলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

'চলুন, কফি খাওয়া যাক,' বললেন আবরার। 'এতক্ষণ শুধু ঠাণ্ডা কফি গিলেছি এখন এক কাপ গরম কফি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যায়। আপনি কথা বলুন। দু'জনে মিলে একটা কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের করা যাবে।'

কফির জন্যে পানি চড়িয়েছে শিলা, আবরার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। বেশিরভাগ কথা তিনিই বললেন, ঘুম তাড়াতে হলে কথা বলতেই হবে। অনবরত কথা বলে গেলেন তিনি। এক পর্যায়ে শিলা রহমানকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন তো?'

'এই যে আমার সাথে এ ভাবে কথা বলে আমাকে জাগিয়ে রাখবেন। আমি ঘুম তাড়াবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি। কিন্তু আপনার খিদে লাগলে খেয়ে নিতে কসুর করবেন না। ফ্রিজ গত সন্ধ্যা থেকে চলছে না। তবে টিন বোঝাই খাবার আছে

প্রচুর।'

কফি বানানো শেষ, দুটো কাপে কফি ঢেলে টেবিলে রাখল শিলা। 'ধন্যবাদ। তবে আমার খিদে পায়নি। ভাবছি আরও দু'তিন পট কফি বানিয়ে রাখব কি না।'

'ইচ্ছে হলে রাখুন। কিন্তু কেন?'

'কারণ আপনার মানে আমাদের শত্রু ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়েছে, যে কোনও সময় গ্যাস সাপ্লাইও বন্ধ করে দিতে পারে। আর কফি না খেয়ে আপনি জেগে থাকতে পারবেন না। সে ঠাণ্ডা-গরম, যাই হোক।'

'মনে হয় এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ বুটেন ট্যাঙ্কের বালব্ খুলতে রেঞ্জ লাগবে। আর মানুষ ছাড়া কারও পক্ষে ওটা মোচড় দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। সে এখানে মানুষ হোস্ট পাবে কোথায়? তবু সাবধানের মার নেই। আচ্ছা, কফি বানান।'

স্টোভে পানি ঢেলে শিলা ডক্টরের মুখোমুখি বসল।

'পানি সাপ্লাইয়ের কী অবস্থা? ওটা বন্ধ করে দেয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে? তা হলে কয়েক কলসি পানি ভরে রেখে দিই।'

'তার দরকার আছে বলে মনে হয় না,' বললেন আবরার, 'আমাদের শত্রু পানি তোলার পাম্প নষ্ট করে ফেললেও ক্ষতি নেই। কারণ ভারী ট্যাঙ্কির সে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর ওটা ভরা আছে। দুশো গ্যালনের কম হবে না। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।'

কফি খেয়ে বাথরুমে ঢুকলেন আবরার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে। এতে ঝিমুনির ভাব অনেকটাই কেটে গেল। এই ফাঁকে শিলা নীচ তলার জানালা দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এল। হরিণটাকে ঘিরে আছে শকুনের দল। ষাঁড়ের কাছে যায়নি, সম্ভবত হরিণের মাংস তাদের কাছে বেশি সুস্বাদু মনে হয়েছে।

গোসল সেরে দু'জনে আবার নানা বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা শুরু করে দিলেন। ডক্টর বললেন, 'খুব শীঘ্রি কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এটা আসলে ধৈর্য পরীক্ষার খেলা। আমরা কেউ বেরুবার চেষ্টা করলেই সে হামলা চালাবে। তবে ঘরের ভেতর থেকে কোনও হামলা আসবে বলে মনে হয় না। তা হলে অনেক আগেই ঘটতে পারত। প্রকাণ্ডদেহী যে কোনও জানোয়ার দরজা বা জানালা ভেঙে ঢুকতে পারত।'

'অবাক লাগছে ভেবে,' বলল শিলা, 'আপনার বিরুদ্ধে কোনও মানুষ হোস্ট পাঠায়নি কেন সে?'

'কারণ আমাকে খুন করা তার উদ্দেশ্য নয়। তবে পাঠালেই ভাল হত। ধাবমান ষাঁড়কে হত্যা ছাড়া ঠ্যাং খোঁড়া করা বিপজ্জনক কাজ, মানুষকে নয়।'

'ডক্টর, আমি যখন এলাম–আপনি কী করে বুঝলেন আমি আপনার শত্রু নই? আপনি সহজেই আমাকে গুলি করতে পারতেন।'

হেসে উঠলেন আবরার। 'ওই চিন্তা মাথাতেই আসেনি আমার। যদি তাই হত, তা হলে ধরে নিতাম, শত্রু একবারে একাধিক মানুষ বা প্রাণীকে হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাই তাড়াতে তাড়াতে বললেন, 'গোসল করে ভালই হয়েছে। আমি একটু ওপরে গেলাম। এই ফাঁকে আপনি খেয়ে নিন।'

ওরা পালাক্রমে ওপর আর নীচের জানালা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখছে। তবে ডক্টর শিলাকে বিশ্রাম নিতে বলে একাই রাউন্ড দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কারণ এটা ঘুম তাড়ানোর ওষুধ হিসেবে কাজ করবে।

সময় বয়ে চলল ধীর গতিতে। দু'জনে কত পরিকল্পনা করল এখান থেকে কেটে পড়ার। কিন্তু কোনওটাই কারও মনঃপূত হলো না। অবাস্তব এবং বিপজ্জনক ঠেকল সবগুলো প্ল্যান।

ইতিমধ্যে ডক্টর আরেকবার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল সেরেছেন। তবে এবার গোসল করেও খুব একটা লাভ হলো না। বাথটাবের মধ্যে শুয়ে তিনি তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিলেন। তখন একটা বুদ্ধি বের করলেন ডক্টর। শিলাকে পানি ভরা গ্লাস দিয়ে বললেন, শিলা যখনই দেখবে ঘুমে ডক্টরের চক্ষু মুদে আসছে, সাথে সাথে সে পানির ছিটা দেবে।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় দু'দু'বার পানির ছিটা দিতে হলো আবরারের মুখে। দু'বারই কথা বলার সময় মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত হয়ে যাবে। সন্দেহ হলো অতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন কিনা।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন আবরার, বললেন, 'শিলা, এতে কাজ হবে না। আমাকে পেরেক মারা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলেও আমি ঘুমিয়ে পড়ব। বিপদ যেহেতু দুজনেরই কাজেই আপনাকে বলে দিচ্ছি কী করতে হবে।

'এক–এখনও যেটুকু শক্তি আছে শরীরে, পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছুতে পারব আমি–নিদেন কাছের কোনও ফার্ম হাউজে যেখানে টেলিফোন আছে। আমি শটগান নিয়ে যাব, পিস্তলটা আপনার কাছে থাকবে। হয়তো কাজটা করতে পারব আমি। হয়তো বিপদটাকে আমরা বেশি বড় করে দেখছি, শত্রুর সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতাও হয়তো বড় করে দেখছি। যাই হোক, শহরে পৌঁছুতে পারলে আমি আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা করব। স্টেট পুলিশ আসবে শটগান আর টমিগানে সুসজ্জিত হয়ে। আর যদি যেতে না পারি–'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল শিলা। 'আপনি গেলে আমিও যাব আপনার সাথে। তবে গাড়িতে। আর আমি গাড়ি ড্রাইভ করব। আর পায়ে হেঁটে যে যেতে চান তাতে কী লাভ হবে?'

'আমি জেগে থাকতে পারব। তা ছাড়া আকাশের দিকে নজর

রেখে চলাও সম্ভব হবে। আগেই বলেছি ওপর থেকে কোনও শক্তিশালী পাখি ডাইভ দিয়ে পড়লে আপনার হালকা গাড়ি তা সামাল দিতে পারবে না। আমাদের যে কেউ ওই হামলায় মারা যেতে পারি।'

আর দ্বিতীয় বিকল্প হলো—আমি যদি এ ঘরে বসে ঘুমিয়ে পড়ি আপনি আমাকে বেঁধে রাখবেন। আমি বাঁধা অবস্থায় থাকলে শত্রু আমার ওপর ভর করলেও কোনও ফায়দা করতে পারবে না। যেমন আমাকে দিয়ে আপনার ওপর হামলা করাতে পারবে না। আর আমাকে খুন করতে না পারলে তখন আরেক হোস্টের ওপর নির্ভর করতে সে বাধ্য হবে। এতে সুবিধে হবে আপনি গাড়ি নিয়ে শহরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসতে পারবেন।

'কিন্তু—কী ধরনের সাহায্য, আপনি যদি—'

'কী ঘটবে না দেখা পর্যন্ত বলা মুশকিল। তবে আপনি শহরে পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই। আপনি আপনার স্টেটমেন্ট নিয়ে হাইয়েস্ট অথরিটির সাথে দেখা করবেন। এফ.বি.আইতে ফোন করবেন। রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান, যাকেই পান গল্পটা খুলে বলবেন। ওরা দু'জনেই আমার বন্ধু। আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ওরা। নাম দুটো মনে থাকবে নাকি লিখে দেব?'

'রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান। মনে থাকবে। কিন্তু আমি শহরে যেতে পারব তো? আমি কী করে জানব আপনি ঘুম থেকে উঠে রশি মুক্ত হতে চাইবেন না?'

'ওই কাজ করলে আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন। আর যদি না করি তা হলে আপনি শটগান নিয়ে বারান্দায় নেমে পড়বেন। খেয়াল রাখবেন কেউ আপনাকে হামলা করতে আসে কি না। যদি না আসে তা হলে শহরে যাবার সুযোগ নেবেন। আচ্ছা, দাঁড়ান—আরেকটা কাজও করতে পারেন। আপনাকে

শহরে যাবার ঝুঁকিই নিতে হবে না। কাল সকালে তো শেরিফ আসবেনই। আমাকে ততক্ষণ স্রেফ বেঁধে রাখুন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পরিষ্কারভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে বেঁধে রাখাটাই ভাল।'

'তা হলে রশি নিয়ে আসুন।'

রান্নাঘরে ঢুকল শিলা রশি আনতে। ড. আবরার লিভিংরুমে ফিরে এলেন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন, শটগান থাকল সদর দরজার পাশে, দেয়ালে হেলানো।

'এসব জিনিস যেন আমার হাতের নাগালে না আসে,' শিলা কিচেন থেকে রশি নিয়ে ফেরার পর তিনি বললেন, 'ছুরিটাও। আগে পিছমোড়া করে আমার হাত বাঁধুন, তারপর পা। আর শুনুন, যদি আমি পাগলের মত আচরণ করতে থাকি, কোনও সুযোগ আমাকে দেবেন না। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলবেন। তবে মেরে ফেলবেন না। আমাকে মেরে ফেললে আমার শত্রু নতুন হোস্টের ওপর ভর করবে। এমনকী হোস্ট হিসেবে সে আপনাকেও বেছে নিতে পারে। যদি শেরিফ কাল সকালে পৌঁছার আগেই আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।'

দ্রুত হাতে আবরারকে রশি দিয়ে বাঁধছে শিলা, জিজ্ঞেস করল, 'শহরে যাবার চেষ্টা করার চেয়ে এটা কি বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনি এতে বিপদমুক্ত থাকবেন। আর আমার জন্যও এটা আর বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলেন। বাঁধনটা বেশি টাইট হয়ে গেল?'

'না, ঠিক আছে। ইচ্ছে করলেও এ বাঁধন খুলতে পারব

না। আমি শুয়ে পড়লাম। যতক্ষণ পারি জেগে থাকার চেষ্টা করব।'

কিন্তু পারলেন না আবরার। তিনি শুয়েছেন, শিলা তাঁর পায়ে রশি বেঁধেছে, প্রায় সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন ডক্টর আবরার।

শিলা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তাঁর পাশে। তারপর শটগানটা নিয়ে দরজা খুলল, তাকাল ওপর পানে। বিশাল এবং কালো আকারের কী যেন ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে এল তার দিকে, আঁতকে উঠল সে, একলাফে পিছিয়ে এল, বন্ধ করে দিল দরজা। ঠিক তখন ভারী কিছু একটা সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল বন্ধ দরজায়।

দরজায় ধাক্কা মারছে একটা শকুন। মরা হরিণটাকে খেতে ব্যস্ত এক দল শকুনের ওটা একটা, ভিনগ্রহের হন্তারক এ মুহূর্তে এই পাখিটাকে তার স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যবহার করছে।

শিলার আগমনে বিরক্ত হয়েছে সে। তার ইচ্ছে ছিল ষাঁড়টাকে দিয়ে মেয়েটার গাড়িটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু আবরার তাকে গুলি করল, সে বুঝতে পারল ডক্টর ষাঁড়টাকে প্রাণে মারতে চাইছে না, পঙ্গু করে ফেলতে চাইছে। তখন নিজের জান বাঁচাতে আবরারের দিকে ছুটে যায় সে, আবরার মারমুখী ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে আবার গুলি করতে বাধ্য হয়।

ষাঁড়ের অপমৃত্যুর পরপর হন্তারক বাড়ির পেছন দিকের সিঁড়ির নীচে তার কচ্ছপের খোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা এবং পুরুষটার সমস্ত কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে শহরে যাওয়া যে তাদের জন্যে বিপজ্জনক এবং সে কারণে সে চেষ্টাও তারা করেনি বোঝার পর স্বস্তিবোধ করেছে ভিনগ্রহের প্রাণী, স্কুল শিক্ষিকার গাড়িটা আর

নষ্ট করার প্রয়োজনবোধ করেনি।

শেরিফ কাল সকালে আসতে পারে শুনেও সে উদ্বিগ্ন হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত ক্ষমতা সে যথেষ্টই রাখে। যে-ই আসুক, সে প্রথম সুযোগেই গাড়ি ধ্বংস করে ফেলবে, হত্যা করবে গাড়ির মালিককে। কোনও সাহায্য সে আসতে দেবে না এ বাড়িতে।

সত্যি বাইরে থেকে কোনও সাহায্য আসছে কিনা দেখার জন্যে উড়ন্ত হোস্ট ব্যবহার করল হন্তারক। একটা চিকেন হককে এ কাজে লাগাল সে। রাস্তার ওপর চক্কর দিতে শুরু করল পাখিটা, তীক্ষ্ণ নজর রাখল বাড়ির ওপর। এতে অবশ্য একটা অসুবিধে হলো। উড়ন্ত হোস্টের সাথে ব্যস্ত থাকায় সে তার পারসেপটিভ সেন্স বাড়ির ভেতরে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলো। ফলে ভেতরে কী ঘটছে অনেক সময় জানা হলো না তার। আবরার যখন বলছেন তাঁর পক্ষে আর জেগে থাকা সম্ভব হবে না, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ওই সময় আরেকটি ফ্লাইং হোস্ট ব্যবহার করল চারপাশে নজর বুলাতে। সে ধরে নিয়েছে এরপর আর কোনও উড়ন্ত হোস্টের তার প্রয়োজন হবে না, তাই শেষবারের মত রাস্তা-ঘাট চেক করে দেখছিল সে। ফলে আবরার আর শিলার মধ্যে সর্বশেষ কী কথা হলো জানতে পারল না সে, জানা হলো না আবরারকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটিও।

কাজেই, ভিনগ্রহের খুনী অবাক হয়ে গিয়েছিল শিলাকে একা শটগান হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে। মহিলাকে লক্ষ্য করে শকুনটাকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করে সে, তবে শিলা দ্রুত ঘরে চলে যাওয়ায় টার্গেট মিস হয়ে যায়। শকুনটাকে মেরে ফেলে ভিনগ্রহের হন্তারক আবার ফিরে এসেছে নিজের খোলসে।

সে খুবই অবাক হয়েছে তার চূড়ান্ত হোস্ট আবরারকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঘুমাতে দেখে। ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে। কিন্তু দড়ি বাঁধা অবস্থায় কেন? এখন আবরারের শরীরে ঢুকলেও লাভ হবে

না কিছু। বাঁধন না খুলে আবরার কিছুই করতে পারবে না। তবে মেয়েটা নিশ্চয়ই সারা জীবন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না। এক সময় দড়ি খুলতেই হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল আবরারের ভেতরে ঢুকবে। যেহেতু আবরার ঘুমাচ্ছে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে, আবরারের একান্ত গোপন ভাবনা এবং স্মৃতিগুলোর কথা জেনে নিতে পারবে ভিনগ্রহের হন্তারক। তারপর মাঝরাতের দিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে আবরারকে। ডক্টরকে দিয়ে এমন স্বাভাবিক আচরণ সে করাবে যাতে মেয়েটার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে এবং তার বাঁধন খুলে দেয়। তারপর–তারপর কী করবে সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত ডক্টর আবরারকে কব্জা করা যাক।

ভিনগ্রহের হন্তারক ঢুকে পড়ল আবরারের শরীরে।

শরীরের ভেতরে ঢোকার পরপরই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তার। এ পর্যন্ত যতগুলো প্রাণী বা মানুষের মনের ভেতর ঢুকেছে সে, প্রতিটি মন অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। তবে ওটাকে কোন বাধাই মনে করেনি ভিনগ্রহের হত্যাকারী।

কিন্তু এবারের প্রতিরোধটা যেন অন্যরকম। কয়েক সেকেন্ড ধরে আবরারের মন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলল। সে পুরোপুরি দখল করতে পারছে না আবরারকে। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসলেন আবরার, হাঁপিয়ে উঠে বললেন, 'সিঁড়ির নীচে। জিনিসটা হলো–'

আর বলতে পারলেন না আবরার। কারণ হন্তারক তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে।

ডক্টর আবরার আবার শুয়ে পড়লেন, বার দুয়েক দম নিলেন গভীর করে, তারপর চোখ মেলে তাকালেন। শিলার সাথে চোখাচোখি হলো তাঁর, কাউচের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

স্বাভাবিক গলায় আবরার বললেন, 'মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্ন দেখছি, শিলা। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণেই হয়তো। ঘুমের মধ্যে আমি কি কিছু বলেছি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শিলা। তারপর খুব আস্তে বলল, 'বলেছেন ডক্টর–সত্যি যদি আপনি ডক্টর আবরার হয়ে থাকেন। বলেছেন, 'সিঁড়ির নীচে–জিনিসটা হলো–' তারপর চুপ হয়ে গেছেন।

'গুড লর্ড, শিলা, সব মনে নেই আমার। শুধু মনে পড়ছে একটা ষাঁড় আমাকে গুঁতো দিতে আসছে আর–ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি দৌড়াচ্ছিলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলাম সামনের দরজায় সিঁড়ির নীচে–স্বপ্নে আমার হাতে কোনও বন্দুক ছিল না। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। তবে আশা করি এবার আর দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে না।' তিনি চোখ বুজলেন।

'ড. আবরার, আপনি বলেছিলেন আপনার শত্রু কাছে পিঠেই আছে এবং ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। সেটা সিঁড়ির নীচেও হতে পারে। সামনের দরজায় তিন থাক সিঁড়ি নেমে মিশেছে বারান্দার সাথে। আরও তিন থাক সিঁড়ি রয়েছে পেছনের দরজায়। আমি পরীক্ষা করে দেখব ওখানে কিছু আছে কিনা।'

'শিলা, ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। স্রেফ একটা দুঃস্বপ্নের কথা শুনে–'

কিন্তু তাঁর কথা শিলার কানে গেল না, সে ততক্ষণে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে, হাতে শটগান আর পিস্তল। বাইরে আলো আছে। তবু ফ্লাশলাইট নিয়েছে শিলা, সিঁড়ির নীচেটা অন্ধকার হতে পারে।

চারপাশে সতর্ক নজর বোলাল শিলা রহমান। তার ওপর হামলা করার মত কিছু বা কাউকে চোখে পড়ল না। সামনের সিঁড়িতে ফ্লাশলাইটের আলো ফেলল। কিছুই দেখতে পেল না।

ঠিক করল আরও খোঁজ চালাবে। বাড়ির পেছন দিকটায় প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে দেখবে। পেছনে চলে এল শিলা।

প্রথম দেখায় মনে হলো এদিকের সিঁড়ির নীচে কিছু নেই। তারপর আলো নিয়ে একটু সামনে এগিয়ে সদ্য বোজানো একটা গর্ত চোখে পড়ে গেল শিলার। ওখানকার মাটি খুঁড়ে আবার গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছে কেউ। হ্যাঁ, মানুষের হাতের ছাপও ফুটে আছে নরম মাটিতে।

জামা-কাপড় ময়লা হয়ে যাবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল শিলা, হাত বাড়িয়ে দিল সিঁড়ির নীচে। মাটি এখানে আলগা, সহজেই তোলা গেল। হাতে কী যেন একটা ঠেকল। কচ্ছপের খোলের মত লাগল—কিন্তু কচ্ছপ গর্ত করে না, শক্ত মাটিতে তো নয়ই। টান মেরে ওটাকে তুলে আনল শিলা। কচ্ছপের মত দেখতে জিনিসটা, তবে এটার হাত-পা লেজ কিছুই নেই—এক পলক দেখেই বুঝতে পারল শিলা—এটা ভিনগ্রহবাসী।

গা ঘিনঘিন করে উঠল শিলার, ছুঁড়ে ফেলে দিল জিনিসটা। তারপর খোলার মাঝখানে পিস্তলের নল ঠেকাল এবং গুলি করল।

ঠিক সেই সময়, ঘরের ভেতর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন ড. আবরার। এক দৌড়ে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল শিলা, হাতে প্রস্তুত শটগান।

মেঝের ওপর পড়ে আছেন ডক্টর, তবে হাসছেন তিনি। প্রশান্ত, সুন্দর হাসি। শিলাকে দেখে বললেন, 'তুমি পেরেছ, শিলা। ভিনগ্রহের হন্তারককে হত্যা করতে পেরেছ। তবে আমার বাঁধন এখনই খুলে দিতে হবে না। কারণ পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পেরেছি কিনা এখনও জানি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। 'বেচারা ভিনগ্রহবাসী। স্রেফ নিজের গ্রহে ফিরে যেতে চেয়েছিল সে—কিন্তু পারল না। আমি

কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম বলে রক্ষা–কয়েকটা শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ কথাগুলো বুঝতে পারার জন্যে–স্মৃতি মনে পড়তে শিউরে উঠলেন তিনি– 'আমিও ওর মনের মধ্যে ছিলাম। ও যা জানত সবই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। সে এক লম্বা গল্প। কীভাবে সে হোস্ট ব্যবহার করত, কী উদ্দেশে ইত্যাদি সব।'

'কোত্থেকে এসেছিল ওটা–সৌরজগতের কোনও গ্রহ থেকে?'

'না, বহু দূরের নক্ষত্রের এক গ্রহ থেকে। সেখানে পৌঁছুবার কথা হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সে গ্রহের কথা তুমি শুনতে চাও, শিলা?'

শিলা রহমানের চেহারা দেখেই বোঝা গেল সে কত আগ্রহ নিয়ে আবরারের গল্প শুনছে, হ্যাঁ, বলার দরকার হলো না।

মৃদু গলায় বলে যেতে লাগলেন আবরার। 'সে গ্রহের বিজ্ঞান আমাদের কাছে অচেনা। আমরা কল্পনাও করতে পারব না সেই বিজ্ঞান নিয়ে। তবে আমি দূর গ্রহে যাবার স্বপ্ন দেখি, শিলা। স্যাটেলাইট নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করতে চাই। সে সব কাজে তোমার মত একজন মানুষ বড় প্রয়োজন, শিলা, তুমি আসবে আমার সাথে? তোমাকে নিয়ে আমি অজানা গ্রহ আবিষ্কার করব। হয়তো যাব মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে, হয়তো মনুষ্য বসবাসের গ্রহও আমরা খুঁজে পাব এক সময়। বলো তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

অভিভূতের মত মাথা দোলাল শিলা। ডক্টর আবরারকে সে বিশ্বাস করে, এরকম একজন মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে তার ভালই লাগবে। সে শুধু অস্ফুটে বলল, 'যাব।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হলো আবরারের চেহারা। ইতিমধ্যে তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন শিলার দিকে, বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, শিলা।'

আবরারের হাতটা নিজের নরম হাতে নিয়ে ছোট্ট করে মাথা দোলাল শিলা রহমান। মিষ্টি হেসে বলল, 'জ্বী, ওই কথাই রইল।'

আর কিছু বললেন না মি. সি. আর. আবরার। হাত-পা টানটান করে শুয়ে পড়লেন। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি।

***